দ্য মেমোয়্যার্স অফ শার্লক হোমস

আর্থার কোনান ডয়েল

সূচিপত্র

আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি 2
কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট 27
গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা 49
ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ 79
নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র 117
বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান 167
মাসগ্রেভ-সংহিতা 189
রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার 214
লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি 241
শার্লক হোমস বিদায় নিলেন 272
সোনা-দাঁতের রহস্য 302
হলদে মুখের কাহিনি 325

আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি

[দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট]

বন্ধুবর শার্লক হোমসের সব কেসই যে কাহিনি-বৈচিত্র্যে জমজমাট, তা নয়। কিছু কেস স্মরণীয় তার নিজস্ব বিশ্লেষণী বৈচিত্র্যের জন্যে কিছু স্রেফ কাহিনি বৈচিত্র্যের প্রসাদে, হোমসের অবদান সেখানে অকিঞ্চিৎকর, তবুও ঘটনা-পরম্পরার দৌলতে তা মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রাখবার মতো। বর্তমান কেসটি শেষোক্ত শ্রেণির।

অগাস্ট মাস। বর্ষাকাল। গুটিসুটি মেরে সকালের ডাকে আসা একটা চিঠি বার বার পড়ছে। হোমস। আমি পড়ছি খবরের কাগজ। কিন্তু ভালো লাগছে না। খবর তো নেই। পার্লামেন্ট মুলতুবি। ছুটি কাটাতে সবাই এখন শহরের বাইরে। আমারও মন উড়ু উড়ু কিন্তু পকেটে পাথেয় নাস্তি বলেই বেরোতে পারছি না। তা ছাড়া আমার এই সৃষ্টিছাড়া বন্ধুটির গ্রাম্য শোভার দিকে কোনো আকর্ষণই নেই যদি না সেখানে কোনো রহস্যের আকর্ষণ থাকে।

হোমস আত্মনিমগ্ন। কথাবার্তা সম্ভব নয় বুঝে খবরহীন খবরের কাগজখানা নিক্ষেপ করে বিভোর হলাম আকাশপাতাল ভাবনায়। এমন সময়ে ভাবনার ঘুড়ি ভোকাট্টা হয়ে গেল হোমসের গায়ে-পড়া আচমকা মন্তব্যে।

ওয়াটসন, ধরেছ ঠিক। বোকারাই এভাবে ঝগড়া মিটোয়। পন্থাটা খুবই অসংগত।

অত্যন্ত অসংগত! অত্যন্ত ভ্রান্ত! বললাম সোচ্ছ্বাসে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল, আরে! আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি হোমসের কণ্ঠে কেন? সোজা হয়ে বসে বিষম বিস্মিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে চাইলাম ওর পানে।

বললাম, ব্যাপার কী হোমস? এ যে কল্পনারও অতীত।

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখচ্ছবি দেখে অট্টহাসি হাসল হোমস।

বললে, বন্ধু হে, কিছুদিন আগে এডগার অ্যালান পো-র রচনাবলি থেকে লেখা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। একজন যুক্তিবিশারদ তার সঙ্গী ভদ্রলোকের মনের অব্যক্ত ভাবনাগুলো হুবহু বলে গিয়েছিল। শুনে তুমি বলেছিলে, এ হল লেখকের কল্পনার লাগামছাড়া দৌড়। আমি বলেছিলাম, ঠিক ওইরকমটি কিন্তু আমিও করি। তোমার বিশ্বাস হয়নি।

না তো!

অবিশ্বাসটা মুখে প্রকাশ করনি চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলিয়েছিলে, তাই এখন কাগজ ফেলে দিয়ে যখন সাত পাঁচ ভাবতে বসলে তোমার প্রত্যেকটা চিন্তার চেহারা বাইরে থেকে দেখছিলাম।

কিন্তু আমি তো চুপ করে বসে আছি। পো যার কথা লিখেছেন, মানে, যার ভাবনার চেহারা বাইরে থেকে আঁচ করা গিয়েছে, সে এক জায়গায় এভাবে বসে থাকেনি! কখনো আকাশের তারা দেখেছে, কখনো পাথরে হোঁচট খেয়েছে।

মানুষের মুখ হল মনের আয়না। অবয়ব তার নিত্যসঙ্গী।

তার মানে? অবয়ব দেখে মনের কথা বুঝতে পার?

অবয়ব আর চোখের ভাষা–দুটোর মধ্যে মনের চিন্তা ফুটে ওঠে। চিন্তার শুরু কখন খেয়াল আছে?

না।

আমি বলছি, শোনো। খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলতেই আমার চোখ পড়ে তোমার ওপর। দেখলাম, তিরিশ সেকেন্ড শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলে। অর্থাৎ মনও চিন্তাশূন্য। তারপরই চোখ পড়ল জেনারেল গর্ডনের বাঁধানো ছবিটার ওপর। মুখ-চোখের চেহারা একটু পালটাল। অর্থাৎ, ভাবনার আনাগোনা শুরু হল। এরপরেই হেনরি ওয়ার্ড বীচারের না-বাঁধানো ছবিখানার দিকে তাকিয়ে যা ভাবলে–তা মুখেই প্রকট হল। ভাবলে, আহারে! এ-ছবি বাঁধালে ফাঁকা জায়গাটা তো ভরাট হবেই, গর্ডনের ছবির পাশে মানাবেও ভালো।

অপূর্ব! ঠিক ধরেছ দেখছি! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি আমি।

আবার তাকালে বীচারের ছবির দিকে। এবার নিবিড়ভাবে বীচারের চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করলে। আস্তে আস্তে তোমার মুখ থেকে আলোড়ন মিলিয়ে গেল মুখ নিস্তরঙ্গ, অর্থাৎ মন। স্মৃতির রোমন্থনে ব্যাপৃত। অথচ তাকিয়ে আছ ছবির দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলে মানুষটার মহান কীর্তির কথা, গৃহযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা। তখন কিন্তু আমাদের অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছিল, অবিচার করেছিল তার প্রতি। আমার মনে আছে, তখন তুমি ঘৃণায় ফেটে পড়েছিলে। আস্তে আস্তে তোমার চাহনি ছবির ওপর থেকে সরে এল–কিন্তু ভাবনা তখনও অব্যাহত রইল। অর্থাৎ ছবির মানুষকে নিয়ে আর ভাবছ না, ভাবছ এবার সেই ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের কথা। কেননা, তোমার চোখ জ্বলে উঠল, ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল, হাত মুঠো করে ফেললে। তারপরেই মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আপন মনে মাথা নাড়লে। যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের কথা ভেবে মুখটা তোমার ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তোমার নিজের ক্ষতচিহ্নটায় হাত বুলোলে, ফিকে হাসি হাসলে, এ-হাসি আমি চিনি, দেশে দেশে ঝগড়া মিটোনোর জন্যে রক্তক্ষয়ী এ-পন্থটা যে কতখানি নির্বুদ্ধিতা আর অসংগত, তা ভেবে তুমি নিজের মনেই হেসে উঠলে। চিন্তার এই পর্যায়ে একমত হলাম তোমার সঙ্গে এবং তা ব্যক্ত করলাম সরবে।

একেবারে ঠিক!

সেদিনকার সন্দেহ তাহলে মিটল তো? চলো এবার রাস্তার হাওয়া খেয়ে আসা যাক।

ঘণ্টা তিনেক টো-টো করে বেকার স্ট্রিটে ফিরে দেখলাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা গাড়ি।

ডাক্তারের গাড়ি দেখছি, বললে হোমস। নতুন পসার শুরু করেছেন। জেনারেল প্র্যাকটিশনার, বিশেষজ্ঞ নন। তবে খাঁটিয়ে ডাক্তার। এসেছেন পরামর্শ করতে, কপাল ভালো ঠিক সময়ে ফিরেছি!

হোমসের পদ্ধতি আমি জানি। ব্রহাম গাড়ির আলোর পাশে ঝোলানো বেতের বাস্কেটে কী-কী ডাক্তারি যন্ত্রপাতি রয়েছে এবং তাদের অবস্থা দেখেই বুঝলাম ঝট করে এত কথা কী করে বলল সে। ঘরের জানলায় আলো জ্বলছে। রাত দশটায় এসেছেন নিশ্চয় সমস্যা নিয়ে। কৌতূহলী হয়ে ঢুকলাম ঘরে।

বালি রঙের জুলপিওলা পাণ্ডুবর্ণ বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের একজন অস্থিচর্মসার ভদ্রলোক অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিলেন। বিগতযৌবন শক্তিহীন চেহারা, একটু নার্ভাস আর লাজুক। শিল্পীসুলভ সরু হাত, ডাক্তার বলে মনে হয় না।

হোমস খুশি উজ্জ্বল কণ্ঠে বললে, গুড ইভনিং ডক্টর, মিনিট কয়েক হল এসেছেন দেখছি।

উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, কোচোয়ান বলল বুঝি?

আপনার পাশের মোমবাতিটা এইমাত্র জ্বালাননা হয়েছে দেখে বললাম।

বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?

আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ান, থাকি ৪০৩ নম্বর ব্রুক স্ট্রিটে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্নায়ুরোগ সম্বন্ধে বিরল গ্রন্থটি তাহলে আপনার লেখা?

খুশি হলেন ভদ্রলোক। রক্তিম মুখে বললেন, যাক, বইটা পড়েছেন তাহলে। প্রকাশকের হিসেব অনুযায়ী নাকি বিক্রিই হয় না। আপনি ডাক্তার?

যুদ্ধে ছিলাম–অবসর নিয়েছি।

স্নায়ুরোগে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে আমার আছে। মি. হোমস। আমার বাড়িতে পর-পর এমন সব ঘটনা ঘটছে যে আপনার কাছে ছুটে না-এসে আর পারলাম না।

বসল হোমস। পাইপ ধরিয়ে বললে, খুলে বলুন।

ডক্টর ট্রেভেলিয়ানও বসলেন, কতকগুলো কথা এতই তুচ্ছ যে শুনলে আপনার হাসি পাবে। কিন্তু না-বললেও রহস্যটা স্পষ্ট হবে না। তাই সব বলব, বাদসাদ আপনি দেবেন।

প্রথমেই বলি, ছাত্র হিসেবে আমি ভালো ছিলাম। ডিগ্রি নেওয়ার পর মুছারোগ সম্পর্কে কৌতূহল জাগানো কিছু গবেষণা করেছিলাম। তারপর স্নায়ুরোগের ওপর ওই বইখানা লিখে ব্রুস পিনকারটন পদক আর পুরস্কার দুটোই পাই।

কিন্তু জমিয়ে প্র্যাকটিস করার মতো আমার পয়সা ছিল না। ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ারের ধারে কাছে ঘরভাড়া আকাশছোঁয়া, ডাক্তারি সরঞ্জামের খরচও অনেক। পসার না-জমা পর্যন্ত হাতে টাকাও দরকার। এত রেস্ত আমার ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে পড়ল। আশ্চর্য একটা সুযোগ পেলাম।

বছর কয়েক আগে ব্লেসিংটন নামে এক অচেনা ভদ্রলোক সকালে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং গায়ে পড়ে আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। ছাত্রজীবনে, আমার সুনাম তিনি শুনেছেন, আমি যে পদক আর পুরস্কার পেয়েছি, সে-খবরও রাখেন। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন, আমি মদ খাই না, বদ নেশায় আসক্ত নই, অথচ পকেটে রেস্ত নেই বলে পসার জমাতে পারছি না। উনি তখন বললেন, দেখুন মশায়, আমার বেশ কিছু টাকা এমনিই পড়ে আছে। আমি তা খাটাতে চাই। তাতে আপনার লাভ, আমারও লাভ।

শুনে তো আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আর কি! এ যে মেঘ না-চাইতেই জল! উনি তখন খুলে বললেন প্রস্তাবটা। ঘরভাড়া, সাজসরঞ্জাম কেনা, তোকজনের মাইনে, সব খরচ ওঁর। আমার কাজ হবে কেবল রুগি দেখা। রোজগার যা হবে, যার তিন ভাগ উনি নেবেন, এক ভাগ আমি পাব।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। লেডি ডে-তে প্র্যাকটিস শুরু করলাম। দোতলার সবচেয়ে ভালো ঘর দুটোয় উনি নিজে রইলেন, হার্ট খারাপ বলেই সবসময়ে ডাক্তারের সান্নিধ্যে থাকতেন। ঘর থেকে খুব একটা বেরোতেন না, কারো সঙ্গে মিশতেন না, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধে হলেই নীচে এসে আমার খাতাপত্র দেখে গিনি পিছু পাঁচ শিলিং তিন পেনি আমাকে দিয়ে বাকিটা নিজের ঘরে নিয়ে বাক্সে মজুত করতেন। রোজগারও ভালো হচ্ছিল। দেখতে দেখতে আমার পসার জমে গিয়েছিল। এই কয়েক বছরেই ভদ্রলোক বড়োলোক হয়ে গেলেন আমার দৌলতে।

কয়েক সপ্তাহ আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্লেসিংটন বললেন, দরজা জানলায় মজবুত খিল লাগানো দরকার। ওয়েস্টএন্ডে নাকি সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। ভীষণ উত্তেজিত দেখলাম ভদ্রলোককে। কয়েক সপ্তাহ কাটল অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে–সবসময়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতেন বাইরে। রাত্তিরে ডিনারের পর একটু বেড়ানোর অভ্যেস ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল এরপর। দেখে শুনে মনে হল ভয়ে সিটিয়ে আছেন অষ্টপ্রহর। কাকে বা কীসের জন্যে এত আতঙ্ক, জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হল বিপত্তি। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কাজেই আমি আর ও নিয়ে কথা বলিনি। আস্তে আস্তে সুস্থির হলেন। আগের মতো ডিনারের পর আবার বেড়ানো শুরু করলেন। তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে একেবারে বিছানা নিলেন।

দু-দিন আগে একটি চিঠি পাই আমি। চিঠিতে তারিখ নেই, ঠিকানা নেই। শুনুন, পড়ছি।

একজন খানদানি রুশ ভদ্রলোক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ানকে দিয়ে তাঁর মূর্ছারোগের চিকিৎসা করাতে চান। কাল সন্ধে ছটা পনেরো মিনিটে তিনি আসবেন ডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তারবাবু যেন হাজির থাকেন।

মূর্ছারোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল রুগি পাওয়া। তাই খুব উৎসাহ পেলাম চিঠি পেয়ে। পরের দিন চেম্বারে এলেন দুই ব্যক্তি। একজন রোগা লম্বা, গম্ভীর, বয়স্ক অতি মামুলি চেহারা–আভিজাত্যহীন। আর একজন কান্তিমান যুবক, চওড়া বুক, ধারালো নাক মুখ।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যুবকটি পরিচয় দিলেন নিজেদের। বয়স্ক পুরুষ তার বাবা। মূর্ছারোগের প্রকোপে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। চোখে দেখা যায় না। কানে শোনা যায় না। বাবাকে আমার কাছে রেখে তাই তিনি পাশের ঘরে থাকবেন।

বয়স্ক ভদ্রলোককে পরীক্ষা শুরু করলাম। জবাব দিলেন উলটোপালটা। বোধ হয় ভাষাটা ভালো জানা নেই বলেই। কিছুক্ষণ পরে কোনো জবাব না-দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন সামনে। চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে দেখে বুঝলাম রোগের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। নাড়ি, জ্বর, মাংসপেশি, প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে অবাক হলাম–সব স্বাভাবিক। তাই অ্যামাইল নাইট্রেট শুকিয়ে ঘোর কাটানো দরকার ভেবে ল্যাবরেটরিতে গেলাম ওষুধটা আনতে। মিনিট পাঁচেক পরে এসে দেখলাম ঘর খালি। তিনি নেই। পাশের ঘরে তার ছেলেও নেই। চাকরটা নতুন, তেমন চটপটে নয়। রুগি কোথায়, সে বলতে পারল

না। আওয়াজ-টাওয়াজও নাকি পায়নি। দরজাটা ভেজানো, বন্ধ নয়। পুরো ব্যাপারটা একটা বিরাট রহস্য রয়ে গেল আমার কাছে।

ব্লেসিংটন বেড়ানো শেষ করে ফিরে এলেন একটু পরে। ইদানীং ওঁর সঙ্গে খুব কম কথা বলি। তাই এ-প্রসঙ্গে কোনো কথা বললাম না।

রুশ ভদ্রলোকরা আবার আসবেন ভাবিনি। পরের দিন ব্লেসিংটন বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই তাই ওঁদের ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কাচুমাচু মুখে ওঁরা বললেন কালকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। রোগের আক্রমণ কেটে যাওয়ার পর ভদ্রলোকের মনে হল একটা নতুন জায়গায় বসে আছেন। কেন এসেছেন, কোথায় এসেছেন কিছু মনে করতে পারলেন না। প্রতিবার ঘোর কেটে যাওয়ার পর এইরকমই হয়–আগের কথা খেয়াল থাকে না। তাই সোজা বেরিয়ে যান ঘর থেকে। বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ছেলে ভাবেন, ডাক্তারের সঙ্গে কাজ শেষ হয়েছে বলেই বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছেন। পেছন পেছন তিনিও বেরিয়ে যান। বাড়ি যাওয়ার পর জানা যায় আসল ব্যাপারটা।

শুনে একচোট হেসে নিয়ে নতুন করে রুগির সঙ্গে আলোচনা করতে বসলাম। ছেলে গেলেন পাশের ঘরে।

আধ ঘণ্টা পরে প্রেসক্রিপশন লিখে দেওয়ার পর ছেলে এসে বাবাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন বাইরে।

একটু পরেই বেড়িয়ে ফিরলেন ব্লেসিংটন। সটান গেলেন ওপরের ঘরে। পরমুহূর্তেই দুমদাম করে বললেন, কে ঢুকেছিল আমার ঘরে?

উন্মত্ত চেহারা দেখে মাথার ঠিক নেই বুঝে রুক্ষতাটা গায়ে মাখলাম না। সবিনয়ে বললাম, কেউ তো ঢোকেনি।

শুনে ঠান্ডা হওয়া দুরে থাকুক, তুড়ুক নাচ নাচতে নাচতে সটান আমাকে মিথ্যেবাদী বলে বসলেন ব্লেসিংটন। ওপরের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, সত্যিই কার্পেটের ওপর কতকগুলো বড়ো আকারের পায়ের ছাপ–যা তাঁর নয় মোটেই।

কালকে বিকেলে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল মনে আছে নিশ্চয় আপনার। বেশ বুঝলাম, রুশ রুগির ছেলেটি ভিজে জুতো নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিলেন। জিনিসপত্রে হাত দেননি। কিন্তু বসবার ঘরে বসে না-থেকে ওপরের ঘরে ঢুকে পায়চারি করে গিয়েছেন কার্পেটে।

ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয় যে ভেঙে পড়তে হবে। কিন্তু মি. ব্লেসিংটন দেখলাম আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আর্মচেয়ারে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কান্নাটা কেন, সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারলাম না–আমিও কথা বলতে পারলাম না। তাই আপনার কাছে এলাম। খামোকা ভয় পাচ্ছেন মি. ব্লেসিংটন। আপনি গিয়ে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন তো ভালো হয়।

নিমীলিত চোখে পাইপ টানতে টানতে প্রত্যেকটা শব্দ কান খাড়া করে শুনল হোমস! ডাক্তারের কাহিনি যে তার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, পাইপ থেকে ধুম উদগিরণের ধরন দেখেই তা বুঝলাম। কাহিনি শেষ হতেই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে গেলাম ব্রুক স্ট্রিটে ডাক্তারের চেম্বারে। কার্পেট-মোড়া চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, এমন সময়ে—

ফস করে নিভে গেল ওপরের আলো। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভেসে এল কম্পিত কণ্ঠে ব্রজনাদ : খবরদার! হাতে পিস্তল আছে। ওপরে উঠলেই খতম করে দেব?

ডাক্তার বললেন, কী হচ্ছে মি. ব্লেসিংটন? মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

আরে ডাক্তার নাকি! সঙ্গে কারা? অন্ধকারেই টের পেলাম আমার এবং হোমসের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে কে যেন পরীক্ষা করছে। তারপরেই জ্বলে উঠল গ্যাসবাতি। আসতে পারেন। আসতে পারেন। ঠিক আছে। কিছু মনে করবেন না একটু হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

আলোয় দেখলাম বিচিত্র ভদ্রলোককে। এককালে খুব মোটা ছিলেন। এখনও মোটা রয়েছেন কিন্তু আগের মতো নয়। বুলডগের মতো শিথিল চামড়া ঝুলছে মুখময়। ভীষণ ঘাবড়ে যাওয়ায় থির থির করে কাঁপছে গালের চামড়া। বালি রঙের পাতলা চুল যেন ভয়ের চোটে খাড়া হতে চাইছে। আমরা এগিয়ে যেতেই হাতের পিস্তলটা পকেটে রেখে বললেন–আসুন মি. হোমস। ডাক্তারের কাছে শুনেছেন তো ঘরে কারা যেন ঢুকেছিল?

তারা কারা মি. ব্লেসিংটন? আপনাকে খুন করতেই-বা চাইছে কেন? প্রশ্ন করল হোমস।

ঘাবড়ে গেলেন ব্লেসিংটন। আমতা আমতা করে বললেন, তা তো জানি না। আপনাকে তলব করলাম আপনার মুখেই শুনব বলে।

আপনি জানেন না?

আসুন, আসুন, ওপরে আসুন।

গেলাম ওপরের ঘরে ভদ্রলোকের পেছন পেছন। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরের এককোণে রাখা একটা পেল্লায় কালো বাক্সের দিকে আঙুল তুলে ব্লেসিংটন বললেন, আমার সারাজীবনের টাকা ওর মধ্যে আছে। ব্যাঙ্ক-কে আমি ভরসা পাই না। জীবনে একবারই টাকা খাঁটিয়েছি ডাক্তারের মারফত। ঘরে লোক ঢুকেছে দেখে সেই কারণেই এত ঘাবড়ে গেছি।

মি, ব্লেসিংটন, আমাকে ঠকালে কিন্তু সাহায্য পাবেন না।

সবই তো বললাম।

বিরক্ত মুখে পেছন ফিরল হোমস, তাহলে চললাম।

সে কী! কী করা উচিত বলে যান! ভাঙা গলায় বললেন ব্লেসিংটন।

প্রাণ খুলে কথা বলা উচিত–যা সত্যি তা বলা উচিত, বলে আর দাঁড়াল না হোমস। আমাকে নিয়ে নেমে এল রাস্তায়।

হাঁটতে হাঁটতে বললে, অযথা ঝামেলায় তোমাকে টেনে আনার জন্যে আমি দুঃখিত, ওয়াটসন। তবে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু মাথায় তো কিছু ঢুকছে না।

দুজন অথবা তিনজন লোক রয়েছে এর মধ্যে। ব্লেসিংটনের ওপর তারা খেপে আছে। এদের একজন রুগির ছদ্মবেশে ডাক্তারকে আটকে রাখে–আর একজন সেই ফাঁকে ব্লেসিংটনের ঘরে ঢোকে।

রোগটা?

স্রেফ অভিনয়। কিন্তু কপালক্রমে দু-বারই ঘরের বাইরে রইল ব্লেসিংটন। তার মানে ওই সময়টা যে তার বেড়ানোর সময়, আততায়ীরা তা জানে। চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকলে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করত। তা ছাড়া প্রাণের ভয় থাকলে চোখ দেখলেই তা বোঝা

যায়—ব্লেসিংটনের চোখে আমি মৃত্যুভয় দেখেছি। ও জানে কারা ঘরে এসেছিল কিন্তু চেপে যাচ্ছে।

অথবা হয়তো ঘরের মধ্যে লোক ঢোকার ব্যাপারটা মনগড়া। ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বানিয়ে বলেছেন। নিজেই হয়তো ঘরে ঢুকেছিলেন কোনো বদ মতলবে।

মুচকি হাসল হোমস আমার কল্পনার দৌড় দেখে।

বলল, ও-সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছি সিঁড়ির কার্পেটে সেই জোয়ান লোকটার পায়ের ছাপ দেখে। মাপটা ডাক্তারের জুততার মাপের চেয়ে বড়ো। তা ছাড়া, ডাক্তার ছুঁচোলো জুতো পরেন–সে পরে এসেছিল চৌকোনা জুততা। যাকগে, আশা করছি, কালকেই নতুন খবর পাব ব্রুক স্ট্রিট থেকে।

সত্যিই খবর এল, অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে। সাতসকালে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম হোমসের ধাক্কায়। চিরকুট এসেছে ডা. ট্রেভেলিয়ানের কাছ থেকে। নোটবুক থেকে ছেড়া কাগজে দ্রুত লিখেছেন, ভগবানের নামে বলছি। এক্ষুনি আসুন, পি. টি.। চিরকুট পাঠিয়েছেন কোচোয়ানের হাতে গাড়ি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে নীচে।

পনেরো মিনিট লাগল ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছোতে। আমাদের দেখেই মাথায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, সর্বনাশ হয়ে গেল। মি. ব্লেসিংটন সুইসাইড করেছেন। গলায় দড়ি দিয়েছেন কাল রাতে।

শিস দিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

কাতর কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, কী করি বলুন তো? সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। পুলিশ অবশ্য এসে গেছে, ওপরে আছে।

জানলেন কখন?

সকাল সাতটা নাগাদ রোজকার মতো চা নিয়ে গিয়েছিল ঝি। দেখল, ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝুলছেন। ল্যাম্পের হুকে দড়ি বেঁধে কালো বাক্সটা থেকে লাফিয়ে ঝুলে পড়েছেন।

চিন্তামগ্নভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হোমস। তারপর ডাক্তারের পেছন পেছন উঠল ওপরের ঘরে, সঙ্গে আমি। ঢুকেই দেখলাম ভয়াবহ সেই দৃশ্য। স্থূলকায় ব্লেসিংটন ঝুলন্ত অবস্থায় যেন আরও মোটা হয়ে গেছেন। ছাল-ছাড়ানো মুরগির গলার মতো লম্বা হয়ে বেরিয়ে রয়েছে গলা, বাদবাকি দেহটা নরদেহ বলে মনে হচ্ছে না। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত বেমানান লাগছে সব কিছু। গোড়ালি ফুলে উঠেছে। পাশে দাঁড়িয়ে চটপটে চেহারার একজন পুলিশ ইনস্পেকটর নোটবই খুলে কী যেন লিখছে।

হোমসকে দেখেই স্বাগত জানাল ইনস্পেক্টর। হোমস বললে, আরে, ল্যানার যে। কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেলে?

ভয়ের চোটে মাথার ঠিক রাখতে পারেননি ভদ্রলোক। ওই দেখুন না শোয়ার ফলে বিছানা দেবে রয়েছে–তারপর ভোর পাঁচটা নাগাদ উঠে ঝুলে পড়েছেন। জানেন তো বেশির ভাগ লোক ওই সময়ে আত্মহত্যা করে।

লাশ পরীক্ষা করে আমি বললাম, মাসল যে-রকম শক্ত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ঘণ্টা তিনেক আগে মারা গেছেন ইনি।

অস্বাভাবিক কিছু পেয়েছ ঘরে? হোমস শুধোয়।

হাত ধোবার জায়গায় পেয়েছি একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর কয়েকটা স্ক্রু। কাল রাতে চারটে চুরুট খেয়েছিলেন ভদ্রলোক–পোড়া অংশগুলো পেয়েছি ফায়ারপ্লেসে। এই দেখুন।

চুরুটের হোল্ডার?

না।

চুরুটের বাক্স?

এই তো–কোটের পকেটে ছিল।

বাক্স খুলে একটা চুরুট বার করে শুঁকল হোমস।

বলল, হাভানার চুরুট। কিন্তু এই পোড়া চুরুটগুলো ওলন্দাজরা আমদানি করেছে তাদের পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। এসব চুরুট খড়ে মোড়া থাকে, একটু বেশি লম্বাটে আর সরু হয়।

বলতে বলতে পকেট-ল্যাম্পের আলোয় পোড়া চুরুট চারটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললে হোমস, দুটো চুরুট ছুরি নিয়ে কাটা, বাকি দুটো সাজানো দাঁত দিয়ে কাটা। ল্যানার, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন। ঠান্ডা মাথায় মার্ডার।

অসম্ভব।

কেন?

এত ঝামেলা পাকিয়ে কেউ খুন করে না।

সেটাই তো দেখতে হবে হে।

খুনিরা বাড়িতে ঢুকল কীভাবে?

সামনের দরজা দিয়ে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

চলে যাওয়ার পর বন্ধ করা। হয়েছিল।

জানলেন কী করে?

চিহ্ন দেখে। আরও খবর দিচ্ছি, বলে হোমস দরজার কাছে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে চুলচেরা চোখে উলটেপালটে দেখল চাবিটা। দেখল চাবির ফোকর। তারপর বিছানা, কার্পেট, চেয়ার, ম্যান্টলপিস, মৃতদেহ আর দড়ি পরীক্ষা করল। সবশেষে দড়ি কেটে ডেডবডি শোয়ানো হল চাদরের ওপর।

বললে, দড়িটা কোত্থেকে এল?

ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বিছানার তলা থেকে এক বান্ডিল দড়ি বার করে বললেন, এখান থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। পুড়ে মরার ভয়ে দড়ি রাখতেন খাটের তলায় সিঁড়িতে আগুন লাগলে জানলা গলে যাতে পালাতে পারেন।

ফলে ওদের ঝামেলাও কমে গেল। ম্যান্টলপিস থেকে ব্লেসিংটনের এই ছবিখানা নিয়ে চললাম–কাজে লাগবে।

কিন্তু কিছু তো বলে গেলেন না?

তিনজন এসেছিল এঁকে খুন করতে। রুশ রুগির ছদ্মবেশে বয়স্ক ব্যক্তিটিকে মাঝে রেখে সারি দিয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিল তিনজনে। সবার আগে ছিল সেই জোয়ান ছোকরা–ছদ্মবেশী রুগির সাজানো ছেলে। দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল যে তার হদিশ এখনও পেলাম না। ল্যানার, চাকরটাকে গ্রেপ্তার করো। ডাক্তারের মুখে শুনেছি সে নতুন এসেছে কাজে।

পালিয়েছে ছোঁড়া! গজ গজ করে বললেন ডাক্তার।

হোমস বললে, সে ছিল সবার পেছনে।

অভিভূত কণ্ঠে বললাম, হোমস! এত কথা তুমি বলছ কী করে?

ভায়া, পায়ের ছাপ যে পর পর পড়েছে। ভুল হবার জো টি নেই। কোন ছাপটা কোন শ্রীমানের, সেটা তো কাল রাতেই জেনে গেছি! ওরা দরজার সামনে পৌঁছে তার দিয়ে খুঁচিয়ে খুলে ফেলল তালা–খালি চোখেই আঁচড়গুলো দেখা যায়। আতশকাচের দরকার হয় না। তারপর কাবু করল ব্লেসিংটনকে খুব সম্ভব বিছানায় বসিয়ে নিজেরা বসল বিচারসভার মতো একটা পরামর্শসভায়। বুড়ো হোল্ডারে চুরুট লাগিয়ে বসল চেয়ারে। জোয়ান শাগরেদ এইখানে বসে চুরুট খেয়ে ছাই ঝাড়ল ড্রয়ার-আলমারিতে। তেসরা আদমি পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। বিচারে সাব্যস্ত হল ফাঁসি দেওয়া হবে

ব্লেসিংটনকে। ফাঁসি দেবে বলেই কাঠ বা পুলির মতো কপিকল জাতীয় কিছু একটা সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয়। ফাঁসিকাঠ বানিয়ে নিত নিজেরাই স্ক্রু ড্রাইভার আর ভ্রু পর্যন্ত এনেছিল কড়িকাঠে সেটা লাগাবে বলে। কিন্তু ল্যাম্পের হুকটা দেখে সে হাঙ্গামা করতে হল না। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে বিদেয় হল জল্লাদরা, ভেতর থেকে স্যাঙাত বন্ধ করে দিল দরজা।

যেন প্রত্যক্ষ করে বলছে, এমনিভাবে প্রতিটি ব্যাপারে বিশদভাবে বলে গেল হোমস। ছোটো ছোটো চিহ্ন থেকে এইভাবে সাজানো খুনের দৃশ্য শুনে তাজ্জব হলাম প্রত্যেকেই। ইনস্পেকটর তক্ষুনি বেরিয়ে গেল চাকরের খোঁজে।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে ব্রেকফার্স্ট খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল হোমস। বেলা তিনটের সময়ে এলেন ডাক্তার আর ইনস্পেকটর। হোমস ফিরল আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। মুখ প্রসন্ন খবর শুভ নিশ্চয়।

কী খবর ইনস্পেকটর? শুধোল ল্যানারকে।

শাবাশ! আর আমি পাকড়াও করেছি বাকি দুজনকে।

সে কী! একযোগে চেঁচিয়ে উঠলাম তিনজনেই।

পাকড়াও করেছি মানে তাদের ঠিকুজি কুষ্ঠি জেনে ফেলেছি। ব্লেসিং. টনকে পুলিশমহল চেনে। যারা খুন করে গেল, তাদেরকেও চেনে। এদের নাম বিডল, হেওয়ার্ড আর মোফাট।

ওয়াশিংটন ব্যাঙ্ক ডাকাত! আঁতকে উঠল ইনস্পেকটর।

এক্কেবারে ঠিক!

তাহলে ব্লেসিংটনের আসল নাম সাটন?

তা আর বলতে।

আমি আর ডক্টর ট্রেভেলিয়ান মূঢ়ের মতো দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

হোমস বুঝিয়ে দিল–পাঁচজনে মিলে ডাকাতি করেছিল ওয়ার্দিংটন ব্যাঙ্কে। চারজনের নাম এইমাত্র বললাম–পঞ্চমজন হল কার্টরাইট। গার্ড টোবিনকে খুন করে সাত হাজার পাউন্ড নিয়ে চম্পট দেয় এরা। ঘটনাটা ঘটে ১৮৭৫ সালে। পুলিশ পাঁচজনকেই ধরে। রাজসাক্ষী হয় এই ব্লেসিংটন বা সাটন। অথচ এদের মধ্যে সবচেয়ে বদমাশ ছিল এই সাটন। ফাঁসি হয়ে যায় কার্টরাইটের। বাকি তিনজন জেলে যায়। পনেরো বছরের মেয়াদ ফুরোনোর বছর কয়েক আগেই ছাড়া পেয়ে এরা হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে সাটনকে। দুবার খুন

করতে এসে ফিরে যায়–ভাগ্যক্রমে বাড়ি থাকেনি সাটন। তৃতীয়বারে কাজ হাসিল করেছে।

ডক্টর ট্রেভেলিয়ান বললেন, খবরের কাগজে তিনজনের খালাস পাওয়ার খবরটা পড়েই বোধ হয় অত ভয় পেয়েছিল ব্লেসিংটন?

হ্যাঁ। ডাকাতির গল্প যা বলেছিল, সেটা গল্পই।

কিন্তু আমার কাছে খুলে বললেই তো হত!

খুলে বলা কি যায়? পুরোনো দোস্তদের হিংস্র প্রকৃতি সে যতটা জানে, আর কেউ তা জানে। জিঘাংসা যাদের রক্তে, তারা জেল থেকে বেরিয়ে কী করবে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল বলেই আতঙ্কে আটখানা হয়ে গিয়েছিল পাপিষ্ঠ সাটন। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে বলতে পারেনি। তাই চেয়েছিল ব্রিটিশ কানুনের সাহায্য নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু বিচার কানুনের চেয়ে বড়ো।

ব্রুক স্ট্রিটের রহস্যকাহিনির পরিসমাপ্তি এইখানেই। কেননা, তিন বিচারক-জল্লাদের টিকি ধরা আর যায়নি। বছর কয়েক আগে পর্তুগিজ উপকূলে একটা জাহাজ নিখোঁজ হয়! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিশ্বাস খুনি তিনজন আরোহীদের মধ্যে ছিল।

———

টীকা

আবাসিক রুগির আশ্চর্য কাহিনি : দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের অগাস্ট ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলি-র ১২ অগাস্ট ১৮৯৩ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায়।

হোমসের অবদান সেখানে অকিঞ্চিৎকর : যেমন বলা যেতে পারে এ স্টাডি ইন স্কারলেটের কথা। সেখানে হোমস অপরাধীকে চিহ্নিত করলেও আসল রহস্যের সমাধান হয় অপরাধীর জবানবন্দিতে। খুনি মুখ না-খুললে হত্যার কারণ জানা সম্ভব নাও হতে পারত।

এডগার অ্যালান পো : প্রথম খণ্ডের (উপন্যাস) টীকা দ্রষ্টব্য।

জেনারেল গর্ডন : মেজর জেনারেল চার্লস জর্জ গর্ডন (১৮৩৩-১৮৮৫)। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স কোর-এর হয়ে ক্রিমিয়া, তাইপে, আফিং যুদ্ধ প্রভৃতি যুদ্ধে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

হেনরি ওয়ার্ড বীচার : আমেরিকার কনগ্রেগেশনাল পাদরি হেনরি ওয়ার্ড বীচার (১৮১৩-১৮৮৭) ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, বক্তা, সমাজসেবী এবং দাসপ্রথা বিরোধী

আন্দোলনে যুক্ত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বন্ধুপত্নী এলিজাবেথ টিলটনের সঙ্গে ব্যভিচারের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অপরাধে জর্জরিত হলেও তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার : ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ার লন্ডনের একটি অংশ। এখানকার লাগোয়া হার্লে স্ট্রিট এবং উইমপোল স্ট্রিটে শহরের বিশিষ্ট ডাক্তারদের চেম্বার অবস্থিত। ১৮৯১-এর মার্চ থেকে মে মাস ২, আপার উইমপোল স্ট্রিটে ছিল আর্থার কন্যান ডয়ালের চেম্বার।

লেডি ডে : পঁচিশে মার্চ খ্রিস্টধর্মে ফিস্ট অব অ্যানানসিয়েশন পালিত হয়। ধর্মবিশ্বাসে মনে করা হয় এইদিন অ্যাঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল মেরি মাতাকে জানান যে তিনি যিশুর জন্ম দেবেন।

ল্যানার : ইনস্পেকটর ল্যানারকে হোমসের এই একটি গল্পেই দেখা গিয়েছে।

মেয়াদ ফুরোনোর বছর কয়েক আগেই ছাড়া পেয়ে : ইংলন্ডের আইনে কোনো কয়েদি তার মোট মেয়াদের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত ছাড় পেতে পারত জেলখানায় তার ভালো ব্যবহারের ভিত্তিতে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিদের এমন ছাড়ের ব্যবস্থা নেই, তবে তাদের মেয়াদের বিশ বছর পার হলে কখনো এ-বিষয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন কর্তৃপক্ষ।

কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট

[দ্য গ্লোরিয়া স্কট]

শীতকাল। রাত হয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে গা তাতাচ্ছি আমি আর শার্লক হোমস।

এমন সময়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, এই কাগজগুলো পড়ে দেখো। অসাধারণ কেস গ্লোরিয়া স্কট-এর সব কথা লেখা আছে। আর এই খবরটা পড়েই আঁতকে উঠে মারা গিয়েছিলেন সমাজের মাথা ট্রেভর।

ড্রয়ার খুলে একটা রংচটা ছোট্ট চোঙা বার করল বন্ধুবর। ভেতর থেকে বেরোল স্লেট পাথরের মতো ধূসর একটুকরো কাগজ।

কাগজটায় টানা হাতে লেখা একটা বিচিত্র সংবাদ :

খেল মুরগি আবার খতম। মুরগিওলা বুড়ো হাডসন কাঁদছে। যত্তোসব গাধার দল। বলে কিনা চালান দিয়েছে লন্ডনে। বলছে, প্রাণপ্রিয় মুরগি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাও। তোমার মুরগিও মরবে।

এ কী গোলকধাঁধা! আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে খুক খুক করে শুষ্ক হাসি হাসল হোমস।

বললাম, এ তো দেখছি একটা আবোল-তাবোল ব্যাপার। আঁতকে ওঠার মতো তো কিছু।

কিন্তু এই খবর পড়েই ধড়াস করে পড়ে মারা গেছেন একজন শক্তসমর্থ বুড়ো ভদ্রলোক।

কেসটা আমাকে পড়তে বলছ কেন?

কারণ এই হল আমার জীবনের প্রথম কেস।

নিমেষে জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। শার্লক হোমসের প্রথম মামলা নিয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল বরাবর।

পাইপ টানতে টানতে ও বলল, কলেজে থাকতে আমার বন্ধু বলতে ছিল একজনই–ভিক্টর ট্রেভর। কারো সঙ্গে মিশতাম না। ঘরে বসে নিজের পড়া নিয়ে থাকতাম, তরবারি যুদ্ধ

আর মুষ্টিযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো ব্যায়ামে ঝোকও ছিল না।

ভিক্টরের বুলটেরিয়ার কুকুরটা একদিন আমার পায়ে কামড়ে দেয়। পা নিয়ে শুয়ে রইলাম দশদিন। খোঁজখবর নিতে আসত ভিক্টর। সেই থেকেই নিবিড় হল বন্ধুত্ব। ছুটি কাটানোর জন্যে নেমন্তন্ন করল ওর দেশের বাড়িতে নরফোকের ডনিথর্পে।

জায়গাটা ভালো। ছোট্ট গ্রাম হলেও বেশ ছিমছাম। মাছধরা আর বুনো হাঁস শিকার নিয়ে একটা মাস দিব্যি কাটিয়ে নেওয়া যায়। লাইব্রেরিতে বাছাই-করা বইয়ের সংগ্রহ। সব দিক দিয়ে ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা।

ভিক্টরের বুড়ো বাবা মানুষটা চমৎকার। ও অঞ্চলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার তিনি। বিপত্নীক। ভিক্টর ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। এক মেয়ে ছিল–ডিপথেরিয়ায় মারা গেছে। বৃদ্ধ হলেও বেশ শক্তসমর্থ। নীল-নীল চোখে ভয়ংকরের ইশারা। রোদেপোড়া তামাটে রং। সারাজীবন তিনি প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়েছেন যা কিছু শিখেছেন, সারাপৃথিবীতে টহল দিয়ে শিখেছেন–বই-পড়া-বিদ্যে বিশেষ নেই। গ্রামের লোক কিন্তু তাকে মাথায় করে রাখে দরাজ হৃদয়ের জন্যে।

ডনিথর্পে যাওয়ার দিনকয়েক পরের ঘটনা। রাত্রে খাওয়ার পর টেবিলে বসে গল্পগুজব করছি। আমার বিশ্লেষণী শক্তি আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার গল্প বলছিল ভিক্টর। তখনও অবশ্য জানতাম না এ-শক্তিকে ভবিষ্যতে কী কাজে লাগাব।

ভিক্টরের বাবা সব শুনে মুচকি হেসে বললেন, বেশ তো, আমার সম্বন্ধে দেখি কী বলতে পার।

আমি বললাম, গত এক বছর ধরে মার খাবার ভয়ে আধখানা হয়ে আছেন আপনি।

হাসি মিলিয়ে গেল বুড়োর মুখ থেকে। চোখ বড়ো বড়ো করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার দিকে। তারপর তোক গিলে বললেন, খাঁটি কথা। গত বছর চোরাশিকারীদের দলটা তছনছ করার পর থেকেই আমাকে চোরাগোপ্তা করার ফিকিরে ঘুরছে ওরা। স্যার এডওয়ার্ড হবিকে তো ছুরিও মেরেছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয় সেই কারণেই। কিন্তু বাবা হোমস, তুমি জানলে কী করে?

আপনার লাঠি দেখে। লাঠির ওপর খোদাই করা তারিখটা একবছর আগেকার। একবছর আগে কেনা লাঠির মাথায় কিন্তু ছাদা করে তরল সিসে ঢেলে সাংঘাতিক হাতিয়ার বানিয়েছেন। মারধরের ভয় না-থাকলে এ-রকম অস্ত্র অষ্টপ্রহর কেউ সঙ্গে রাখে না।

আর কী জান বল?

বয়সকালে খুব বক্সিং লড়েছেন।

নাক দেখে বললে বুঝি? ঘুসি খাওয়া থ্যাবড়া নাক নাকি?

কান দেখে বললাম। বক্সারদের কানের মতো আপনার কানও চেপটা আর পুরু।

আর কিছু?

খোঁড়াখুঁড়ি করে হাতে কড়া ফেলেছেন।

সোনার খনি থেকেই যে এত টাকা করেছি।

নিউজিল্যান্ডে ছিলেন এককালে।

এক্কেবারে ঠিক।

জাপানেও ছিলেন।

ঠিক, ঠিক।

এমন একজনকে আপনি চিনতেন যাকে আপনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করছেন। তার নামের প্রথম দুটো অক্ষর–জে. এ.।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন মি. ট্রেভর। বিশাল নীল চোখে ভয়ংকরভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপরেই দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়লেন এঁটোকাটা ছড়ানো টেবিলের ওপর। দেখলাম, অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

এ-রকম একটা কাণ্ড হবে ভাবতেই পারিনি। যাই হোক, চোখ-মুখে জল দেওয়ার পর তো উঠে বসলেন।

কাষ্ঠ হেসে বললেন, বাইরেটা আমার শক্ত হলেও ভেতরটা খুবই কমজোরি। হোমস, কীভাবে এত অনুমান কর জানি না। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। এবং গোয়েন্দাগিরিই তোমার পেশা হওয়া উচিত। গল্পের বা বাস্তবের কোনো গোয়েন্দাই তোমার কাছে পাত্তা পাবে না।

ওয়াটসন, সেই প্রথম মনে হল, শখ করেও যদি এই বিশ্লেষণী শক্তিকে কাজে লাগাই, দু-পয়সা রোজগার করা অসম্ভব হবে না।

মি. ট্রেভর বললেন–এত কথা জানলে কী করে, হোমস? দেখলাম, চোখের তারায় তখনও আতঙ্ক থিরথির করে কাঁপছে।

বললাম, আপনি আস্তিন গুটোতেই দেখেছি কনুইয়ের ভঁজে জে.এ. এই অক্ষর দুটো উল্কি দিয়ে লেখা। কিন্তু বেশ আবছা। ছাল তুলে লেখাটা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বললাম, এককালে নামটা আপনার প্রাণে গাঁথা ছিল, পরে ভুলতে চেয়েছেন।

শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মি. ট্রেভর। বললেন, আশ্চর্য ক্ষমতা বটে তোমার?

সেইদিন থেকে কিন্তু বুড়ো সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন আমাকে। সবসময় ভয়, যেন আরও অনেক জেনে ফেলেছি বা জেনে ফেলতে পারি। ভিক্টরসুষ্ঠু ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। বলেছিল, বাবা দেখছি আর কোনোদিনই তোমাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে

না। ভদ্রলোকের অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছে দেখে ঠিক করলাম চলে আসব। ডনিথর্প ছাড়ব বলে ঠিক করলাম। সেইদিনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

বাগানে বসে ছিলাম তিনজনে। এমন সময়ে ঝি এসে বললে, একটা লোক মি. ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে চায়–এখুনি। মি. ট্রেভর তাকে আনতে বললেন।

ঝিয়ের পেছন পেছন এল একটা বেঁটে মতন শুকনো চেহারার কুটিল-মুখ লোক। চালচলনে চাকরবাকরের মতো ত্রস্ত। হাঁটছে খুঁড়িয়ে। পোশাক সস্তা। হলদে দাঁতে নোংরা কুচুকুরে হাসি। হাত দেখে মনে হয় নাবিক।

লোকটাকে দেখেই হেঁচকি তুলে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন মি. ট্রেভর–ফিরে যখন এলেন, মুখে ব্র্যান্ডির গন্ধ পেলাম।

বললেন, কী চাই?

চোখ কুঁচকে নোংরা হাসিতে এঁটো করা মুখে ঠায় চেয়ে রইল লোকটা। ক্রূর কণ্ঠে বললে, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?

আরে, হাডসন নাকি!

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিরিশ বছর পর দেখা। বেশ তো ঘরবাড়ি বানিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন দেখছি। শুকনো মাংস আর ক-দিন চিবোই বলুন তো?

তাই কি হয়? তাই কি হয়? বলেই হেঁট করে লোকটার কানে কানে কী যেন বললেন মি. ট্রেভর। তারপর জোর গলায় বললেন, পুরোনো দিনের কথা কি ভোলা যায়? যাও, রান্নাঘরে গিয়ে পেট ভরে খেয়ে নাও। তারপর এখানেই চাকরি নিয়ে থেকে যাও।

বাঁচালেন! জাহাজের চাকরিটা গিয়ে অবদি হাত খালি। তাই ভাবলাম আপনার বা মি. বেডোজের কাছে গেলে নিশ্চয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

মি. বেডোজের ঠিকানাও জানো?

সব জানি। পুরোনো দোস্তরা যে কোথায় আছে, সে-খবর রাখি, বলে কুটিল হাসি হাসতে হাসতে ঝিয়ের পেছন পেছন বিদেয় হল লোকটা। বিড়বিড় করে মি. ট্রেভর বললেন, খনিতে যাওয়ার সময়ে জাহাজে আলাপ হয়েছিল। তারপর উঠে গেলেন বাড়ির মধ্যে, কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখলাম মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। আমি থাকায় ভিক্টর খুব অস্বস্তিতে পড়েছে দেখলাম। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই কদর্য লাগল। পরের দিনই চলে এলাম লন্ডনে।

ছুটির শেষের দিকে, মানে সাত সপ্তাহ পরে ভিক্টরের টেলিগ্রাম পেলাম। এখুনি যেতে হবে ডনিথর্পে।

এক ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছিল ভিক্টর। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। উদবেগ উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে, যেন প্রচণ্ড ধকল সয়েছে এই দুটি মাস। প্রাণোচ্ছলতা ওর বৈশিষ্ট্য–কিন্তু তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না–একেবারে ভেঙে পড়েছে।

আমাকে দেখেই প্রথমে বললে, হোমস, বাবা মরতে বসেছে।

সেকী!

স্নায়ুতে দারুণ চোট লেগেছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখব হয়তো আর নেই।

হঠাৎ চোট লাগল কেন?

সেই যে লোকটা বাড়িতে এসেছিল, মনে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আস্ত শয়তান যে, একটা দিনও শান্তি পাইনি সেদিন থেকে। তার জন্যেই বাবার আজ এই অবস্থা। চলো, যেতে যেতে বলছি।

গাড়িতে উঠে বসলাম। ভিক্টর বললে, বাবা ওকে প্রথমে মালির কাজ দেয়, সে-কাজে ওর মন উঠল না, বাবা তখন খাসচাকরের কাজ দিল তাকে। তারপর থেকে বাড়ির চাকরবাকররা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ওর ব্যবহারে। দিনরাত অশ্রাব্য গালিগালাজ, মাতলামি কঁহাতক আর সওয়া যায়। পুরো বাড়িটাই যেন তার, এমনি একটা ভাব দেখাতে লাগল সবসময়। অপমানে গা রি-রি করত যখন দেখতাম বাবার সবচেয়ে ভালো বন্দুক নিয়ে বাবারই নৌকোয় চেপে শিকারে বেরোচ্ছে। এমন একটা ইতরামি একটা বিদ্রুপের ভাব ফুটে বেরোত ওর প্রতিটি কথা আর কাজে যে কতবার ভেবেছি মেরে পাট করে দিই রাসকেলকে। দিলেই বরং ভালো করতাম–বাড়তে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে।

একদিন অপমান করে বসল আমার বাবাকেই আমার সামনে! সেদিনই ঘাড় ধাক্কা দিলাম ঘর থেকে। ভীষণ চোখে বেরিয়ে গেল সে। পরদিন বাবা এসে বললে, হাডসনের কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। বললে, খুব ঝামেলায় পড়েছি, ভিক্টর। একদিন সব জানতে পারবি। সারাদিন ঘর থেকে বেরোল না। দেখলাম, একনাগাড়ে লিখে চলেছে।

সন্ধের দিকে হাডসন এল ঘরে। আমরা তখন খাওয়া সেরে বসে আছি। বাজখাই গলায় বললে, এখানে আর নয়। এবার চললাম মি. বেডোজের কাছে। তিনিও আমাকে মাথায় তুলে রাখবেন।

বাবা যেন সিটিয়ে গেল কথাটা শুনে। বলল, রাগ করে যাচ্ছ না তো?

বিষ-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাডসন বললে, এখনও কিন্তু ক্ষমা চাওয়া হয়নি আমার কাছে।

ভিক্টর, বাবা হুকুম দিল আমাকে, হাডসনের মতো লোক হয় না। ক্ষমাটা চেয়ে নাও।

আমি বেঁকে বসলাম। রক্ত চোখে তাকিয়ে দেখে নেব বলে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল হাডসন। আধঘণ্টা পর বিদেয় হল বাড়ি থেকে।

সেইদিন থেকে বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়ল। সারারাত ঘুমোত না। ঘরে পায়চারি করত।

গতকাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ফোডিব্রিজ পোস্টাপিসের ছাপ-মারা একটা খাম এল বাবার নামে। চিঠিটা পড়েই বাবা কপাল ঠুকতে ঠুকতে উন্মাদের মতো ঘরময় দৌড়াতে লাগল। জোর করে শুইয়ে দিলাম বটে, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম প্যারালিসিস আরম্ভ হয়েছে মুখের একপাশ থেকে দারুণ আঘাতে স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার এল। পক্ষাঘাত ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। জানি না ফিরে গিয়ে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাব কি না।

কী সাংঘাতিক কথা! কী ছিল চিঠিতে?

বলতে বলতে গাড়ি পৌঁছে গেল বাড়িতে। পড়ন্ত আলোয় দেখলাম সব জানলা বন্ধ। কালো পোশাক পরা ডাক্তার বেরিয়ে এল বাইরে।

বললেন, ভিক্টর, তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই উনি দেহ রেখেছেন। মৃত্যুর আগে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তোমাকে একটা কথা বলতে বলে গেছেন।

শোকে দুঃখে ভিক্টর তখন পাথর। কোনোমতে বলল, কী?

ডাক্তার বললেন, কাগজপত্র জাপানি ক্যাবিনেটের পেছনে রইল।

ডাক্তারের সঙ্গে ভিক্টর গেল ভেতরে বাবার মৃতদেহের কাছে।

প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে মি. ট্রেভরের দুর্দান্ত অতীত এবং আমার মুখে জে.এ. নামের আদ্যক্ষর বৃত্তান্ত শুনেই তার জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম। কদাকার হাডসনের আবির্ভাবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন, হাডসন চলে যাওয়ার পর আরও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মি. বেড়োজের কাছে গিয়ে এই হাডসন তাহলে ব্ল্যাকমেলিং শুরু করেছে এবং চিঠিখানায় সেই খবর পেয়েই নিশ্চয় আর সইতে পারেননি। চিঠিখানা দেখতে পেলে এ-রহস্যের কিনারা করা যেত।

এমন সময় ঝি এল আলো হাতে পেছনে ভিক্টর। ওর হাতে একরাশ কাগজপত্র আর একটা চিঠি—সবই তোমাকে এনে দিলাম। চিঠিখানা তখনই পড়লাম : খেল মুরগি এবার

খতম। মুরগিওলা বুড়ো হাডসন কাঁদছে। যত্তো সব গাধার দল। বলে কিনা চালান দিয়েছে লন্ডনে। বলছে, প্রাণ প্রিয় মুরগি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাও। তোমার মুরগিও মরবে।

প্রথমবার পড়ে তোমার মতোই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আবার পড়লাম। নিশ্চয় সংকেতে লেখা চিঠি। আগেই আঁচ করেছিলাম। শব্দগুলো আসলে বেড়াজাল–আসল মানেটাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। মুরগি কথাটার বিশেষ কোনো অর্থ কি ঠিক করা ছিল আগে থেকে? হাডসন শব্দটা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পত্রলেখক মি. বেডোজ—হাডসন নয়। পেছন থেকে পড়লাম। একটা শব্দ ছেড়ে ছেড়ে পড়লাম। তার পরেই ফরসা হয়ে গেল। দেখলাম প্রথম শব্দের পর দুটো করে শব্দ ছাড়তে হবে।

ছোট্ট চিঠি। কিন্তু ভয়ংকর। বুড়ো ট্রেভর অকারণে ঘায়েল হননি।

চিঠিটা এই—খেল খতম। হাডসন সব বলে দিয়েছে। প্রাণ নিয়ে পালাও। মরবে।

ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, মি. বেডোজ কে?

ফি বছর শরৎকালে বাবা ওখানে যেত শিকার করতে।

এ-চিঠি তিনিই লিখে তোমার বাবাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও বিপদে পড়েছেন। হাডসন কী এমন গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে যার জন্যে দুজন সম্ভ্রান্ত মানুষ এতটা। ভয় পেয়েছেন, তা জানা দরকার।

ভিক্টর বললে, হোমস, সে-কাহিনি নিশ্চয় বড়ো মুখ করে বলার নয়, নিশ্চয় বিরাট কোনো অপরাধের ইতিহাস। জানি কলঙ্কের শেষ থাকবে না। হাডসন দেখে নেব বলে শাসিয়ে যাওয়ার পর বাবা সব লিখেছিল। তুমি পড়ো, আমার সাহস নেই।

ওয়াটসন, সেদিন যেভাবে এই কাগজ থেকে আশ্চর্য সেই কাহিনি ভিক্টরকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, আজও তোমাকে সেইভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। শোনো। ওপরে লেখা : ১৮৮৫ সালের আটই অক্টোবর ফলমাউথ থেকে গ্লোরিয়া স্কট জাহাজ রওনা হওয়ার পর ১৫° ২৯ নর্থ ল্যাটিচিউডে ও ২৫° ১৪ ওয়েস্ট লঙ্গিচিউড়ে পৌঁছে ছয়ই নভেম্বর জাহাজ ধ্বংস হয় কীভাবে, তার বর্ণনা।

প্রিয় ভিক্টর, যে-অপরাধ আমি করেছিলাম, তার শাস্তি পেতে চলেছি। মানসম্মান ধুলোয় লুটোতে চলেছে। সব তোমাকে জানিয়েছি। পড়বার পর পুড়িয়ে ফেলো।

হয় আমাকে গ্রেপ্তার হতে হবে অথবা আঘাতের আকস্মিকতায় মারা যেতে পারি। সেক্ষেত্রে এ-কাহিনি নিয়ে লুকোছাপার আর দরকার নেই।

আমার নাম ট্রেভর নয়... জেমস আর্মিটেজ। আদ্যক্ষর, জে.এ.। কনুইয়ের ভাজে উল্কি দিয়ে লেখা আদ্যক্ষর দুটো মুছে ফেলার চেষ্টা করেও পারিনি, তোমার বন্ধু ধরে ফেলেছিল। ভয় হয়েছিল, হয়তো আমার গুপ্ত কাহিনি সে জানে।

জেমস আর্মিটেজ নামে আমি লন্ডনের এক ব্যাঙ্কে চাকরি করার সময়ে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করি। একটা দেনা শোধ করার জন্যেই এই কুকর্ম করেছিলাম। আর একটা টাকা পাওয়ার আশা ছিল, সেটা পেলেই ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দিতাম, কেউ জানতে পারত না।

কিন্তু সব ফাঁস হয়ে গেল... প্রত্যাশিত টাকা আর পেলাম না। চুরির দায়ে মাত্র তেইশ বছর বয়সে সাঁইত্রিশ জন অপরাধীর সঙ্গে শেকলে বেঁধে আমাকে চালান করা হল অস্ট্রেলিয়ায়, গ্লোরিয়া স্কট জাহাজে।

জাহাজটা কাঠের। ভীষণ ভারী। সেকেলে জাহাজ বলে চীনদেশে চায়ের কারবারে কাজে লাগত। সবসুদ্ধ লোক ছিল এক-শো। আটত্রিশ জন কয়েদি... বাদবাকি নাবিক, সৈন্য আর জাহাজি অফিসার। সময়টা ১৮৫৫ সাল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে। কয়েদি জাহাজের অভাবে এই জাহাজটাই কাজে লাগাল সরকার।

কয়েদি জাহাজ নয় বলেই ঘরের দেওয়ালগুলো হালকা কাঠ দিয়ে তৈরি, তেমন মজবুত নয়। আমার পাশের ঘরে সাড়ে ছ-ফুট লম্বা একজন কয়েদি থাকত। ভীষণ হুল্লোড়বাজ। সব সময়ে হইচই করত। দেমাকি। পরিষ্কার মুখ, পাতলা নাক, চওড়া চোয়াল। মনের

জোর যে খুব বেশি, ওই অবস্থাতেই অত ফুর্তি দেখেই বোঝা যেত। একদিন রাতে কানের কাছে শুনলাম তার খাটো কণ্ঠস্বর।

দেখি কি, মাঝের পাতলা দেওয়াল ফুটো করে ফেলে মুখ বাড়িয়ে আছে সে। পরিচয় হল তখনই। নাম তার জ্যাক প্রেন্ডারগাস্ট। বড়ো ঘরের ছেলে। কিন্তু অপকর্মে ওস্তাদ। লন্ডনের বেশ কয়েকটা কারবারি মানুষের পকেট হালকা করে দিয়েছিল অদ্ভুত কৌশলে।

ওর মুখেই শুনলাম, ধরা পড়লেও সে নগদ আড়াই-লক্ষ পাউন্ড সে লুকিয়ে রেখেছে পরে ভোগ করবে বলে। ফিসফিস করে বললে, ওহে, তুমি কি মনে কর এই পচা কাঠের চীনে জাহাজে আমি মরতে এসেছি? টাকা যখন আছে, তখন তা ভোগও করব। দেখ না কী করি, ঠিক পালাব। তোমারও একটা হিল্লে হবে।

তারপর জানলাম বারোজন কয়েদির সঙ্গে জাহাজ দখলের ষড়যন্ত্র করেছে জ্যাক প্রেডারগাস্ট। আমার বাঁ-পাশের কেবিনের ইভান্স বলে কয়েদিও আছে সেই দলে। সে এখন দক্ষিণ ইংলন্ডে রাজার হালে থাকে, আমার মতোই নাম পালটেছে।

ষড়যন্ত্রের মূল হোতা জাহাজের পুরুত-ঠাকুর স্বয়ং, জ্যাকের পুরোনো দোস্ত। জলের মতো টাকা ঢেলে সে হাত করেছে নাবিকদের। দুজন ওয়ার্ডার আর দুজন মেট-ও হাতে এসে গেছে। সৈন্য, ডাক্তার, ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্টদের নিয়ে পঁচিশজন জানে না এই চক্রান্ত-কাহিনি, তারাই আমাদের শত্রু। এই কয়েকজনকে খতম করে জাহাজ দখল করতে হবে।

গুণধর পুরুত-ঠাকুর গোড়া থেকে নাবিক সাজিয়ে মারদাঙ্গা-স্যাঙাতদের জাহাজে তুলেছিল। এখন কয়েদিদের ঘরে ঘরে ব্যাগভরতি ধর্মের বইয়ের সঙ্গে দিয়ে গেল উকো পিস্তল, বারুদ আর গুলি। প্রত্যেকের বালিশের নীচে জমা হল অস্ত্রশস্ত্র।

যেদিন জাহাজ দখল করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, তার আগেই কিন্তু লেগে গেল হাঙ্গামা। সমুদ্রে রওনা হওয়ার তিন হপ্তা পরে সন্ধের দিকে একজন অসুস্থ কয়েদিকে দেখতে এসেছিল ডাক্তার। বালিশের তলায় হাত ঠেকে যেতে পিস্তল দেখে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে সে। বেগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে বেঁধে ফেলা হয় বিছানায়। পিস্তল হাতে ছুটে বেরিয়ে যায় কয়েদিরা। দমাদম গুলি চালিয়ে জনা ছয়েককে খুন করে ফেলা হয় চক্ষের নিমেষে। ক্যাপ্টেনের খুলি উড়িয়ে দেয় পুরুত-ঠাকুর নিজে।

ব্যস, জাহাজ দখলে এসে গেল ভেবে আনন্দে আত্মহারা সবাই। বড়ো কেবিনে মদের বোতল খুলে সবাই যখন গলায় মদ ঢালছি, এমন সময়ে এক আঁক গুলি উড়ে এল ঘরের মধ্যে। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল আমাদের ন-জন রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে মেঝের ওপর–টেবিলে রক্ত আর মদ গড়িয়ে যাচ্ছে।

দেখেই প্রেভারগাস্ট বিকট চেঁচিয়ে মূর্তিমান শয়তানের মতো ধেয়ে গেল বাইরে। অসীম সাহস তার। জাহাজের পেছনে ঘরের ঘুলঘুলি ভেঙে লেফটেন্যান্ট দশ জন সৈন্য নিয়ে গুলিবর্ষণ করেছিল আমাদের ওপর। বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার সময় পর্যন্ত দিল না প্রেন্ডারগাস্ট। আমাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেল।

প্রেডারগাস্টের কাঁধে তখন যেন শয়তান ভর করেছে। আহত সৈন্যদেরও তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। একজন জখম অবস্থাতেও সাঁতরে আসছে দেখে গুলি করে উড়িয়ে দিল খুলি। বেঁচে রইল কেবল কয়েকজন ওয়ার্ডার, মেট আর ডাক্তার মোট পাঁচজন।

এই পাঁচজনকে মেরে ফেলা হবে কি বাঁচিয়ে রাখা হবে–এই নিয়ে ঝগড়া লাগল আমাদের মধ্যে। নৃশংস প্রেন্ডারগ্রাস্ট আর তার পিশাচ স্যাঙাতরা পাঁচজনকেই খতম করে দিতে চাইল। কিন্তু আমরা পাঁচজন কয়েদি আর তিনজন নাবিক নিরস্ত্র কাউকে খুন করতে চাইলাম না। সশস্ত্র সৈন্যদের মারা যায় এদের ছেড়ে দেওয়া হোক।

কথা কাটাকাটি চরমে পৌঁছোতে প্রেন্ডারগ্রাস্ট আমাদের একটা নৌকোয় চেপে বিদেয় হতে বললে। আমরা সেই ব্যবস্থাই মেনে নিলাম। চার্ট আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ভেসে পড়লাম নৌকোয়।

ইভান্স আর আমি চার্ট দেখে নৌকো চালাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম প্রচণ্ড শব্দে গ্লোরিয়া স্কট ফেটে উড়ে গেল। মেঘগর্জনের মতো গুরু গুরু শব্দ ধেয়ে গেল দিকে দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো কালো ধোঁয়া ঠিকরে গেল আকাশের দিকে।

তক্ষুনি নৌকো ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে চললাম সেইদিকে। গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, গ্লোরিয়া স্কট ততক্ষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

হতাশ হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময়ে আর্ত চিৎকার শুনে ফিরে দেখি ভাঙা কাঠের ওপর শুয়ে আছে একজন ছোকরা নাবিক। নাম হাডসন। সারাশরীর পুড়ে গেছে। অপরিসীম ক্লান্ত।

পরের দিন সকালে তার মুখে শুনলাম কী কাণ্ড ঘটেছিল গ্লোরিয়া স্কটে। পাঁচজনকে একে একে খুন করা হয়। ডাক্তারের টুটি কাটে প্রেডারগাস্ট স্বয়ং। একজন মেট বাঁধন খুলে পালিয়ে যায় জাহাজের খোলে। সেখানে এক-শোটা বারুদভরতি পিপের পাশে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে সে হুমকি দিয়েছিল, কাছে এলেই বারুদে আগুন দেবে। তারপরেই ঘটে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ। হাডসনের বিশ্বাস, দেশলাইয়ের আগুন নয়... মারমুখখা কয়েদিদের পিস্তলের গুলি ফসকে গিয়ে লেগেছিল একটা পিপেতে।

যাই হোক, গ্লোরিয়া স্কট ধ্বংস হল এইভাবে। পরের দিন অস্ট্রেলিয়াগামী একটা জাহাজে ঠাঁই পেলাম আমরা। সিডনি পৌঁছে নাম পালটে নিলাম আমি আর ইভান্স। খনি অঞ্চলে গেলাম। বিদেশিদের মধ্যে মিশে গেলাম। নিজেদের আগের পরিচয় মুছে গেল। অনেক টাকা নিয়ে দেশে ফিরলাম, জমিদার হলাম। কুড়ি বছর শান্তিতে কাটানোর পর মূর্তিমান উপদ্রব হয়ে এল সেই হাডসন–যাকে ভাঙা কাঠের ওপর থেকে তুলে এনে প্রাণে বাঁচিয়েছিলাম।

সে জানে আমার দুর্বলতা কোথায়। কেন তাকে রাগাতে চাই না। তাই ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। ভিক্টর, তোমার সহানুভূতি যেন আমি পাই।

এর নীচে কাঁপা হাতে লেখা–সংকেতে খবর পাঠিয়েছে বেড়োজ–হাডসন সব ফাঁস করে দিয়েছে!

ওয়াটসন, এই হল গ্লোরিয়া স্কট জাহাজের অত্যাশ্চর্য কাহিনি। ভিক্টরের মন ভেঙে যায়। টেরাইতে চলে যায় চাষবাসের কাজ নিয়ে। বেডোজ আর হাডসন দুজনের আর খবর পাওয়া যায়নি। হয় হাডসন বেডোজকে খুন করেছে, অথবা বেডোজ হাডসনকে খুন করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। মি. ট্রেভর কিন্তু স্রেফ আতঙ্কে মারা গিয়েছিলেন–হাডসন আদৌ পুলিশে খবর দেয়নি–মিথ্যে ভয় দেখিয়েছিল।

ওয়াটসন, যদি মনে কর, আমার এই প্রথম রহস্যভেদের কাহিনি কাজে লাগাতে পারো।

———-

টীকা :

কাঠের জাহাজ গ্লোরিয়া স্কট : দ্য গ্লোরিয়া স্কট প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলির ১৫ এপ্রিল ১৮৯৩ তারিখের সংখ্যায়।

কলেজে : কোন কলেজে পড়তেন শার্লক হোমস? তার তলোয়ার খেলা এবং বক্সিং-এর প্রতি অনুরাগ থেকে গবেষকদের মতে, তার কলেজ হল অক্সফোর্ড।

ভিক্টরের বুলটেরিয়ার কুকুরটা : সেই সময়ে ইংলন্ডের বেশিরভাগ কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে কুকুর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়।

ডনিথর্প : ইংলন্ডের মানচিত্রে এই নামে কোনো এলাকা, শহর বা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডিপথেরিয়ায় : জীবাণুঘটিত ছোঁয়াচে অসুখ ডিপথেরিয়ায় বেশিরভাগ আক্রান্ত হত শিশুরা। গলায় একটি আস্তরণ তৈরি হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি হয় এই রোগে। ঊনবিংশ শতকে এই রোগের মহামারি প্রায়ই দেখা যেত। ১৯২৮-এ আলেকজান্ডার ফ্লেমিঙের আবিষ্কার পেনিসিলিন এই রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

স্যার এড়োয়ার্ড হবি : একই নামে একজন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা প্রথম জেমসের রাজসভার বিশিষ্ট সভাসদ। জীবৎকাল ১৫৬০ থেকে ১৬১৭।

হাডসন : হাডসন নামের একাধিক চরিত্র শার্লক হোমসের বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা গিয়েছে। হোমসের হাউসকিপার মিসেস হাডসন ছাড়াও দ্য সিক্স নেপোলিয়ন গল্পের মর্স হাডসন, দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস গল্পের আমেরিকাপ্রবাসী হাডসন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

চালান করা হল অস্ট্রেলিয়া : ইংলন্ডের কয়েদিদের প্রথম দিকে চালান করা হত আমেরিকায়। আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার পর ১৭৮৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় কয়েদি

পাঠানো শুরু হয়। প্রথম খেপে এগারোটি জাহাজে প্রায় এক-শো মেয়ে-পুরুষকে পাঠানো হয়েছিল সিডনির নিকটবর্তী বটানি বে-তে। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভ্যান ডিয়েমেন ল্যান্ড বা আজকের টাসমানিয়ায় কয়েদি পাঠানো হয়েছে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত।

গ্লোরিয়া স্কট জাহাজে : শার্লক হোমসের বিভিন্ন গল্পে বর্ণিত প্রতিটি জাহাজের নাম কোনো মহিলার নামে; লক্ষ করেছেন রিচার্ড ডবলু, ক্লার্ক। গ্লোরিয়া ছাড়াও আছে নোরা এবং সোফি। দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পের জাহাজ নোরা ক্রেইনা, দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপস গল্পের জাহাজ সোফি অ্যান্ডারসন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সার্ডিনিয়া এবং অটোমান তুর্কদের যৌথবাহিনীর এই যুদ্ধ চলেছিল ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত।

টেরাই : বা তরাই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে এবং নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এলাকা। ইংরেজরা তরাই অঞ্চলে আসত প্রধানত চা চাষের কারণে।

গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা

[দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রিটার]

শার্লক হোমসের তিন কুলে কেউ আছে জানা ছিল না। এতদিনের মেলামেশায় কক্ষনো বলেনি ছেলেবেলার কাহিনি অথবা আদৌ কোনো আত্মীয়স্বজন আছে কি না। সেই কারণেই আমার ধারণা হয়েছিল ও একটা হৃদয়হীন মস্তিষ্কময় যুক্তিসর্বস্ব যন্ত্রবিশেষ। মেয়েদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। আবেগ-টাবেগের ধার ধারে না এবং নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। বাপ-মা ছেলেবেলাতেই মায়া কাটিয়েছেন, এ-সংসারে সে একেবারে একা।

তাই একদিন ওর মুখেই যখন শুনলাম ওর একজন ভাই আছে, পিলে চমকে উঠল আমার।

কথাটা উঠল একদিন বিকেলের দিকে চা খাওয়ার পর। এলোমেলো হাজারো বিষয় আলোচনা করতে করতে মানুষ রক্তসূত্রে কতটা শেখে এবং নিজের চেষ্টায় কতটা শেখে, এই নিয়ে আরম্ভ হল কথাবার্তা।

আমি বললাম, তুমি নিজেই নিজেকে গড়েছ! অদ্ভুত এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর পর্যবেক্ষণ শক্তি তোমার নিজস্ব ব্যাপার।

আনমনা হয়ে হোমস বললে, কিছুটা তাই। গাঁইয়া জমিদারের বংশে জন্মেছি আমি, সেই জীবনধারার কিছুটা আমার রক্তেও এসেছে। ঠাকুমা ছিলেন ফরাসি শিল্পী ভের্নের বোন। শিল্পীয় তন্ময়তা আর পর্যবেক্ষণ শক্তি নাতির রক্তেও তাই রয়ে গেছে। কিন্তু এ-তন্ময়তা যে রক্তসূত্রে পেয়েছ, তার কী প্রমাণ? আমার ভাই মাইক্রফটের মধ্যেও এ-গুণ আছে, বেশিমাত্রায়।

শুনে হাঁ হয়ে গেলাম আমি। এ যে একেবারে নতুন খবর; কিন্তু তা কী করে হয়? হোমসের চাইতেও তুখোড় যুক্তিবাদীর সংবাদ লন্ডনের কাকপক্ষীও জানতে পারল না, এ কি সম্ভব? নিশ্চয় বিনয় করে নিজেকে ছোটো করছে হোমস। কথাটা বলতে গেলাম, কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিল হোমস।বলল, বিনয় জিনিসটা আর যাই হোক একটা সৎ গুণ নয়। সত্যের অপলাপ করাটা কি ভালো? কট্টর যুক্তিবাদী কখনো সত্যকে খামোকা ছোটো করে বা অযথা বড়ো করে জাহির করে না, যা দেখে, তাই বলে! আমি যখন বলছি মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার চেয়ে ঢের বেশি, তুমি ধরে নিতে পার কথাটা সত্যি, এর মধ্যে বিনয়ের মিথ্যে প্রলেপ নেই।

তোমার ছোটো ভাই?

বড়ো দাদা–সাত বছরের ব্যবধান।

তবে তাকে কেউ চেনে না

কেন?

নিজের মহলে সবাই তাকে চেনে।

সে-মহলটা কোথায়?

ডায়োজিনিস ক্লাবে।

নামটা নতুন আমার কাছে। হোমস তা বুঝে ঘড়ি দেখে বলল, ডায়োজিনিস ক্লাব হল লন্ডনের কিছু আশ্চর্য লোকের আড্ডাখানা। মাইক্রফট নিজেও একজন আশ্চর্য মানুষ। প্রত্যেকদিন পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা কুড়ি পর্যন্ত ক্লাবে থাকে সে। এখন ছ-টা বাজে, ইচ্ছে থাকলে আশ্চর্য একটা ক্লাব আর তার চাইতেও আশ্চর্য একটি মানুষের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পার।

মিনিট পাঁচেক পরে রিজেন্ট সার্কাসের দিকে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শার্লক হোমস বললে, ভাবছ আশ্চর্য এই ক্ষমতাকে কাজে লাগায় না কেন দাদা? কারণ আর কিছুই না, সে-ক্ষমতা তার নেই।

কিন্তু এক্ষুনি যে বললে—

বলেছি, চোখ দিয়ে আর মন দিয়ে বিচার করার ব্যাপারে আমি তার কাছে ছেলেমানুষ। শুধু চেয়ারে বসেই যদি এ-কাজ করা যেত তাহলে এই পৃথিবীতে তার চাইতে বড়ো সত্যান্বেষী আর থাকত না কিন্তু সে-রকম কোনো উচ্চাশা বা বাসনাই তার মধ্যে নেই। যুক্তি দিয়ে বিচার করার পর হাতেনাতে যাচাই করা দরকার, আদালতে পেশ করার উপযুক্ত করে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মামলা সাজানো দরকার কিন্তু সে-ব্যাপারে ওর কোনো উৎসাহ নেই। ও শুধু চেয়ারে বসেই বলে দেবে কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক। পরে আমি মিলিয়ে দেখেছি সত্যিই ঠিক বলেছে দাদা। বহুবার বহু গোলমেলে ব্যাপারে ওর পরামর্শ নিয়েছি–কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে মামলা সাজানোর কোনো ক্ষমতাই নেই মাইক্রফটের।

বিশেষ এই ক্ষমতা খাঁটিয়ে রুটি রোজগারের ধান্দায় উনি নেই বলছ?

একেবারে নেই। আমার কাছে যা জীবিকা ওর কাছে তা শখ ছাড়া কিছুই নয়। অঙ্কে তুখোড়। সরকারি দপ্তরে হিসেবের খাতা দেখে। থাকে পলমল-এ। ব্যায়াম বলতে সকাল-সন্ধে রাস্তার মোড় পর্যন্ত পায়চারি। বাড়তি সময় কাটায় আশ্চর্য এই ডায়োজিনিস ক্লাবে আর কোথাও নয়।

এই প্রথম শুনলাম ডায়োজিনিস ক্লাবের নাম।

তুমি কেন, অনেকেই এ-ক্লাবের নাম শোনেনি। তার কারণ, ক্লাবের সদস্যরা নিজেরাই মুখ-টেপা, লাজুক এবং মিশুকে মোটেই নয়। মনুষ্য-সংসর্গ এদের ভালো লাগে না কিন্তু

চেয়ারে গাট হয়ে বসে নতুন নতুন ম্যাগাজিন পড়তে পেলে আর কিছু চায় না। সাধারণ ক্লাবের গুলতানি এদের দু-চোখের বিষ। তাই ডায়োজিনিস ক্লাবের পত্তন ঘটেছে শুধু এদের জন্যেই। এখানে প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন থাকে পাশের লোক সম্বন্ধে কৌতূহল দেখায় না–গায়ে পড়ে আলাপ করতে যায় না–দর্শনার্থীদের ঘর ছাড়া ক্লাবঘরের মধ্যে বকবক করে না। পরপর তিনবার এর অন্যথা ঘটলে সভ্য-পদ থেকে নাম পর্যন্ত খারিজ হয়ে যেতে পারে। আমার দাদাটি বিচিত্র এই ডায়োজিনিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ওয়াটসন, এ-ক্লাবের পরিবেশটা আমারও খুব ভালো লাগে।

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম ডায়োজিনিস ক্লাবে। ভেতরে ঢোকার আগেই আমাকে মুখে চাবি দিয়ে থাকতে বলল হোমস। বসবার ঘরের দিকে যাওয়ার পথে দেখলাম বিস্তর লোক হল ঘরে খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসে আছে–কেউ কারো সাথে বাক্যবিনিময় করছে না। বসবার ঘরে আমাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল হোমস। একটু পরেই ফিরে এল যাঁকে নিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি তার সহোদর ভাই মুখচ্ছবিতেই তার স্পষ্ট স্বাক্ষর। সেইরকম তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনি চলতে ফিরতেও যেন ধ্যান করছেন নিজের মনে। অথচ এই ধ্যানস্থ আত্মনিমগ্ন সুদূরের চাহনি শার্লক হোমসের চোখে কেবল কূট সমস্যা সমাধানের সময়েই দেখেছি—সবসময়ে নয়। চোখ দুটো অদ্ভুত হালকা রঙের পিচ্ছিল পারার মতো তরল ধূসর আভায় সমুজ্জ্বল। তফাতের মধ্যে শার্লক হোমসের চাইতে ইনি অনেক বেশি দোহারা চেহারা এবং বেজায় মোটা। পেটাই গড়ন, মুখ ভারী হলেও ছোটো ভাইয়ের মতোই ধারালো।

আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আপনার কলমের দৌলতে শার্লকের কীর্তিকাহিনি তো এখন লোকের মুখে মুখে। ভালো কথা, শার্লক, আমি ভেবেছিলাম ম্যানর হাউসের সেই কেস নিয়ে গত সপ্তাহে আসবি। হালে পানি পাসনি বোধ হয়?

অট্টহেসে শার্লক হোমস বললে, ঠিক উলটো। কিনারা করে ফেলেছি।

অ্যাডামসই নিশ্চয় নাটের গুরু?

তা আর বলতে।

গোড়াতেই আঁচ করেছিলাম, বলে ভাইকে নিয়ে জানলার ধারে বসলেন মাইক্রফট হোমস–মানুষের চরিত্র নিয়ে কত গবেষণাই-না করা যায় এই জানলা থেকে। মিনিটে মিনিটে হরেক রকমের নমুনা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। যেমন ধর, ওই লোক দুটো।

একজন তো দেখছি বিলিয়ার্ড খেলার হিসেব রাখে।

ধরেছিস ঠিক। অপর জন?

লোক দুজন ততক্ষণে জানলার সামনে এসে গেছে। বিলিয়ার্ড খেলার হিসেব রাখে যাকে বলা হল, তার ওয়েস্টকোটের পকেটে কয়েকটি খড়ির দাগ ছাড়া বিলিয়ার্ড খেলার কোনো চিহ্ন সর্বাঙ্গে দেখলাম না। দ্বিতীয় ব্যক্তি খর্বকায়, গাঢ় রঙের মানুষ। টুপি পেছনে

হেলাননা, বগলে খানকয়েক পুলিন্দা। শার্লক হোমস বিনা বাধায় বললে, এককালে সৈন্য ছিল।

সম্প্রতি রিটায়ার করেছে, ততোধিক ঝটিতি ধুয়ো ধরলেন মাইক্রফট হোমস।

ভারতবর্ষে ডিউটি দিয়েছে।

সনন্দ-বিহীন অফিসার।

খুব সম্ভব গোলন্দাজ বাহিনীর।

বিপত্নীক।

কিন্তু একটা বাচ্চা আছে।

একটা নয় রে, অনেকগুলো, বললেন মাইক্রফট।

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, থামুন! থামুন! মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

শার্লক হোমস বললে, ভায়া, যার চেহারা রোদে পুড়ে কালচে মেরে গেছে, চালচলন যার বেশ ভারিক্কি, সে যে কর্তৃত্বব্যঞ্জক, উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষ এবং সদ্য ভারতবর্ষ থেকে এসেছে, তা আঁচ করা কি খুব কঠিন?

মাইক্রফট হোমস সঙ্গেসঙ্গে বললেন, পায়ের গোলাগুলি-মার্কা বুট দেখেও তো বোঝা যায় সবে মিলিটারির কাজ ছেড়েছে।

ঘোড়সওয়ার সৈন্য নয়, অথচ ভুরুর একদিকের হালকা রং দেখে বোঝা যাচ্ছে কাত করে টুপি পরত। ওইরকম ওজনের লোক মাটি কাটার কাজও করে না। তাই বললাম, গোলন্দাজ বাহিনীতে থেকেছে এতদিন।

মাইক্রফট বললেন, আপাদমস্তক অশৌচের বেশ দেখে বুঝলাম নিশ্চয় অত্যন্ত প্রিয়জন কাউকে হারিয়েছে। বাজার-হাট নিজেই যখন করছে, প্রিয়জনটি নিশ্চয় স্ত্রী। জিনিস কিনছে বাচ্চাদের জন্যে। ঝুমঝুমি দেখে বুঝলাম, একটি বাচ্চা নেহাত শিশু। সম্ভবত আঁতুড়েই মারা গেছে স্ত্রী। বগলে ছবির বই নেওয়ার কারণ শিশু ছাড়াও আর একটা বড়ো বাচ্চা ঘরে আছে।

শার্লক হোমস বলেছিল, দাদার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নাকি অনেক বেশি। এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কচ্ছপের খোলের নস্যিদানি বার করে নস্যি দিলেন মাইক্রফট। বিরাট একটা লাল সিল্কের রুমাল দিয়ে বাড়তি গুঁড়ো ঝেড়ে ফেললেন।

বললেন, শার্লক, একটি আশ্চর্য রহস্য হাতে এসেছে। শুনবি?

বলো, বলল, বলে ফেললা, লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

নোটবই বার করে পাতা ছিঁড়ে কী লিখলেন মাইক্রফট। বেয়ারাকে ডেকে চিরকুটটা দিলেন তার হাতে।

বললেন, মি. মেলাসকে ডাকতে বললাম। ভদ্রলোক জাতে গ্রিক, পেশায় দোভাষী, নিবাস আমার ওপরতলায়। হোটেলে যেসব টাকার কুমিররা আসে, তাদের সেবা করে পেট চালান। গাইডের কাজ আর কি। কখনো-সখনো আইন-আদালতে দোভাষীর কাজ করেন।

মিনিট কয়েক পরেই ঘরে ঢুকলেন খর্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি। আঁটসাঁট মজবুত চেহারা। জলপাই রঙের মুখ আর কয়লা-কালো চুল দেখেই মালুম হয় মাতৃভূমি দক্ষিণাঞ্চলে কথাবার্তা কিন্তু শিক্ষিত ইংরেজের মতো। সাগ্রহে করমর্দন করলেন শার্লক হোমসের সঙ্গে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞটির সমীপে নিজের বিচিত্র কাহিনি নিবেদন করার সুযোগ পাওয়ায় খুশির রোশনাই ঝিলমিলিয়ে উঠল তার দুই চোখে।

বললেন কাঁচুমাচু মুখে, পুলিশ তো আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করছে না। কিন্তু মুখে পট্টিওয়ালা লোকটার কী হাল হল না-জানা পর্যন্তও যে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

আমাকে বলুন, বলল শার্লক হোমস।

ঘটনাটা ঘটে দু-দিন আগে–সোমবার। আমার মাতৃভাষা গ্রিক–তাই বেশির ভাগ ওই ভাষাতেই দোভাষীর কাজ করি। কিন্তু প্রায় সব ভাষাই আমি জানি। লন্ডনের সব হোটেলেই আমাকে চেনে।

বিদেশি পর্যটকরা ফাঁপরে পড়লেই আমাকে তলব করে। তাই অনেক সময়ে গভীর রাতেও আমার ডাক পড়ে। সোমবার রাতে মি. ল্যাটিমারকে দেখে তাই অবাক হইনি।

ভদ্রলোক নীচে গাড়ি রেখে ওপরে এলেন। তার এক গ্রিক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না–গ্রিক ছাড়া তিনি কিছু জানেন না। বাড়ি তার কেনসিংটনে–কাছেই।

তাড়াহুড়ো করে আমায় নামিয়ে এনে গাড়িতে তুললেন মি. ল্যাটিমার। কিন্তু সোজা পথে–গিয়ে গাড়ি চলল ঘুরপথে। কারণটা জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যে হাঁ হয়ে গেলাম আমি।

উনি বসে ছিলেন আমার মুখোমুখি। হঠাৎ সিসে দিয়ে ভারী করা একটা সাংঘাতিক লাঠি পকেট থেকে বার করে সামনে পেছনে দুলিয়ে হাতে বাড়ি মেরে ওজনটা পরখ করলেন, রাখলেন পাশে সিটের ওপর! তারপর ঝপাঝপ করে বন্ধ করে দিলেন জানলাগুলো।

তখনই দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটা জানলা কাগজ দিয়ে ঢাকা–যাতে বাইরে দেখতে না-পাই।

বললেন, মি. মেলাস, বুঝতেই পারছেন, কোথায় যাচ্ছেন আপনাকে তা জানাতে চাই।

ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে আমার তখন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। লাঠি বাদ দিলেও মি. ল্যাটিমার শক্তিমান পুরুষ। ইয়া চওড়া কাঁধ। হাতাহাতি করেও সুবিধে করতে পারব না।

তাই তো-তো তোতলাতে তোতলাতে বললাম, এটা কীরকম হল, মি. ল্যাটিমার?

মি. মেলাস, চেঁচামেচি করবেন না–বিপদে পড়বেন। মনে রাখবেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানেন না।

কথাগুলো খুব ঠান্ডাভাবে বলা হলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বেশ বুঝলাম, পড়েছি যবনের হাত খানা খেতে হবে সাথে। বাধা দিতে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

তাই বসে রইলাম মুখে চাবি এঁটে। ঝাড়া দু-ঘণ্টা নানা পথঘাট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। ঝট করে দরজা খুলে চট করে আমাকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হল নীচু খিলেন দেওয়া একটা দরজার ভেতরে। পলকের জন্যে দেখলাম দু-পাশের গাছের সারিওলা একটা লন।

ভেতরে একটা ম্যাড়মেড়ে রঙিন আলো জ্বলছে। দেওয়ালে ছবি ঝুলছে। বেশ বড়ো ঘর। দরজা খুলছে ইতর চেহারার চোয়াড়ে টাইপের গোল কাধওলা একটা মর্কটাকৃতি বেঁটে লোক। চোখে চশমা। মধ্যবয়স্ক। নোংরা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মি. মেলাস নাকি? এই ভাবে জামাই আদরের জন্যে রাগ করবেন না। কিন্তু চালাকিও করতে যাবেন না। তাহলেই—

বলে, আবার খি-খি করে এমন একটা রক্ত-জল-করা হাসি হাসল যে লোম-টোম খাড়া হয়ে গেল আমার।

একজন গ্রিক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবেন। আমাদের প্রশ্ন তাকে শোনাবেন তার জবাব আমাদের বলবেন। যা জিজ্ঞেস করতে বলব তার বেশি একটা কথাও বলতে যাবেন না। কৌতূহল দেখাতে যাবেন না। যদি দেখান আবার সেই রক্ত-জল-করা খি-খি হাসি হেসে মর্কট বাঁটুল বললে এমন টাইট দেব যে অনুশোচনার আর অন্ত থাকবে না– তখন ভাববেন, আহা রে! কেন মরতে জন্মাতে গেলাম পৃথিবীতে।

কথার মাঝেই খুলে গেল একটা দরজা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পাশের ঘরে। দামি দামি ফার্নিচার আর পা-ডুবে-যাওয়া কার্পেট দিয়ে সাজানো ঘর। একটু পরেই প্রায় ধরে ধরে এক ব্যক্তিকে আনা হল সেই ঘরে। কাছে আসতেই ক্ষীণ আলোয় দেখলাম তার মুখের চেহারা। আঁতকে উঠলাম সেই মুখ দেখে। মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা অব্যক্ত বেদনায়। সারামুখে তার অজস্র পটি–প্লাস্টার আর প্লাস্টার। একটা বিরাট প্লাস্টার দিয়ে

মুখটা বন্ধ কথা বলার জো নেই। দেহে শক্তি এক বিন্দুও নেই, কিন্তু মন এখনও নুয়ে পড়েনি। অপরিসীম আত্মবল ধক ধক করে জ্বলছে বিশাল দুই চোখে।

লোকটাকে একটা চেয়ারে বসানো হল বটে, কিন্তু তা না-বসারই শামিল। যেকোনো মুহূর্তে ঘাড় মুচকে ধড়াস পড়ে যাবেন মনে হল।

মাঝবয়েসি লোকটা বলল, হ্যারল্ড, ওঁর হাত খোলা আছে। পেনসিলটা হাতে দাও। মি. মেলাস, আপনি জিজ্ঞেস করবেন, উনি লিখে জবাব দেবেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করুন, কাগজপত্রে সই দেবেন কি না?

মুমূর্ষ গ্রিকের বিশাল চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল এই প্রশ্নে। গ্রিক ভাষায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে স্লেটে জবাব লিখলেন, কখনোই না।

কোনো শর্তেই নয়? ইতর লোকটার প্রশ্ন তরজমা করলাম আমি।

একটাই শর্ত, গ্রিক পুরুতের সামনে ওর বিয়ে দিতে হবে।

কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে দেখছি।

পরোয়া করি না।

এইভাবে চলল কথাবার্তা। আমি জিজ্ঞেস করছি, উনি লিখে জবাব দিচ্ছেন। একই প্রশ্ন আর জবাব ঘুরে ফিরে এল প্রশ্নোত্তরের মধ্যে। কাগজপত্তর সই করবেন কি না, এই কথার একটাই জবাব দিয়ে গেলেন উনি, কখনোই না। সীমাহীন ঘৃণা যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরুল জবাব লেখার ধরনে। এই সময়ে মতলব এল মাথায়। সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিলাম। যেটুকু জিজ্ঞেস করতে বলা হল আমাকে, তার চেয়ে একটু বেশিই জিজ্ঞেস করলাম এবং জবাবটা নিজের মনেই জমিয়ে রাখলাম–শয়তানদের কাছে চেপে গেলাম।

কীরকমভাবে চালাকিটা খেললাম শুনুন :

কেন গোঁয়ারতুমি করছেন? কে আপনি?

বেশ করছি। লন্ডনে আমি নবাগত।

অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যু। কদ্দিন এসেছেন?

হোক না মৃত্যু। তিন সপ্তাহ।

এ-সম্পত্তি এ-জীবনে আপনি পাবেন না। কী হয়েছে আপনার?

আমি না-পাই, শয়তানের বাচ্চাদেরও দোব না। না-খাইয়ে রেখেছে আমাকে।

সইটা করলেই ছেড়ে দেব। এ-বাড়িটা কোথায়?

সই করব না। জানি না।

তাতে ওর কোনো লাভ হচ্ছে কি? কী নাম আপনার?

সেটা ওর মুখেই শুনব। ক্রাতাইদিস।

সই করলেই দেখা হবে। কোত্থেকে এসেছেন?

তাহলে চাই না দেখা করতে। এথেন্স থেকে।

মি. হোমস, আর একটা প্রশ্ন করলেই কুচুক্কুরে লোক দুটোর সামনেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আচম্বিতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন পরমাসুন্দরী লাবণ্যময়ী মহিলা। তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী এবং কৃষ্ণকেশী।

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, হ্যারল্ড, কতক্ষণ আর একা থাকব? আরে পল যে!

শেষ বিস্ময়ধ্বনিটা বেরোল গ্রিকভাষায়। চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন নিগ্রহ-বিধ্বস্ত গ্রিকপুরুষ, একটানে খুলে ফেললেন মুখের প্লাস্টার এবং সোফি! সোফি! বলে আকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন সুন্দরীকে।

পলকের মধ্যে ঘটল পরবর্তী ঘটনাগুলো। বয়স যার কম সেই লোকটা মহিলাটিকে জাপটে ধরে বেরিয়ে গেলেন এক দরজা দিয়ে। আর এক দরজা দিয়ে অত্যাচারে আধমরা গ্রিক ভদ্রলোককে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল মাঝবয়সি লোকটা।

ঘর ফাঁকা। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করব কি না ভাবছি, এমন সময়ে দেখি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ইতর চেহারার মাঝবয়সি সেই লোকটা।

আমার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে চিবিয়ে বলল, মি. মেলাস, আমাদের নিজস্ব দোভাষী হঠাৎ অন্যত্র যাওয়ায় এই গোপন ব্যাপারে আপনাকে ডাকতে হয়েছে। জেনেও ফেলেছেন অনেক কিছু। এই নিন। আপনার পারিশ্রমিক। হাত বাড়িয়ে নিলাম পাঁচ পাউন্ড পারিশ্রমিক। কাছে আসায় দেখতে পেলাম বেঁটে বামনের বিকট মুখখানা। হলদেটে মুখ, ছুঁচোলো সুতলি দাড়ি, ভয়ংকর ধূসর ইস্পাতকঠিন নির্মম একজোড়া চোখ–নরকের সমস্ত শয়তানি পুঞ্জীভূত হয়েছে কুতকুতে সেই চোখে। থেমে গেলাম আমি, একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

আমার বুকে টোকা মেরে বিশ্রী হেসে ঠোঁট আর চোখের পাতা অদ্ভুতভাবে কাঁপিয়ে মূর্তিমান শয়তানটা বললে, একটা কথাও যদি প্রকাশ পায়, আমাদের কানে তা

আসবেই। আপনার কপালেও তাহলে অনেক দুর্গতি আছে জানবেন। যান, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার আমাকে ঠেলেঠুলে তুলে দেওয়া হল গাড়ির মধ্যে। মি. ল্যাটিমার বসলেন গাড়ির মধ্যে আমার সামনে। আগের মতোই অনেকক্ষণ ছুটল গাড়ি। থামল মাঝরাত নাগাদ একটা বিজন অঞ্চলে। আমাকে নামিয়ে দেওয়ার আগে মি. ল্যাটিমার বললেন, পেছন নিতে চেষ্টা করবেন

বলে দিলাম। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামতেই কোচোয়ানের ছিপটি খেয়ে তিড়বিড়িয়ে ঘোড়া ছুটল সামনে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

জায়গাটা একটা রেললাইনের পাশে, ক্ল্যাপহ্যাম জংশন থেকে মাইলখানেক দুরে; হেঁটে গেলাম স্টেশনে। শেষ ট্রেন ধরে পৌঁছালাম ভিক্টোরিয়ায়। পরের দিন মি. মাইক্রফট হোমসকে আশ্চর্য অভিযানের রোমাঞ্চ কাহিনি বললাম এবং পুলিশে খবর দিলাম।

কাহিনি শেষ হল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

তারপর শার্লক হোমস দাদাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যবস্থা কিছু হয়েছে?

টেবিল থেকে ডেলি নিউজ কাগজটা তুলে নিয়ে মাইক্রফট হোমস বললেন, এই বিজ্ঞাপনটা ছেড়েছি সব কাগজেই কিন্তু জবাব আসেনি।

বিজ্ঞাপনটা এই :

পল ক্র্যাইদিস নামক এক ইংরেজি-অজ্ঞ গ্রিক ভদ্রলোক সম্বন্ধে খবর চাই। এসেছেন এথেন্স থেকে। সোফি নাম্নী এক গ্রিক মহিলার সম্বন্ধেও খবর চাই। পুরস্কার দেওয়া হবে।

শার্লক বললে, গ্রিক দূতাবাসে খবর নিলে হয় না?

নিয়েছি। ওরা কোনো খবরই রাখে না।

বেশ তো, কেসটা তুই নে না।

নিলাম, উঠে পড়ল শার্লক হোমস। মি. মেলাস, আপনি কিন্তু হুঁশিয়ার। কাগজে বিজ্ঞাপন যখন বেরিয়েছে, শত্রুপক্ষও জেনে গেছে আপনি সব ফাঁস করে দিয়েছেন।

বাসায় ফেরার পথে পোস্টাপিস থেকে খানকয়েক টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস।

তারপর বললে, ভায়া, সন্ধেটা দেখছি কাজে লেগে গেল। এইভাবেই অনেক চিত্তাকর্ষক কেস মাইক্রফটের মারফত আমার হাতে এসেছে। মি. মেলাসের কাহিনি শুনে তোমার কী মনে হল বলো।

ইংরেজ নওজোয়ান হ্যারল্ড ল্যাটিমার গ্রিক সুন্দরী সোফিকে এথেন্স থেকে ইলোপ করে এনেছে।

তোমার মাথা। শুনলে না, ল্যাটিমার গ্রিক ভাষা একদম জানে না? এথেন্সে সে যায়নি।

তাহলে সোফি লন্ডনে এসেছিল, তখন মেয়েটাকে পটিয়েছে ল্যাটিমার।

তা সম্ভব।

তারপর মেয়েটির দাদা, গ্রিক ভদ্রলোক নিশ্চয় তার সহোদর ভাই, খবর পেয়ে লন্ডনে আসে এবং শয়তানদের খপ্পরে পড়ে। সোফি কিন্তু জানত না দাদা এসেছে লন্ডনে। খুব সম্ভব ভাইবোনের সম্পত্তির অছি এই ভদ্রলোক। ওঁকে দিয়ে বোনের সম্পত্তিটা লিখিয়ে নিতে চাইছে দুই শয়তান। সোফি হঠাৎ দেখে ফেলেছে দাদাকে।

চমৎকার বলছ, ওয়াটসন! ভয় পাচ্ছি এই সোফিকে নিয়েই এবার তার ওপরেই-না মারধর শুরু হয়।

কিন্তু বাড়িটা খুঁজে পাবে কী করে?

খুব মুশকিল হবে বলে মনে হয় না। সোফিকে নিয়ে ল্যাটিমার বেশ কিছুদিন থেকেছে কোথাও, ভাই খবর পেয়েছে অনেক পরে। মেয়েটির নাম যদি সোফি ক্যাতাইদিস হয়, আর লন্ডনের কোনো পাড়ায় যদি একনাগাড়ে কিছুদিন তাকে দেখা যায়, প্রতিবেশীরা খবর রাখবেই। বিজ্ঞাপনেরও জবাব আসবে।

কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রিটে। ঘরে ঢুকেই দুজনেই চমকে উঠলাম মাইক্রফট হোমসকে দেখে। চেয়ারে মৌজ করে বসে তোফা ধূমপান করছেন।

আমাদের চমৎকৃত মুখচ্ছবি দেখে অট্টহেসে বললেন, আমার এত উদ্যম দেখে অবাক হয়ে গেছিস দেখছি।

এলে কী করে? শার্লকের প্রশ্ন।

গাড়িতে, তোদের পেরিয়ে।

কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে, তোরা চলে যাওয়ার পরেই।

কী লিখেছে?

এই দেখ। রয়্যাল ক্রিম কাগজে জে মার্কা নিয়ে ক্ষীণজীবী মাঝবয়েসি মানুষের হাতে লেখা।

মহাশয়,

আপনার বিজ্ঞাপনের জবাবে জানাই যে মেয়েটিকে আমি চিনি এবং তার দুঃখের কাহিনিও জানি। কষ্ট করে যদি পায়ের ধুলো দেন তো খুলে বলতে পারি।দি মার্টলস বেকেনহ্যাম, এই ঠিকানায় মেয়েটি এখন আছে।

আপনার বিশ্বস্ত

জে, ডেভেনপোর্ট

মাইক্রফট বললেন, চিঠি এসেছে লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে। চল, মেয়েটার দুঃখের কাহিনি শুনে আসা যাক।

তুমি খেপেছ? বললে শার্লক হোমস। মেয়েটার দুঃখের কাহিনির চেয়ে বেশি দামি তার ভাইয়ের জীবন। দেরি হলে খুন হয়ে যেতে পারেন ভদ্রলোক। স্কটল্যান্ডে গিয়ে ইনস্পেকটর গ্রেগসনকে নিয়ে এখুনি হানা দেওয়া দরকার শয়তানদের আস্তানায়।

আমি বললাম, যাওয়ার পথে মি. মেলাসকেও নিয়ে যেতে হবে। দোভাষীর দরকার হতে পারে।

ঠিক কথা, বলে ড্রয়ার খুলে রিভলভার নিয়ে পকেটে পুরল হোমস।

কিন্তু মি. মেলাসের বাড়ি গিয়ে শুনলাম একটু আগেই নাকি হাসিখুশি বেঁটেখাটো চশমাওলা একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন মি. মেলাস!

শুনেই আর তর সইল না হোমসের, সর্বনাশ! আবার ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে মি. মেলাস। ভদ্রলোক যে রামভীতু, তা এক রাতেই ওরা বুঝতে পেরেছে বলেই বাড়ি বয়ে এসে হুমকি দেখিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছে। এবার বোধ হয় জ্যান্ত ফিরতে হবে না। চলো, আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, তারপর শয়তানদের বিবরে।

কিন্তু সময়মতো গাড়ি পাওয়া গেল না। গাড়ি পাওয়া গেল তো, সরকারি নিয়ম রক্ষে করে বাড়ি তল্লাশির অনুমতি বার করতে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হল। ট্রেনে চেপে বেকেনহ্যাম পৌঁছে আধমাইলটাক গাড়ি চেপে মার্টলস-এর সামনে যখন গেলাম, তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে অন্ধকারের মধ্যে খাড়া নিঝুম বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ইনস্পেকটর বললে, জানলা অন্ধকার। লোকজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

পাখি উড়েছে। বলল শার্লক হোমস।

কীভাবে বললেন?

মালপত্র বোঝাই একটা গাড়ি এক ঘণ্টার মধ্যে গেছে এখান থেকে।

হেসে ফেলল ইনস্পেকটর, ফটকের আলোয় গাড়ির চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মালপত্র বোঝাই কি না বুঝছেন কী করে?

একই চাকার দাগ ওদিক থেকে এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আসার সময়ে চাকার দাগ গভীর নয়, যাওয়ার সময়ে মাটি কেটে বসে গেছে। তার মানে, খালি গাড়ি এনে মালপত্র চাপিয়ে লম্বা হয়েছে।

হেরে গেলাম,কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ইনস্পেকটর। যা মজবুত দরজা, ভাঙা চাট্টিখানি কথা নয়। ঠেঙিয়ে দেখা যাক জবাব পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু লাথি ঘুসি মেরে, ঘণ্টা বাজিয়েও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। সুট করে সরে পড়ল শার্লক হোমস। ফিরে এল মিনিট কয়েক পরে। বলল, একটা জানলা খুলে ফেলেছি।

জানলা খোলার কায়দা দেখে চোখ কপালে উঠল ইনস্পেকটরের। বাইরে থেকে অদ্ভুত কৌশলে ভেতরের ছিটকিনি সরিয়ে দিয়েছে শার্লক।

তাজ্জব কণ্ঠে বললেন ইনস্পেকটর, পুলিশের কপাল ভালো আপনি চোর বদমাশের খাতায় নাম লেখাননি। চলুন, পরিস্থিতি যেরকম ঘোরালো, বিনা নেমন্তন্নে বাড়িতে ঢুকলে অপরাধ হবে না।

ভেতরে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিলেন ইনস্পেকটর। শুন্য কক্ষ। টেবিলের ওপর খালি ব্র্যান্ডির বোতল, দুটো খালি গেলাস আর এঁটো খাবার পড়ে।

আচমকা কাঠ হয়ে গেল শার্লক, ওকী!

একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে এল মাথার ওপর থেকে। কে যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে অব্যক্ত বেদনায় কাঁদছে। ঝড়ের মতো ঘর থেকে ঠিকরে গিয়ে হল ঘরে ঢুকল শার্লক, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পেছনে আমরা। ভারী শরীর নিয়ে যদ্দূর সম্ভব বেগে পেছনে লেগে রইলেন শার্লক-অগ্রজ মাইক্রফট হোমস।

তিনতলায় পর পর তিনটে দরজার একটার ভেতর থেকেই যেন আসছে চাপা গোঙানি। কখনো উচ্চগ্রামে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ছে একই কণ্ঠস্বর। দরজা বাইরে থেকে চাবি দেওয়া। এক ধাক্কায় দরজা খুলে সবেগে ভেতরে ঢুকেই পরমুহূর্তেই গলা খামচে ধরে ছিটকে বেরিয়ে এসে আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল শার্লক হোমস, কাঠকয়লার দম বন্ধ করা গ্যাস, বেরিয়ে যেতে দিন!

খোলা দরজা দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ দম আটকানো বিষাক্ত ধোঁয়া। উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের ভেতরে চাপ চাপ ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা অস্পষ্ট নীল শিখা। একটা পেতলের তেপায়ার ওপরে দেখা যাচ্ছে সেই নীলাভ দ্যুতি। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লুটিয়ে আছে দুটো মনুষ্য মূর্তি। ওইটুকু দেখতে গিয়েই বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে চলে গেল, শুরু হল প্রচণ্ড কাশি। দম আটকে আসে আর কি! সিঁড়ির কাছে দৌড়ে গিয়ে বুক ভরে টাটকা বাতাস নিয়ে তিরবেগে ঘরে ঢুকল শার্লক হোমস এবং এক ঝটকায় পেতলের তেপায়া তুলে নিয়ে গিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিল বাইরের বাগানে।

বেরিয়ে এল পর মুহূর্তেই। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, মিনিট খানেক না-গেলে ঢোকা যাবে–নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। মোমবাতি কোথায়? বন্ধ ঘরে মোমবাতি বোধ হয় জ্বলবে না। মাইক্রফট, দরজার কাছে ধরো তত বাতি। আমি ওদের টেনে নিয়ে আসি ভেতর থেকে।

দুজনে মিলে ধরাধরি করে একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দুটি নরদেহ তুলে নিয়ে এলাম বাইরে। দুজনেই অজ্ঞান। চোখ-মুখ ফুলে ঢোল–চেনা দায়। ঠোঁট নীল। কোটর থেকে অক্ষিগোলক ঠিকরে আসছে। দোভাষী ভদ্রলোকের কালো দাড়ি আর মজবুত চেহারাটা দেখে চিনতে পারলাম। কপালে চোখের ঠিক ওপরেই একটা ভয়ংকর আঘাতের চিহ্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সারামুখে প্লাস্টারের পটি–কঙ্কালসার লম্বা চেহারা। ধুকছে এবং গোঙাচ্ছে। বাইরে আনার পর গোঙানিটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। মানে, সব শেষ হয়ে গেল। দুজনের একজন মায়া কাটাল পৃথিবীর।

দোভাষী কিন্তু বেঁচে গেলেন। অ্যামোনিয়া শুকিয়ে ব্র্যান্ডি খাইয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চাঙ্গা করে তোলার পর শুনলাম তার মর্মন্তুদ কাহিনি। ইতর শ্রেণির লোকটা হাসি হাসি মুখে বাড়ি ঢুকে পকেট থেকে মারাত্মক হাতিয়ার বার করে কেবল বলেছিল–চেঁচালেই খুন করে ফেলব। চুপচাপ সঙ্গে এসো হে মি. মেলাস। তাইতেই ঘেমে যান ভদ্রলোক। গুটি গুটি চলে আসেন। এইভাবে। শুরু হয় প্রশ্নোত্তর। আবার গ্রিক ভদ্রলোককে হুমকি দেওয়া হয় কাগজে সই করার জন্যে। কিন্তু মরতে হবে জেনেও যখন কাগজে সই দিলেন না তখন শয়তানের দল তাকে নিয়ে যায় বাইরে এবং বারণ করা সত্ত্বেও গোপন কথা ফাঁস করার অপরাধে মাথায় লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলা হয় মি. মেলাসকে। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখেই ওরা আঁচ করেছিল খবরটা কার মুখ থেকে বেরিয়েছে।

গ্রিক দোভাষীর বিচিত্র মামলার কিনারা কিন্তু আর হয়নি। বিজ্ঞাপনের জবাবে মেয়েটির দুঃখের কাহিনি যিনি বলবেন লিখেছিলেন, তার মুখে আমরা শুনলাম, সোফি মেয়েটা গ্রিকদেশের এক বিরাট বড়োললাকের মেয়ে। ইংলন্ডে এসেছিল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। হ্যারল্ড ল্যাটিমার তার সঙ্গে ভাব করে এবং এমন পটিয়ে ফেলে যে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গিয়ে তার গলায় মালা দেবে ঠিক করে সোফি। জল অনেক দূর গড়াচ্ছে দেখে বন্ধুরা আঁতকে উঠে খবর দেয় এথেন্সে তার দাদাকে। খবর দেওয়ার পর কী হল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি।

দাদাটি ইংরেজি জানত না। বোনের সর্বনাশ হতে যাচ্ছে শুনে বোকার মতো এসে ল্যাটিমার আর তার উক্ত সঙ্গীর খপ্পরে পড়ে। একই বাড়িতে ভাইবোনকে আটকে রেখেছিল এই দুই কুচক্রী। ইতর সঙ্গীটির নাম উইলসন কেম্প। এককালের দাগি আসামি। বহু জঘন্য কাজের জন্যে মার্কামারা।

ওরা চেয়েছিল দাদাকে নিয়ে বোনের সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নিতে। অত্যাচার চলছিল সেই কারণেই। পাছে বোন দেখে চিনে ফেলে দাদাকে, তাই দাদার মুখময় প্লাস্টারের পটি লাগিয়ে রাখা হত। কিন্তু মেয়েদের মন তো, পটির আবরণ খুঁড়েও চিনতে পেরেছে মায়ের পেটের ভাইকে।

মেয়েটি নিজেও বন্দিনী ছিল বাড়িতে। কোচোয়ান আর তার বউ ছাড়া বাড়িতে লোকজন আর কেউ ছিল না। দুজনেই ছিল শয়তানের হাতের পুতুল।

-খাইয়ে রেখে মারধর করেও যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তখন ওরা দু-ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। অবাধ্য দাদা আর বিশ্বাসঘাতক দোভাষীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করে যায় বদ্ধ ঘরে কাঠকয়লার ধোঁয়ায়।

মাস কয়েক পরে বুদাপেস্ত থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর বেরোয়। দুজন ইংরেজ একজন গ্রিক সুন্দরীর সঙ্গে যেতে যেতে ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছে। পুলিশের ধারণা, নিজেরাই ছুরি মারামারি করে মরেছে। শার্লক হোমসের ধারণা অবশ্য

অন্যরকম। ভাইবোনের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ কীভাবে নিল সোফি, তা তার মুখ থেকেই শুনবে শার্লক, যদি কোনোদিন দেখা হয়।

———-

টীকা

গ্রিক দোভাষীর দুর্দশা : দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর হার্পার্স উইকলিতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গাঁইয়া জমিদার বংশে : শার্লক হোমসের বাবা বা মা-র কথা কখনো জানা যায়নি।

ফরাসি শিল্পী ভের্নের : ফ্রান্সের শাসক পঞ্চদশ লুইয়ের সমসাময়িক ক্লদ যোসেফ ভের্নে (১৭১৪-১৭৮৯) ছিলেন নিসর্গ দৃশ্য আঁকার জন্য বিখ্যাত। তার ছেলে শার্ল হোরেস ভের্নে (১৭৫৮-১৮৩৫) বিখ্যাত ছিলেন যুদ্ধের দৃশ্য আঁকিয়ে হিসেবে। শার্ল-এর ছেলে এমিল আঁ হোরেস ভের্নেও (১৭৮৯-১৮৬৩) পারদর্শী ছিলেন যুদ্ধের দৃশ্য আঁকায়।

রিজেন্ট সার্কাস : পিকাডিলি সার্কাস এবং অক্সফোর্ড সার্কাস, দুই অঞ্চলই কোনো সময়ে রিজেন্ট সার্কাস নামে পরিচিত ছিল।

সরকারি দপ্তরে হিসেবের খাতা দেখে : শার্লক হোমসের গল্প দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস-এ জানা যায় মাইক্রফটের কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সে ব্রিটিশ সরকারের এক বিশেষ অংশ।

পলমল : লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অঞ্চলে সেন্ট জেমস স্ট্রিট থেকে ওয়াটার্ল প্লেস হয়ে হে-মার্কেট পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা।

মুখচ্ছবিতেই : ১৯৬৫-তে এ স্টাডি ইন টেরর ছায়াছবি নির্মিত হয় শার্লক হোমসের কাহিনি অবলম্বনে। তাতে মাইক্রফটের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবার্ট মর্লে। রবার্ট মর্লের চেহারা বা মুখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সিডনি প্যাগেটের আঁকা ছবিতে মাইক্রফটের চেহারা এবং মুখের।

বিলিয়ার্ড : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের উঁচু সমাজে বিলিয়ার্ড খেলা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিলিয়ার্ডের ভক্ত ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়া এবং পোন নবম পায়াস।দ্য ডান্সিং মেনগল্পে দেখা যায় ডা. ওয়াটসনও নিয়মিত বিলিয়ার্ড খেলতেন।

গোলাগুলি-মার্কা বুট : সাধারণ সৈনিকদের জন্য দেওয়া অ্যামুনিশন বুট।

বিজ্ঞপনটা ছেড়েছি : হোমসের সঙ্গে পরামর্শ না-করেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন মাইক্রফট। তাতে মি. মেলাস কিন্তু বিপদে পড়ে যান।

জে মার্কা : এক ধরনের মোটা নিব-যুক্ত কলম। কলমের গায়ে জে লেখা থাকত।জে ছাড়া জি এবং আর মার্কা কলমও তৈরি করতেন বহু ইংরেজ কলম তৈরির সংস্থা।

মৃত্যুর ব্যবস্থা করে : ক্রাইদিস এবং মেলাসকে মারবার জন্য কয়লার ধোঁয়ার মতো এমন ঝামেলার পথ কেন বাছল অপরাধীরা? আরও সহজ এবং নিশ্চিত পদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে পারত।

ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ

[সিলভার ব্লেজ]

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হোমস হঠাৎ বললে, ওয়াটসন, আমাকেই বোধ হয় যেতে হবে।

যাবে? কোথায়? ডার্টমুরে–কিংস পাইল্যান্ডে।

অবাক হলাম না। যে ঘটনা সারা ইংল্যান্ডকে তাতিয়ে তুলেছে তা নিয়ে হোমস যে কেন এতদিন মেতে ওঠেনি–এইটাই বরং আশ্চর্য।

ঘটনাটা সত্যিই অসাধারণ। ওয়েসেক্স কাপ জিতে নেওয়ার মতো দুর্দান্ত রেসের ঘোড়া সিলভার ব্লেজ হঠাৎ যেন বেমালুম বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ট্রেনার ভদ্রলোক খুন হয়েছে নৃশংসভাবে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। হোমস কিন্তু কাগজগুলোয় শুধু চোখ বুলিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ঘনঘন পাইপ খেয়েছে, ঘরময় পায়চারি করেছে, একটা কথাও কানে তোলেনি।

মুখে কথা না-বললেও সিলভার ব্লেজ রহস্য যে ওকে আকর্ষণ করেছে তা বুঝেছিলাম ওর ওই চেহারা দেখে। শার্লক হোমসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণী শক্তির নবতম পরীক্ষা এই রহস্য হোমস কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

সত্যিই পারল না। অকুস্থলে যাওয়ার ইচ্ছে মুখ ফুটে বলতেই বুঝলাম আসরে অবতীর্ণ হতে চলেছে বন্ধুবর।

আমি যাচ্ছি নিশ্চয়? বললাম আমি।

অবশ্যই। সঙ্গে তোমার দামি দূরবিনটা নিয়ো।

এক ঘণ্টা পর চলন্ত ট্রেনে বসে আবার খবরের কাগজ নিয়ে তন্ময় রইল হোমস। রীডিং ছাড়িয়ে আসার পর কাগজের উঁই বেঞ্চির নীচে ঠুসে সিগারেট বাড়িয়ে দিল আমাকে।

বলল, ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল স্পিডে যাচ্ছি।

সিকি মাইল অন্তর খুঁটিগুলো অবশ্য আমি দেখিনি।

আমি দেখিনি। টেলিগ্রাফ তারের খুঁটিগুলো কিন্তু ষাট গজ অন্তর পোঁতা। সেই হিসেবেই বললাম ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল স্পিডে যাচ্ছি। কেসটা পড়েছ?

কাগজে পড়েছি।

অসাধারণ কেস। যুক্তিবিজ্ঞানের চরম পরীক্ষা বলতে পারো। মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পেয়েছি ঘোড়ার মালিক কর্নেল রস আর তদন্তকারী ইনস্পেকটর গ্রেগরির কাছ থেকে।

সে কী! আজ বেস্পতিবার! টেলিগ্রাম পেয়েই তো তোমার যাওয়া উচিত ছিল।

ভায়া ওয়াটসন, সেইটাই ভুল হয়েছে আমার। তোমার লেখায় আমাকে যেভাবে আঁকা হয়েছে–আমি যে তা নই, আমিও যে অতি সাধারণ মানুষ, ভুলভ্রান্তি করি–এইটাই তার প্রমাণ। আমি ভেবেছিলাম ডার্টমুরের মতো ফাঁকা জায়গায় নিখোঁজ ঘোড়াকে ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাবে।ট্রেনার জন স্ট্রেকারকে খুন করেছে নিশ্চয় ঘোড়া-চোর–তাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। কিন্তু সারাদিনে শুধু ফিজরয় সিম্পসন ছেলেটাকে হাজতে পোরা ছাড়া পুলিশ কিছুই করতে পারেনি দেখে গা-ঝাড়া দিতে বাধ্য হলাম। তবে কী জানেনা, কাল সারাদিনটা একেবারে মাঠে মারা যায়নি।

তার মানে রহস্যের অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছ?

ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে নিতে পেরেছি। বলছি শোনো।

সিলভার ব্লেজ খানদানি ঘোড়া। ভালো বংশ। বয়স পাঁচ। রেসের মাঠে সুনাম হয়েছে। সমস্ত প্রাইজ জিতেছে।ওয়েসেক্স কাপ রেসে বাজি পড়েছিল তিন টাকায় এক টাকা। খুবই বেয়াড়া বাজি–কিন্তু তবুও মোটা বাজি ধরা হয়েছে ঘোড়াটার ওপর কারণ ও

কখনো হারেনি কাউকে রাস্তায় বসায়নি। কাজেই সিলভার ব্লেজ মাঠে নামলে যেমন অনেকের লাভ—মাঠে না-নামলেও অনেকের লাভ।

তাই কড়া নজর রাখা হয়েছিল সিলভার ব্লেজের ওপর। কিংস পাইল্যান্ডের আস্তাবলে মোট চারটে ঘোড়ার একটা এই সিলভার ব্লেজ। কর্নেলের জকি জন স্ট্রেকার মুটিয়ে যাওয়ার ফলে ঘোড়া চালানো ছেড়ে ঘোড়া ট্রেনিংয়ের কাজ ধরেছে। তিনটে ছোকরা আস্তাবলের কাজ দেখাশুননা করে। রাতে পালা করে একজন পাহারা দেয়। দুজন ওপরের ঘরে ঘুমোয়। জন স্ট্রেকার নিঃসন্তান। থাকে আস্তাবল থেকে দু-শো গজ দূরে বউ আর একজন ঝি-কে নিয়ে। অবস্থা ভালো। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। ফাঁকা। আট মাইল উত্তরে কতকগুলো ভিলা আছে–ডার্টমুরের হাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য ফেরাতে যারা আসে তাদের জন্যে। মাইল দুই পশ্চিমে ট্যাভিসটক গ্রাম। বাদা পেরিয়ে, দু-মাইল দুরে কেপলটনের বড়োসড়ো আস্তাবল–ঘোড়া ট্রেনিংয়ের বিরাট ব্যাপার। আস্তাবলের মালিক লর্ড ব্ল্যাকওয়াটার ম্যানেজার সিলাম ব্রাউন। এ ছাড়া বাদার কোথাও কিছু নেই–মাঝে মাঝে ছন্নছাড়া কিছু ভবঘুরে বেদে। সোমবার রাতে এহেন পরিবেশে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনাটা।

যথারীতি ঘোড়াদের চরিয়ে এনে দানাপানি খাইয়ে রাত নটায় তালা দেওয়া হল আস্তাবলে। একজন ছোকরা পাহারায় রইল–দুজন গেল ট্রেনারের বাড়িতে রাতের খাওয়া খেতে। পাহারায় যে রইল, তার নাম নেড হান্টার।

ঝি এডিথ আসছে হান্টারের খাবার নিয়ে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে, এমন সময়ে দুম করে একজন ভদ্রলোক অন্ধকার কুঁড়ে হাজির হল তার সামনে। পরনে ধূসর টুইড সুট, মাথায় কাপড়ের টুপি, হাতে গোল মুণ্ডিওয়ালা মোটা ভারী লাঠি। বয়স তিরিশের একটু ওপরে, মুখ ফ্যাকাশে, হাবভাব কেমন যেন অস্থির।

এডিথকে ডেকে বললে, ওহে শোনো, কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারো?

কিংস পাইল্যান্ড ট্রেনিং আস্তাবলের কাছে।

তাই নাকি! কপাল ভালো বলতে হবে। শুনেছি রোজ রাতে একজন ছোকরা ঘুমোয় ওখানে। খাবারটা বোধ হয় তার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না? শোনো, শোনো নতুন ড্রেস কেনার কিছু টাকা ফাঁকতালে রোজগার করতে চাও? বলতে বলতে ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ টেনে বের করল লোটা।ছোকরাটাকে এই কাগজটা আজ রাতে যদি দাও, কালই একটা চমৎকার ফ্রক কিনে আনতে পারবে বাজার থেকে।

আস্তাবল সেখান থেকে তিরিশ গজ দূরে। লোকটার কথায় ঘাবড়ে গিয়ে, এক দৌড়ে জানলার সামনে পৌঁছোল এডিথ। এই জানলা দিয়ে রোজ রাতে খাবার দিতে হয় তাকে। জানলা খুলে ছোট্ট টেবিলের পাশে বসে ছিল হান্টার। লোকটার কথা সবে বলতে শুরু করেছে এডিথ, এমন সময়ে আগন্তুক নিজেই হাজির হল সেখানে।

বললে, গুড ইভনিং। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। এডিথ দেখেছে হাতের মুঠোয় কাগজটা ধরে কথাটা বলেছিল আগন্তুক।

হান্টার বললে, এখানে কী চাই?

তোমার পকেটে দুটো পয়সা যাতে আসে, সেই ব্যবস্থা করতে চাই। ওয়েসেক্স কাপ ঘোড়দৌড়ে তোমাদের দুটো ঘোড়া নামছে–সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড–তাই না? ভেতরের খবর একটু জানিয়ে দাও–দেখো তোমার পকেট কীরকম ভরে উঠে। শুনলাম নাকি সিলভার ব্লেজকে পাঁচ ফার্লং দৌড়ে এক-শো গজ পেছনে ফেলে গেছিল বেয়ার্ড? তোমরাও বাজি ধরেছ ওর ওপরেই?

তাই বলুন। ঘোড়ার দালাল! দাঁড়ান, আপনার মজা দেখাচ্ছি, বলেই কুকুর লেলিয়ে দিতে ছুটল হান্টার। বেগতিক দেখে ভোঁ দৌড় দিল এডিথ। যেতে যেতে দেখল, জানলা দিয়ে ঝুঁকে আছে রেসকোর্সের দালাল লোকটা। হান্টার এসে দেখল ভোঁ-ভোঁ–পালিয়েছে সে।

একটা কথা হোমস, জিজ্ঞেস করলাম আমি। কুকুর নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল হান্টার? না, খোলা ছিল?

এক্সেলেন্ট ওয়াটসন, চমৎকার বলেছ, পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার মাথায় খেলতেই সঙ্গেসঙ্গে ডার্টমুরে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জবাবটা জেনে নিয়েছি। ছোকরা তালা দিয়ে গিয়েছিল দরজায়। জানলাটাও এত ছোটো যে মানুষ গলতে পারে না।

খেয়েদেয়ে অন্য দুই ছোকরা আস্তাবলে আসতে হান্টার সব খুলে বললে। জন ষ্ট্রেকারের কানে যেতেই ভদ্রলোক অস্থির হয়ে পড়ল। রাত একটার সময়ে স্ত্রী দেখল জামাকাপড় পরে স্বামী বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। বাইরে তখন ঝড়জলের মাতামাতি চলছে।

গেল তো গেলই। সকাল সাতটা বাজল–তখনও বাড়ি ফিরল না দেখে মিসেস স্ট্রেকার পাঠাল এডিথকে। এডিথ গিয়ে দেখল, আস্তাবলের দরজা খোলা, ভেতরে একটা চেয়ারে নিঃসাড়ে জবুথবু ভঙ্গিমায় পড়ে আছে হান্টার। সিলভার ব্লেজ নেই, জন স্ট্রেকারও নেই।

অন্য ছেলেদুটোকে টেনে তোলা হল। ওরা ওপরের মাচায় ঘুমোয়। ঘুম তাদের গাঢ়। কোনো আওয়াজ শোনেনি। হান্টার নিজেও ঘুমের ওষুধ খেয়ে মড়ার মতো পড়ে থেকেছে। তখনও ঘোর কাটছে না দেখে অন্য ছেলে দুটো ঝিকে নিয়ে দৌড়োল টিবিতে উঠে চারপাশ দেখবে বলে–হয়তো ভোরে উঠে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে জন স্ট্রেকার।

আস্তাবল থেকে সিকি মাইল দূরে একটা ঝোঁপের পাশে খালের মধ্যে পাওয়া গেল তাকে। দেহে প্রাণ নেই, মাথার খুলি চুরমার খুব ভারী হাতিয়ার দিয়ে যেন বার বার মারা হয়েছে, উরু চিরে গেছে ধারালো অস্ত্রে। ডান হাতে একটা খোলা ছুরি বাঁট পর্যন্ত রক্ত জমে রয়েছেতার মানে আততায়ীদের একজনকে অন্তত জখম করেছে মরবার আগে, বাঁ-হাতে কালো সিল্কের গলাবন্ধ–এডিথ দেখেই চিনেছে–গতরাতে গলায় জড়িয়ে এসেছিল আগন্তুক। ঘোর কাটিয়ে উঠে হান্টারও চিনতে পেরেছে গলাবন্ধটা–তার বিশ্বাস ও যখন

কুকুর আনতে দৌড়েছিল, তখনই জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মাংসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল অচেনা লোকটা। ঘুমের ওষুধটা যে আফিং–সেটা মাংস পরীক্ষা করে জানা গেছে। নালার মধ্যে কাদার ওপর সিলভার ব্লেজের খুরের দাগও পাওয়া গেছে। ধস্তাধস্তির চিহ্নও আছে।

পুলিশ ইনস্পেকটর গ্রেগরি লোকটা এমনিতে চালাকচতুর হলে কী হবে, কল্পনাকে খেলাতে জানে না–জানলে অনেক উঁচুতে উঠত। সে এলে ভিলা থেকে গলাবন্ধর মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। নাম তার ফিজরয় সিম্পসন। একের নম্বরের রেসুড়ে। লেখাপড়া শিখেছে, ভালো বংশে জন্মেছে। কিন্তু টাকাকড়ি সব ফুকে দিয়েছে রেসের মাঠে। এখন লন্ডনে স্পোর্টিং ক্লাবে ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ বুকির কাজ করে লুকিয়ে-চুরিয়ে। পাঁচ হাজার পাউন্ড বাজি ধরেছে যে-ঘোড়া জিতবে বলে মনে হয়েছে তার ওপর। ডার্টমুরে এসেছে কিংস পাইল্যান্ড আর কেপলটন আস্তাবলের ঘোড়া সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে। গত রাতে সে এইজন্যেই বেরিয়েছিল। এই পর্যন্ত সেসব কথা নিজেই বলেছে–লুকোছাপার ধার দিয়েও যায়নি। কিন্তু গলাবন্ধটা দেখেই মুখ আমসি হয়ে গিয়েছে। লোকটার জামাকাপড়ও বেশ ভিজে রাত্রে ঝড় জলে বেরোনোর চিহ্ন। লাঠিটা সিসে দিয়ে ভারী করা–যার গায়ে মাথার খুলি গুঁড়ো করা সম্ভব।

সিম্পসনের গায়ে কিন্তু ছুরির দাগ দেখা যায়নি। অথচ স্ট্রোরের ছুরিতে রক্ত লেগেছিল–আততায়ীদের নিশ্চয় জখম করেছিল। ওয়াটসন, এই হল গিয়ে সমস্ত ব্যাপার। এবার বলো কী বুঝলে।

www.bengaliebook.com

ধস্তাধস্তির সময়ে নিজের ছুরিতেই দাবনা চিরে ফেলেনি তো স্ট্রেকার? বললাম আমি।

খুব সম্ভব।

পুলিশ কী বলে?

পুলিশ বলছে, সিম্পসনই হান্টারকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, দোকড়া চাবি দিয়ে আস্তাবল খুলে সিলভার ব্লেজকে নিয়ে পালিয়েছে। ঘোড়ার সাজও পাওয়া যাচ্ছে না নিশ্চয় পরিয়ে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময়ে মুখোমুখি হয়েছে জন স্ট্রেকারের সঙ্গে। ধস্তাধস্তির সময়ে স্ট্রেকার নিজেই নিজের ছুরিতে পা কেটেছে। সিম্পসনের লাঠিতে মাথা ভেঙেছে। ঘোড়াটা সেই সময়ে ভোঁ দৌড় দিয়ে জলার কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সবই অনুমান। অকুস্থলে না-গেলে বোঝা যাবে না আসল রহস্য।

ট্যাভিস্টক স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন কর্নেল রস আর ইনস্পেকটর গ্রেগরি। প্রথম জন চটপটে, খর্বকায়। দ্বিতীয়জন দীর্ঘকায়, মাথায় লম্বা চুল, নীল চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বিখ্যাত গোয়েন্দা।

ছাদখোলা ল্যান্ডো গাড়িতে যেতে যেতে গ্রেগরি বলে ওর ধারণা–চুপ করে শুনে গেলেন কর্নেল রস। মাঝে মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে লাগল হোমস।

গ্রেগরি বললে, সিম্পসনই আসামি।

হোমস বললে, স্ট্রেকারের ছুরির ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়ায়?

নিজের ছুরিতেই চোট খেয়েছে পড়ে যাওয়ার সময়ে।

ওয়াটসনেরও তাই ধারণা। তবে কী জানো, আদালতে এ-কেস গেলে সিম্পসনের বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ তুমি পেয়েছ, সব নস্যাৎ হয়ে যাবে ধুরন্ধর আইনজ্ঞের জেরায়। প্রথমেই ধর না কেন, সিলভার ব্লেজকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কি? ওইখানেই জখম করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। তা ছাড়া দোকড়া চাবি কি পাওয়া গেছে সিম্পসনের কাছে? আফিং কিনেছিল কোন দোকান থেকে? সবচেয়ে বড়ো কথা, সিম্পসনকে এখানে কেউ চেনে না–কিন্তু সিলভার ব্লেজকে সবাই চেনে–তা সত্ত্বেও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাকে? এডিথ বলেছে, একটা কাগজ নাকি হান্টারকে দিতে চেয়েছিল সিম্পসন–কীসের কাগজ?

দশ পাউন্ডের নোট–সিম্পসন নিজে বলেছে। মানিব্যাগেও পাওয়া গেছে একটা দশ পাউন্ডের নোট। আপনার অন্য যুক্তিগুলো অকাট্য নয়। চাবির কাজ ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ঘোড়াকে জলার মধ্যে কোনো পুরনো খনিতে লুকিয়ে রেখেছে, আফিং লন্ডন থেকে এনেছে। এ-জায়গাও তার কাছে খুব একটা নতুন নয়। এর আগেও দু-বার গরম কাটিয়ে গেছে।

গলাবন্ধটা?

ভুল করে ফেলে গিয়েছিল। আর ঘোড়া পাচার করে দেওয়া ব্যাপারেও নতুন খবর এনেছে।

কীরকম? উৎকর্ণ হল হোমস।

আস্তাবলের মাইলখানেকের মধ্যে সোমবার একদল জিপসি আড্ডা গেড়েছিল। খুনটা হয়ে যাওয়ার পরেই মঙ্গলবার তারা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘোড়াটা তারাই নিশ্চয় নিয়ে গেছে সিম্পসনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

কাছাকাছি আর একটা ট্রেনিং আস্তাবল আছে না?

কেপলটনের আস্তাবল। ওখানকার ঘোড়া ডেসবরোর ওপরেও বাজি ধরা হয়েছে বিস্তর কিন্তু সিলভার ব্লেজের চেয়ে বেশি নয়। ডেসবরোর স্থান সেদিক দিয়ে দ্বিতীয়—সিলভার ব্লেজের প্রথম। কাজেই সিলভার ব্রেজ হারলে ওদের লাভ। স্ট্রেকারের সঙ্গে ওখানকার ট্রেনার সিলাজ ব্রাউনের খুব একটা বনিবনা ছিল না। ওখানেও হানা দিয়েছি কিন্তু সিলাজ ব্রাউনকে এর মধ্যে টেনে আনবার মতো প্রমাণ পাইনি।

একই স্বার্থ নিয়ে সিম্পসন কেপলটন আস্তাবলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এমন কোনো নজির পাওয়া গেছে?

একদম না।

কথা আর জমল না। গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইল হোমস। কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছোলাম একটা ছিমছাম লাল-ইটের তৈরি ভিলার সামনে। একটু তফাতে ধূসর টালি ছাওয়া বার-বাড়ি। চারদিকে ঢেউ-খেলানো জলাভূমি। অনেকদূরে দিগন্তরেখার কাছে ট্যাভিসটক গ্রামের গির্জার চুড়া, পশ্চিমদিকে কেপলটন আস্তাবল। গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়লাম প্রত্যেকেই হোমস বাদে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল তো রইলই। আমি বাহুস্পর্শ করতেই ভীষণ চমকে উঠে ধড়মড় করে নেমে এল নীচে।

দুই চোখে নিবিড় বিস্ময় নিয়ে কর্নেল রস তাকিয়ে আছেন দেখে হোমস বললে, দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম মশায়, কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু বন্ধুবরের চোখের দীপ্তি আর হাবভাবের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ করেই বুঝলাম–দিবাস্বপ্ন নয়, নিশ্চয় জবর সূত্র খুঁজে পেয়েছে সে। কিন্তু সূত্রটা যে কী, তা হাজার ভেবেও মাথায় আনতে পারলাম না।

মি. হোমস, অকুস্থলে যাবেন তো? গ্রেগরির প্রশ্ন।

আগে দু-একটা কথা এখানেই জেনে নেওয়া যাক। স্ট্রেকারের লাশ কোথায়?

ওপরতলায়।

কর্নেল রস, স্ট্রেকার কদ্দিন কাজ করছে আপনার?

বারো বছর। পাঁচ বছর জকি হিসেবে, সাত বছর ট্রেনার হিসেবে। খুবই কাজের লোক।

স্ট্রেকারের পকেটের জিনিসগুলো কোথায়, ইনস্পেকটর?

বসবার ঘরে।

চলো তো দেখি।

সামনের ঘরে ঢুকলাম সবাই। চৌকোনো টিনের বাক্সর তালা খুলে ইনস্পেকটর গ্রেগরি অনেকগুলো জিনিস রাখল টেবিলের ওপর। এক বাক্স মোমের দেশলাই, ছোট্ট একটা চর্বির মোমবাতি, একটা ব্রায়ার পাইপ, চামড়ার ব্যাগে আধ আউন্স ক্যাভেন্ডিস তামাক, সোনার চেনে ঝোলানো রুপোর ঘড়ি, পাঁচটা মোহর, একটা অ্যালুমিনিয়ামের পেনসিল-বাক্স, কিছু কাগজ, কারুকার্য করা হাতির দাঁতের বাঁটওলা একটা অত্যন্ত মূল্যবান সূক্ষ্ম ছুরি–ফলা শক্ত–নোয়ানো যায় না।

উলটেপালটে ছুরিটা দেখে হোমস বললে, অসাধারণ ছুরি দেখছি। ফলায় রক্ত লেগে তার মানে এই ছুরিও পাওয়া গেছে স্ট্রেকারের হাতের মুঠোয়। ওয়াটসন, দেখো তো ছুরিটা তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের এক্তিয়ারে পড়ে কি না!

এ তো ছানিকাটা ছুরি।

ঠিক ধরেছ। সূক্ষ্ম অপারেশনের উপযোগী করে ফলাটা এত সরু করা হয়েছে। কিন্তু যে-ছুরি মুড়ে পকেটে রাখা যায় না, সে-ছুরি পকেটে নিয়ে স্ট্রেকার বেরিয়েছিল কেন, এইটাই হল প্রশ্ন। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

গ্রেগরি বললে, খুব অদ্ভুত নয়। তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেয়েছে, তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। টেবিলেই পড়েছিল ক-দিন–মিসেস স্ট্রেকার দেখেছে। ডগায় একটা ছিপি লাগানো ছিল।

কাগজগুলো কীসের?

খড়বিচালির তিনটে রসিদ, একটা কর্নেল রসের নির্দেশলিপি, আর এটা একটা মেয়েদের পোশাকের হিসেব। দাম পঁয়ত্রিশ পাউন্ড পনেরো শিলিং। বিক্রি করেছে বন্ড স্ট্রিটের ম্যাডাম লেসুরিয়ার। কিনেছে উইলিয়াম ডার্বিশায়ার। মিসেস স্ট্রেকারের কাছে শুনেছি এই ভদ্রলোক জন স্ট্রেকারের বিশেষ বন্ধু–চিঠিপত্রও আসত জন স্ট্রোরের ঠিকানায়।

হিসেবটা দেখতে দেখতে হোমস বললে, ডার্বিশায়ার গিন্নির দামি জিনিস ছাড়া মন ওঠে না দেখছি। একটা পোশাক বাবদ বাইশটা গিনি নেহাত কম নয়। চলো, এবার অকুস্থলে যাওয়া যাক।

গলিপথে বেরুতেই একজন স্ত্রীলোক এসে গ্রেগরির বাহুস্পর্শ করল। মুখটা উদবেগ উত্তেজনায় উদ্রান্ত, বিশীর্ণ। সাম্প্রতিক বিভীষিকার ছাপ মুখের পরতে পরতে।

বললে হাঁফাতে হাঁফাতে, পেয়েছেন?

এখনও পাইনি, মিসেস স্ট্রেকার। তবে এবার একটা হিল্লে হবে। লন্ডন থেকে মি. হোমস এসে গেছেন।

হোমস বলে উঠল, আরে মিসেস স্টেকার যে, মনে পড়ে কিছুদিন আগে প্লিমাউথের একটা গার্ডেন পার্টিতে আলাপ হয়েছিল আমাদের?

আপনি ভুল করছেন।

সে কী কথা! কিন্তু আমার তো বেশ মনে আছে। অস্ট্রিচ-পালকের ঝালর দেওয়া একটা ভারি সুন্দর সিল্কের ড্রেস পরেছিলেন–রংটা গোলাপি ধূসর?

এ-রকম কোনো ড্রেস আমার নেই, স্যার।

কঁচুমাচু মুখে হোমস আমতা আমতা করে বেরিয়ে এল বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে সবাই পৌঁছোলাম অকুস্থলে। গর্তের মতো একটা জায়গা। ধারে হলদে ফুলের একটা ঝোপ।

কোট পাওয়া গিয়েছিল এইখানেই। চেয়ে রইল হোমস। বললে, খুনের রাতে হাওয়ার তেমন জোর ছিল না, তাই না?

না। তবে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

ওভারকোটটা তাহলে হাওয়ায় উড়ে আসেনি–ঝোঁপের ওপর খুলে রাখা হয়েছিল।

হ্যাঁ তাই ছিল। ঝোঁপের ওপর পাতা ছিল।

কাদায় অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

আমরা মাদুর পেতে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

শাবাশ!

এই থলির মধ্যে সিলভার ব্লেজের পায়ের নাল, সিম্পসন আর স্ট্রোরের জুতোর একটা করে পাটিও এনেছি।

সত্যিই গ্রেগরি, তোমার তুলনা হয় না!

থলি নিয়ে গর্তের মতো জায়গাটায় নেমে গেল হোমস। মাদুরটাকে ঠেলে দিল মাঝামাঝি জায়গায়। উপুড় হয়ে শুল মাদুরের ওপর। দু-হাতে চিবুক রেখে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল পদদলিত কাদার দিকে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে, তোবা! তোবা! এ আবার কী?

জিনিসটা একটা মোমের দেশলাই কাঠি। আধপোড়া। এত কাদা লেগেছে যে কাঠের টুকরো বলে মনে হচ্ছে।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল গ্রেগরির, আশ্চর্য! আমার চোখ এড়িয়ে গেল!

কাদায় ঢুকে ছিল বলে দেখতে পাওনি। কিন্তু আমি ঠিক এই জিনিসটাই খুঁজছিলাম বলে দেখতে পেয়েছি।

বলেন কী! আপনি জানতেন কাঠি দেখতে পাবেন?

সম্ভাবনা ছিল। বলে থলি থেকে জুতো বার করে ছাপগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল হোমস। সর্বশেষে গর্তের কিনারায় হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এসে হাত পায়ে হামাগুড়ি মেরে এগিয়ে চলল ঝাউ আর ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে।

আর ছাপ পাবেন না, মি. হোমস। চারদিকে এক-শো গজ পর্যন্ত জমি তল্লাশ করেছি আমি, বলল গ্রেগরি।

তাই নাকি? তাহলে নতুন করে খোঁজার ধৃষ্টতা আর দেখাব না। ঘোড়ার নালটা পকেটে নিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পর্যন্ত জলায় একটু বেড়িয়ে নিই বরং–কপাল খুলে যেতে পারে।

বন্ধুবরের ধীর স্থির পদ্ধতিমাফিক কাজকর্ম দেখতে দেখতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল কর্নেল রসের। ছটফট করছিলেন এতক্ষণ। এবার ঘড়ি দেখলেন।

বললেন, ইনস্পেকটর, আপনি কি আসবেন আমার সঙ্গে? আপনার পরামর্শ দরকার কয়েকটা ব্যাপারে বিশেষ করে ওয়েসেক্স কাপ বাজি জেতার দৌড়ে। সিলভার ব্লেজ যে দৌড়োচ্ছে না–এটা জানিয়ে দেওয়া দরকার পাবলিককে।

কক্ষনো না! জোর গলায় বললে হোমস। সিলভার ব্লেজ দৌড়োবে।

বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানালেন কর্নেল।

আপনার অভিমতের জন্যে ধন্যবাদ। হাওয়া খাওয়া শেষ হলে স্ট্রেকারের বাড়িতে আসবেন। ওখান থেকেই গাড়িতে ট্যাভিসটক ফিরব।

বলেই, ইনস্পেকটরকে নিয়ে হনহন করে চলে গেলেন ভদ্রলোক। জলার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি আর হোমস। পড়ন্ত রোদে অপূর্ব লাগছে আশপাশের দৃশ্য। হোমস কিন্তু কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। ডুবে রয়েছে নিজের চিন্তায়।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বললে, ওয়াটসন, জন স্ট্রেকারকে কে খুন করেছে আপাতত তা নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে চলো ঘোড়াটার কী হল দেখা যাক। ধর, সিলভার ব্লেজ ছুটে পালিয়েছে। ঘোড়ারা কখনো দলছুট হয়ে একলা থাকে না–দলে ফিরে আসে। সেক্ষেত্রে সিলভার ব্লেজ ফাঁকা জলায় ঘুরে মরতে যাবে কেন? হয় কিংস পাইল্যান্ড না হয় কেপলটনের আস্তাবলে গিয়ে ভিড়বে। বেদেরা কখনোই এ-রকম বিখ্যাত ঘোড়া নিয়ে পুলিশের হামলায় যেতে চাইবে না–ওরা ঝঞ্ঝাট একদম পছন্দ করে না। বুঝলে?

সিলভার ব্লেজ তাহলে এখন কোথায়?

কিংস পাইল্যান্ড অথবা কেপলটন–এই দুটো আস্তাবলের একটায় তার ফেরা উচিত। প্রথমটায় সে যায়নি–তাহলে নিশ্চয় দ্বিতীয়টায় গিয়েছে। অনুমতিটা বাজিয়ে নেওয়া যাক। গ্রেগরি যেদিকে পায়ের ছাপ খুঁজেছে–সেদিকটা শুকনো খটখটে। কিন্তু কেপলটনের দিকে জমি ঢালু হয়ে গেছে, বৃষ্টির জলে কাদাও নিশ্চয় আছে। সিলভার ব্লেজ যদি ওইদিকেই গিয়ে থাকে, পায়ের ছাপ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

একটু খোঁজাখুঁজির পর সত্যিই দেখা গেল একসারি অশ্বখুর-চিহ্ন এগিয়ে গিয়েছে কাদাজমা গর্তের মতো একটা জায়গা দিয়ে। পকেট থেকে সিলভার ব্লেজের নাল বার করে মিলিয়ে দেখল হোমস একই নালের ছাপ।

সোল্লাসে বললে হোমস, দেখলে তো? একেই বলে কল্পনার পুরস্কার। এই একটি ঘাটতি আছে গ্রেগরির ভেতরে! চলো, এগিয়ে দেখা যাক।

কাদাটে গর্ত পেরিয়ে আবার সিকি মাইলটাক পথ শুকনো খটখটে মাটি মাড়িয়ে এলাম। আবার জমি ঢালু হয়েছে দেখা গেল। আবার কাদার ওপর পাওয়া গেল অশ্বখুর-চিহ্ন। তারপর আধ মাইল রাস্তায় কোনো চিহ্নই নেই। ফের পাওয়া গেল কেপলটনের আস্তাবলের কাছে। বিজয়োল্লাস দেখলাম হোমসের দুই চোখে। সিলভার ব্লেজ এবার একা নয়–পাশে একটা মানুষের পায়ের ছাপও পড়েছে।

সে কী! এতক্ষণ তো একাই হেঁটেছে সিলভার ব্লেজ! সবিস্ময়ে বললাম আমি।

ঠিক কথা, ঠিক কথা! এতক্ষণ একা হেঁটেছে সিলভার ব্লেজ। আরে! আরে! এ আবার কী!

যুগ্ম পদচিহ্ন সহসা মোড় ঘুরে কিংস পাইল্যান্ডের দিকে গিয়েছে। শিস দিয়ে উঠল হোমস। চললাম দুজনে মানুষ আর ঘোড়ার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যুগল পদচিহ্নকে ফের উলটোদিকে চলতে দেখে।

চললাম সেইদিকে। একটু পরেই এসে পড়লাম পিচ বাঁধানো রাস্তায়। সামনেই কেপলটন আস্তাবলের ফটক। ভেতর থেকে হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এল একজন, সহিস।

কী চাই? কী চাই? ফালতু লোকের ঘোরাফেরা এখানে চলবে না।

তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কাল ভোর পাঁচটায় এলে মি. সিলাজ ব্রাউনকে পাওয়া যাবে?

ভোরেই তো ওঠেন উনি। কিন্তু তার দরকার হবে না। ওই উনি আসছেন।

সাঁই-সাঁই শব্দে চাবুক নাড়তে নাড়তে হনহন করে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে এল ভীষণদর্শন এক বয়স্ক পুরুষ।

ডসন, কীসের আড্ডা হচ্ছে? যাও, নিজের কাজে যাও! আপনারা এখানে কেন?

আপনার সঙ্গে মিনিট দশেক হাওয়া খেতে। যেন মিছরি ঝরে পড়ল হোমসের বচনে।

বাজে লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। ভাগুন বলছি। নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

গলা বাড়িয়ে ট্রেনারের কানে কানে কী যেন বলল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে আঁতকে উঠল সিলাজ ব্রাউন–টকটকে লাল হয়ে গেল মুখখানা।

মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা।

বেশ তো, মিথ্যেই যদি হয় তো তা নিয়ে খোলা জায়গায় তর্ক না-করে ভেতরে গেলে হয় না?

আসুন! আসুন!

মুচকি হেসে হোমস বললে, ওয়াটসন, মিনিট কয়েক দাঁড়াও এখানে চলুন মি. ব্রাউন। ঠিক দশ মিনিট পরে বেরিয়ে এল দুজনে। এইটুকু সময়ের মধ্যে সিলাজ ব্রাউনের মুখচ্ছবি আশ্চর্যভাবে পালটে গিয়েছে। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুখ, ফেঁটা ফোঁটা ঘাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে কপালে। হাতের চাবুক থর থর করে কাঁপছে হাওয়া-আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মতো। চোয়াড়ে মারকুটে চেহারা যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে, প্রভুভক্ত কুত্তার মতো ল্যাজ গুটিয়ে হাঁটছে হোমসের পাশে পাশে।

বললে কেঁউ কেঁউ করে, যা বললেন, ঠিক তাই হবে, স্যার।

ভুল যেন না হয়। চোখে চোখ রেখে বললে হোমস। ইস্পাত-কঠিন চোখের সেই দৃষ্টি দেখে সিটিয়ে গেল বেচারি ব্রাউন।

না, না, কোনো ভুল হবে না। সময়মতো হাজির থাকবে। পালটাব কখন? আগে, না পরে?

ভেবে নিল হোমস। অট্টহেসে বললে, না। এখন কোনো পালটাপালটি নয়। চিঠি লিখে জানাব। কিন্তু যদি দেখি ওপরচালাকির তালে আছেন—

না, না। বিশ্বাস করুন আমি কথা দিচ্ছি।

ঠিক নিজের মতন যত্নআত্তি করা চাই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

বলে, করমর্দনের জন্যে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল সিলাজ ব্রাউন। হোমস কিন্তু হাত ছুঁলো না পেছন ফিরে পা বাড়াল কিংস পাইল্যান্ডের দিকে।

যেতে যেতে বললে, এ-রকম একটা কাপুরুষ, চোয়াড়ে আর ছিঁচকে আর দেখিনি।

ঘোড়া-চোর তাহলে সে?

মানতে কি আর চায়। কিন্তু নিশীথ রাতের কাণ্ডকারখানা যখন হুবহু বলে গেলাম, তখন ভাবল ওর সমস্ত কীর্তি আমি আড়াল থেকে দেখেছি। কাদার মধ্যে অদ্ভুত-মাথা চৌকোনা বুটের ছাপ তুমিও দেখেছ। ব্রাউনের বুটের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় সেই বুট। এ-রকম একটা কুকাজের ভার কেউ অধস্তন লোকের ওপর দেয় না নিজেই সারে। সাক্ষী রাখে না। খুঁটিয়ে বললাম সে-রাতে কী ঘটেছিল। রাত থাকতে যার ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস, সে নিশ্চয় সেদিনও বিছানা ছেড়ে বেরিয়েছিল জলায়–এমন সময়ে দেখলে সিলভার ব্লেজ আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথমে ঠিক করল, যেখানকার ঘোড়া সেখানেই রেখে আসবে। তাই লাগাম ধরে এগোল কিংস পাইল্যান্ডের দিকে। কিন্তু একটু যেতেই মাথায় ভূত চাপল। ঠিক করলে, ঘোড়দৌড়টা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক। তাই লুকিয়ে রাখল কেপলটনেই।

কিন্তু আস্তাবল তো দেখে গেছে গ্রেগরি।

আরে ভায়া, ঘোড়ার জালিয়াতিতে যারা হাত পাকিয়েছে, তারা জানে ঘোড়া কী করে লুকোতে হয়।

কিন্তু ওর কাছে এখন ঘোড়া রেখে দেওয়া কি ঠিক হল?

নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে ও এখন দরকার হলে ঘোড়াটাকেই মাথায় তুলে রাখবে।

কিন্তু কর্নেল রস ওর মাথা আস্ত রাখবে বলে মনে হয় না।

কর্নেল রস জানলে তো। আমি সরকারের নুন খাই না যে সব কথা বলতে হবে। তা ছাড়া কর্নেল লোকটা আমার সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি। কাজেই ওঁকে নিয়ে একটু মজা করব। ঘোড়া পাওয়া গেছে বলে ফেলো না যেন।

পাগল! এবার তাহলে কোরের খুনিকে ধরবে তো?

আরে না। আজ রাতের ট্রেনেই লন্ডন ফিরব।

মাথায় বাজ পড়লেও এতটা অবাক হতাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এসেছে ও ডেভনশায়ারে। এর মধ্যে তদন্ত ছেড়ে সরে পড়ার মতো কী এমন কারণ ঘটল মাথায় এল না। হোমসের মুখ থেকেও একটি কথাও আর বার করতে পারলাম না।

জন স্ট্রেকারের বাড়ির বারান্দায় দেখা গেল কর্নেল আর ইনস্পেকটরের সঙ্গে।

হোমস বললে, ডার্টমুরের চমৎকার বাতাস খুবই ভালো লাগল। মাঝরাতের এক্সপ্রেসে লন্ডন ফিরছি।

দু-চোখ পরো খুলে গেল ইনস্পেকটরের অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকে গেল কর্নেলের।

বললেন, স্ট্রেকারের খুনিকে ধরবার আশা তাহলে ছাড়লেন?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, একটু অসুবিধে হচ্ছে। আপনার জকি কিন্তু তৈরি রাখবেন– বৃহস্পতিবার মাঠে নামছে সিলভার ব্লেজ। জন স্ট্রেকারের একটা ফটো পেতে পারি?

পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল ইনস্পেকটর।

মাই ডিয়ার গ্রেগরি তোমার দুরদৃষ্টি দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। আমি কী চাই তা আগে থেকেই আঁচ করে রাখ। একটু দাঁড়াও, ঝি-টাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসি।

ঘর থেকে হোমস বেরিয়ে যেতেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্নেল বললেন, লন্ডন থেকে ডিটেকটিভ আনিয়ে পণ্ডশ্রম হল দেখছি।

ঘোড়া তো ফিরে পাচ্ছেন, প্রতিবাদের সুরে বললাম আমি।

আগে তো পাই, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন কর্নেল।

মুখের মতো জবাব দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা ঝুঁকে পড়ে আস্তাবলের ছোকরাটাকে হোমস জিজ্ঞেস করল, ভেড়াগুলোর দেখাশুননা করে কে?

আমি।

সম্প্রতি অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছ?

তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে।

ভেড়াদের খোঁড়া হওয়ার ঘটনায় খুশি যেন উপচে পড়ল হোমসের চোখে-মুখে। খুকখুক। করে শুকনো হেসে দু-হাত ঘষতে ঘষতে চিমটি কেটে বসল আমার হাতে।

বলল, দেখলে তো! অন্ধকারে ঢিল ছুড়লাম, ঠিক লাগল গায়ে! মাই ডিয়ার গ্রেগরি, ভেড়াদের এই অত্যাশ্চর্য মড়ক নিয়ে তুমি একটু তলিয়ে ভেবো। কোচোয়ান, চালাও জোরসে!

বন্ধুবর সম্পর্কে কর্নেল রসের ধারণা যে কতখানি নেমে গেল এই উচ্ছ্বাসে, তা উৎকটভাবে প্রকট হল তার চোখে-মুখে। কিন্তু গ্রেগরির চোখে যেন হিরের ঝিকিমিকি দেখলাম। নিঃসীম আগ্রহ আতশবাজির মতো ফেটে পড়ল চোখে-মুখে।

বলল, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ?

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর কোনো ব্যাপারে আমাকে তলিয়ে ভেবে দেখতে হবে কি?

গভীর রাতে কুকুরটার কাণ্ডটা নিয়ে একটু ভেবো–সত্যিই অদ্ভুত।

কুকুর তো কিছু করেনি।

সেইটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার হে।

চারদিন পর হোমসসহ গেলাম উইঞ্চেস্টার। সেখান থেকে কর্নেলের গাড়িতে রেসকোর্সে। ভদ্রলোক দেখলাম সাংঘাতিক গম্ভীর। ব্যবহারটাও রসকষহীন।

বললেন, ঘোড়ার ল্যাজ পর্যন্ত এখনও দেখলাম না।

দেখলে চিনতে পারবেন তো? হোমসের প্রশ্ন।

ভীষণ রেগে গেলেন কর্নেল, বিশ বছর রেসকোর্সে আছি–আজ পর্যন্ত এ-কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমাকে। সিলভার ব্লেজের সাদা কপাল আর তার পায়ের দাগ দেখলে বাচ্চা ছেলেও চিনতে পারে।

কীরকম বাজি চলছে?

সেটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। গতকাল ও ছিল পনেরোতে এক। কমতে কমতে আজ দাঁড়িয়েছে তিনে এক।

হুম! তার মানে ভেতরের খবর কেউ রাখে মনে হচ্ছে!

রেসকোর্সে ঘোড়ার নাম লেখা রয়েছে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম ছ-টা ঘোড়ার মধ্যে সিলভার ব্লেজের নামও রয়েছে। জকির মাথায় কালা টুপি, গায়ে লাল জ্যাকেট।

বললাম, ওই তো আপনার ঘোড়া দৌড়োচ্ছে।

কোথায়? দেখছি না তো? আকাশ থেকে পড়লেন কর্নেল।

নাম যখন আছে, ঘোড়াও আছে। পাঁচটা ঘোড়া গেল–এবারেরটা নিশ্চয় আপনার।

মুখের কথা খসতে-না-খসতেই ওজন নেওয়ার ঘেরা জায়গা থেকে টগবগিয়ে বেরিয়ে এল। একটা তেজি ঘোড়া সামনে দিয়েই গেল–পিঠে কর্নেলের বহু পরিচিত লাল-কালো চিহ্ন।

কক্ষনো না, এ-ঘোড়া আমার নয়,তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন কর্নেল, এ কী করলেন মি. হোমস? এর গায়ের একটা লোমও তো দেখছি সাদা নয়।

নির্বিকার কণ্ঠে হোমস বললে, দেখাই যাক না। আমার দূরবিন টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দূরের দিকে। তারপর বলল, চমৎকার! শুরুটা চমৎকার হয়েছে! আসছে! আসছে! মোড় ঘুরে আসছে!

গাড়িতে বসেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম কক্ষচ্যুত উল্কার মতো ছটা ঘোড়া প্রায় গায়ে গা

গয়ে সোজা ধেয়ে আসছে। কেপলটনের ঘোড়াটা এগিয়ে ছিল কিন্তু মাঝামাঝি এসেই। হঠাৎ দমক মেরে কর্নেলের লাল-কালো ঘোড়া সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

এতক্ষণ দমবন্ধ করে বসে ছিলেন কর্নেল। এবার বিরাট নিশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ! বাঁচলাম! আমার ঘোড়াই বাজিমাত করল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারছি না, মি. হোমস? রহস্য যে আর সইতে পারছি না?

এখুনি সব জানবেন, কর্নেল। চলুন, যাওয়া যাক আপনার ঘোড়ার কাছে, ওজন নেওয়ার ঘেরা অঞ্চলে ঢুকলাম আমরা। মদ দিয়ে মুখ আর পা ধুইয়ে দিন, কর্নেল সিলভার ব্লেজকে দেখতে পাবেন।

বলেন কী!

ঘোড়া জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিল সিলভার ব্লেজ–ওই অবস্থাতেই মাঠে নামিয়েছি।

মাই ডিয়ার স্যার, ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে অশেষ উপকার করলেন আমার। এবার ধরিয়ে দিন জন স্ট্রোরের খুনিকে।

ধরিয়ে তো দিয়েছি। শান্তকণ্ঠ হোমসের।

আমি আর কর্নেল দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। সমস্বরে বললাম, কোথায় সে?

এখানেই।

এইখানে? কোথায়?

আমাদের সঙ্গে।

রেগে গেলেন কর্নেল, দেখুন মশায়, উপকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু গাড়োয়ানি ইয়ার্কির সময় এটা নয়। যথেষ্ট অপমানিত বোধ করছি আমি।

হাসতে লাগল শার্লক হোমস।

বললে, কর্নেল, আপনাকে খুনি ঠাউরেছি এটা কেন ভাবছেন? আসল খুনি দাঁড়িয়ে আপনার ঠিক পেছনে?

বলে হাত বুলোতে লাগল সিলভার ব্লেজের চকচকে ঘাড়ে।

সিলভার ব্লেজ!

যুগপৎ চিৎকার করে উঠলাম আমি আর কর্নেল।

হ্যাঁ, সিলভার ব্লেজ। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে গিয়েই ট্রেনারকে খুন করতে হয়েছে তাকে। জন স্ট্রেকার লোকটা পয়লা নম্বর নেমকহারাম। যাক গে, ঘণ্টা বেজে গেল। পরের ঘোড়াগুলির দৌড় আগে দেখি, ব্যাখ্যানা পরে হবেখন।

লন্ডন ফেরার পথে চলন্ত পুলম্যান গাড়ির কোনায় বসে হোমসের মুখে আমি আর কর্নেল শুনলাম রহস্য উদঘাটনের বিচিত্র কাহিনি। সময় যে কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেও পারলাম না।

খবরের কাগজ পড়ে যা ভেবেছিলাম, এখানে পৌঁছানোর পর দেখলাম, তা ভুল। ভেবেছিলাম, ফিজরয় সিম্পসন নাটের গুরু। পরে দেখলাম তার বিপক্ষে প্রমাণ নেই। জন স্ট্রেকারের বাড়ি যাওয়ার সময়ে হঠাৎ চোখ খুলে গেল আমার। মনে আছে নিশ্চয় এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে তোমরা সবাই নেমে পড়েছিলে গাড়ি থেকে আমার একদম খেয়াল ছিল না–বসেই ছিলাম। আসলে কী হয়েছে জান, মাটনকারির অত্যন্ত

ইঙ্গিতপূর্ণ, অথচ অত্যন্ত সহজ সূত্রটা কেন যে আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল অবাক হয়ে তাই ভাবছিলাম।

কর্নেল সোৎসাহে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যেন কীরকম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাটনকারির সঙ্গে এ-ব্যাপারের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না তো।

আমার যুক্তি-শৃঙ্খলের পয়লা-নম্বর আংটা হল মাটনকারি। গুঁড়ো আফিম স্বাদহীন হয় না কখনোই। গন্ধটা যাচ্ছেতাই না-হলেও, ধরা যায়। মামুলি খাবারে মেশালে জিভে ধরা পড়বেই, যাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, সে আর নাও খেতে পারে। কিন্তু মাটনকারিতে মেশালে ধরা যায় না, আফিম মেশানোর আদর্শ রান্না হল মাংসের ঝোল। স্বাদ একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়। স্ট্রেকার পরিবারে মাংসের ঝোল পরিবেশন করা ফিজরয় সিম্পসনের মতো আগন্তুকের পক্ষে সম্ভব নয় কোনোমতেই। ঠিক যে-রাতে মাংস রান্না হয়েছে, সেই রাতেই সে লন্ডন থেকে আফিমের গুঁড়ো পকেটে করে নিয়ে আসবে, এটা একটা অসম্ভব কাকতালীয়, হতেই পারে না। বাকি রইল তাহলে দুজন–স্ট্রেকার আর তার স্ত্রী ছাড়া মাটনকারির আয়োজন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আস্তাবলের ছেলেটার খাবারেই কেবল আফিম মেশানো হয়েছে, বাড়ির লোকের মাংসে নয়। এডিথ দেখেনি কে মিশিয়েছে। তাহলে সে কে?

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল কুকুরটার চুপ করে থাকাটা। রাতদুপুরে আস্তাবলে ঢুকে সিলভার ব্লেজকে বার করে আনা হয়েছে অথচ কুকুরের কাজ কুকুর করেনি, একদম হাঁকডাক করেনি। তার মানে কি এই নয় যে ঘোড়া নিয়ে গেছে, কুকুর তাকে চেনে?

সেইজন্যেই অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, মাঝরাতের নিশিকুটুম্বটি আসলে জন স্ট্রেকার স্বয়ং। মাটনকারিতে আফিম সে-ই মিশিয়েছে। ঘোড়াও সে বার করেছে। কিন্তু কেন? অনেক সময়ে দেখা গেছে, ট্রেনাররা টাকার লোভে ভালো ঘোড়াকে খুব সূক্ষ্মভাবে খারাপ করে দেয়। কখনো কখনো জকির হাতও থাকে এই ষড়যন্ত্রে। এমনভাবে এই কাজ করা হয় যে ধরা মুশকিল। তাই কী-কী জিনিস পকেটে নিয়ে নিশীথ অভিযানে বেরিয়েছিল জন স্ট্রেকার, দেখতে চেয়েছিলাম।

পকেটে পেলাম আশ্চর্য সেই ছুরি, যা ভাঁজ করে পকেটে রাখা যায় না, মারপিটের সম্ভাবনায় যে ছুরি পকেটে নিয়ে কেউ বেরোয় না। ওয়াটসন ডাক্তার মানুষ, সে বলল এ-ছুরি চোখের ছানিকাটার মতো সূক্ষ্ম কাজে লাগে। কর্নেল রস, আপনি নিশ্চয় জানেন, ঘোড়ার পেছনের পায়ের টেন্ডন সামান্য একটু চিরে দিলে ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যায়। মনে হয় যেন বেশি প্র্যাকটিস করেছে বা বাত হয়েছে বলে খোঁড়াচ্ছে, কুকীর্তিটা কখনোই ধরা পড়ে না।

এই পর্যন্ত শুনেই স্কাউন্ড্রেল, ভিলেন বলে চিৎকার করে উঠলেন কর্নেল।

হোমস বললে, এই কারণেই ঘোড়া নিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়েছিল স্ট্রেকার। আস্তাবলের ভেতরে খোঁচাখুঁচি করতে গেলে দাপাদাপির ঠেলায় ঘুম ভেঙে যেত প্রত্যেকের।

মোমবাতি আর দেশলাই সঙ্গে নিয়েছিল সেই কারণেই, রাগে আগুন হয়ে বললেন কর্নেল।

হ্যাঁ। পকেটে পাওয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করেই বোঝা গেল যে কতখানি নীচে সে নেমেছে। অন্যের রসিদ কেউ পকেটে নিয়ে বেড়ায় না। একটা দামি মেয়েদের ড্রেসের রসিদ তার পকেটে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম, এর ভেতরে বাইরের মেয়ে আছে। তার পেছনে টাকা ওড়াতে হচ্ছে। স্ট্রেকারকে। বিশ গিনির ড্রেস স্ট্রেকার-গৃহিণী পরে কি না, কায়দা করে জেনে নিলাম। সে বেচারি চোখেও কখনো দেখেনি এত দামি ড্রেস। অর্থাৎ মি. ডার্বিশায়ার নামক লোকটা স্ট্রেকারের বন্ধু নয়, সে নিজে। স্ট্রোরের ছবি নিয়ে পোশাক যে-দোকানে বিক্রি হয়েছে গেলাম সেখানে, তারাও বললে এই হল মি. ডার্বিশায়ার।

এবার সব স্পষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে পালাতে গিয়ে সিম্পসন বেচারি গলাবন্ধ ফেলে গিয়েছিল। সেইটা কুড়িয়ে পায় স্ট্রেকার। ভেবেছিল তাই দিয়ে সিলভার ব্লেজের পেছনের পা জোড়া বেঁধে ছুরি চালাবে। কিন্তু ঘোড়াদের অদ্ভুত সহজাত অনুভূতি থাকে–আসন্ন বিপদ ওরা আঁচ করতে পারে। অথবা হয়তো হঠাৎ আলোর ঝলক দেখে চমকে উঠে লাথি মারে জোড়া পায়েসজোরে লাগে স্ট্রোরের কপালে লোহার নাল লাগানো তেজিয়ান ঘোড়ার চাট বড়ো সোজা কথা নয়–গুঁড়িয়ে যায় স্ট্রোরের খুলি। ওভারকোট খুলে ঝোপে রেখেছিল কাজের সুবিধের জন্যে–ফলে আচমকা চাট খেয়ে হাতের ছুরি গিয়ে লাগল নিজের উরুতে।

তারপর একটু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে সিদ্ধান্তটা যাচাই করে নিলাম। ঘোড়ার টেন্ডন চেরবার আগে নিশ্চয় হাত পাকিয়েছে স্ট্রেকার। ভেড়াগুলো দেখে মনে হল এদের ওপর প্র্যাকটিস করেনি তো? জিজ্ঞেস করতেই সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। সত্যিই হঠাৎ তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন, কিন্তু সিলভার ব্লেজকে পেলেন কোত্থেকে?

আরে মশাই, ছিল কোনো প্রতিবেশীর কাছে। ভালোই ছিল। এই তো ক্ল্যাপহ্যাম জংশন এসে গেল। ভিক্টোরিয়া পৌঁছোব দশ মিনিটেই। কর্নেল, গরিবের বাড়িতে যদি পায়ের ধুলো দেন, তাহলে চুরুট খেতে খেতে না হয় আরও কিছু শুনে যাবেন।

———-

টীকা

১. ঘোড়ার নাম সিলভার ব্লেজ : সিলভার ব্লেজ লন্ডনের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯২ সংখ্যায়, নিউইয়র্কে মুদ্রিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়।

২. ডার্টমুরে : দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলন্ডের ডেভনশায়ারের অন্তর্গত ডার্টমুর প্রধানত গঠিত জলাভূমি এবং টর নামে পরিচিত গ্রানাইট পাথরের ছোটো বড়ো বিস্তর টিলা নিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এখানে লৌহযুগ এবং ব্রোঞ্জযুগে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে। শার্লক হোমসের বিখ্যাত উপন্যাস দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস-এর পটভূমিও ডার্টমুরে। স্যাক্সনদের রাজত্বকালে ডার্টমুর ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ঊনবিংশ শতকের প্রাক্কালে এখানে একটি কারাগার নির্মিত হয়। ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধে বন্দিদের রাখা হত সেই কারাগারে।

৩. ঘোড়ার দালাল : এদের কাজ হল রেসের ঘোড়ার হাল হকিকত সম্পর্কে আগাম খবর জোগাড় করে, তা অর্থের বিনিময়ে রেসুড়ে জুয়াড়িদের জানিয়ে বাজি ধরতে সাহায্য করা।

৪. ট্যাভিসটক : ডার্টমুরের পশ্চিমতম প্রান্তে ট্যাভিসটকের অবস্থান।

৫. ল্যান্ডো : চারটি চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা গাড়ি। এই গাড়ির ছাদ প্রয়োজনমতো বন্ধ করা বা খুলে রাখা যেত। আবারসওয়ারির ইচ্ছে হলে আধখোলাও রাখা যেত।

৬. ক্যাভেন্ডিস তামাক : ক্যাভেন্ডিস নামক কোম্পানি এই তামাক বিক্রি করত ডেলাকৃত টুকরো অবস্থায়।

৭. বন্ড স্ট্রিটের : দুটি বন্ড স্ট্রিটের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওল্ড বন্ড স্ট্রিট এবং নিউ বন্ড স্ট্রিট। হাল ফ্যাশনের পোশাক এবং ছবির গ্যালারির জন্য বিখ্যাত নিউ বন্ড স্ট্রিট।

৮. পুলম্যান গাড়ি : রাত্রে শুয়ে ভ্রমণ করবার উপর্যুক্ত রেল-কামরার নাম পুলম্যান কোচ হয়েছিল যিনি এই গাড়ির নকশা করেন। সেই আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার জর্জ মর্টিমার পুলম্যানের (১৮৩১-১৮৯৭) নামে।

৯. এ-ছুরি চোখের ছানি কাটার মতো সূক্ষ্ম কাজে লাগে : বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ছানি কাটার ছুরি এতই পাতলা যে তা দিয়ে ঘোড়ার পায়ের টেন্ডন বা অন্য যেকোনো পেশিতে কোনো ক্ষত সৃষ্টি করা অসম্ভব।

১০. ভিক্টোরিয়া পৌঁছোব : এই গল্পর ঘটনার সময়ে কোনো ট্রেন উইনচেস্টার থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আসত না। আসত ওয়াটারলু স্টেশনে।

নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র

[দ্য নেভ্যাল ট্রিটি]

আমার বিয়ের পরের জুলাই মাসটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে শার্লক হোমসের সান্নিধ্যে থেকে পর পর তিনটে চাঞ্চল্যকর কেসে তার অপূর্ব বিশ্লেষণী তদন্ত পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়ার জন্যে। এর মধ্যে প্রথম কেসটির গুরুত্ব বেশি হলেও জনসমক্ষে প্রকাশ করার সময় এখনও হয়নি। তাই শুরু করছি কেসের চমকপ্রদ বিবরণ। বিবিধ চিত্তাকর্ষক ঘটনার দৌলতে মামলাটি বাস্তবিকই অভিনব।

স্কুলে পড়বার সময়ে পার্সি ফেল্পস নামে একটি ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে আমার হরিহর আত্মা সম্পর্ক ছিল। বয়স সমান হলেও সে আমার চাইতে দু-ক্লাস এগিয়ে ছিল। পড়াশুনায় অত্যন্ত ভালো, মেধাবী, এককথায় যাকে বলে হিরের টুকরো, তাই শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে, বছর বছর গাদাগাদা প্রাইজ পেয়েছে। লর্ড হোল্ডহার্স্ট ছিলেন ওর মামা।

স্কুল থেকে বেরোনোর পর পার্সির সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ ছিল না। তবে শুনেছিলাম নিজের মেধা, কর্মদক্ষতা আর মামার সুপারিশের জোরে বৈদেশিক দপ্তরে এখন সে কেউকেটা।

এই পার্সি ফেল্পসের কাছ থেকেই হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম একদিন।

ব্রায়ারব্রে, ওকিং

প্রিয় ওয়াটসন,

বেঙাচি ফেল্পসকে নিশ্চয় মনে আছে? তুমি ক্লাস থ্রি-তে পড়তে, আমি ক্লাস ফাইভে। মামার মুরুব্বিয়ানার জোরে বৈদেশিক দপ্তরে কাজ পাওয়ার খবরও নিশ্চয় শুনেছ। নামডাক যশ খ্যাতি যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়ে একটা ভয়াবহ ঘটনার ফলে আমার সর্বনাশ হতে বসেছে।

ঘটনাটা কী, চিঠির মধ্যে তা লিখব না। শুধু শুনে রাখো, এর ফলে আমি বিছানা নিয়েছি। কয়েক হপ্তা এক নাগাড়ে ব্রেনফিভারে ভুগে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। এখনও এত কাহিল যে চিঠিটা পর্যন্ত নিজের হাতে লিখতে পারছি না।

ওপরওলা মনে করেন, এ-ব্যাপারে আর করণীয় কিছু নেই। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। শেষ চেষ্টা করতে চাই। তোমার বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করতে পারিনি রোগের প্রকোপে অস্থির ছিলাম বলে। তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? তার পরামর্শ একান্ত প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি পার, তাঁকে নিয়ে এস।

তোমার অনেকদিনের দোস্ত
পার্সি ফেল্পস

হোমসকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা প্রকট হয়েছে যে আমার স্ত্রীও বললে এখুনি বন্ধুবরের কাছে যাওয়া উচিত। ব্রেকফার্স্ট সেরে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজির হলাম বেকার স্ট্রিটের বাসায়।

হোমস তখন ড্রেসিংগাউন পরেই রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে তন্ময়। আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ফের ডুবে গেল বুনসেন বার্নারের নীলচে শিখায় ফুটন্ত বকযন্ত্র মধ্যস্থ তরল পদার্থটা নিয়ে। কয়েকটা ফেঁটা একটা কাচনলের মধ্যে তুলে নিয়ে বোতলে রেখে বানাল একটা সলিউশন। একহাতে একটা লিটমাস কাগজ নিয়ে বললে, ভায়া, বড়ো অসময়ে এসেছ। কাগজটা নীল থাকলে শুভ, আর যদি লাল হয়ে যায় একজনের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

বলে, লিটমাস ভেজাল সলিউশনে। সঙ্গেসঙ্গে টকটকে লাল হয়ে গেল কাগজটা। যাচ্চলে! যা ভেবেছিলাম শেষকালে তাই হল। বলে ডেস্কে বসে খানকয়েক টেলিগ্রাম ফর্ম টেনে নিয়ে দ্রুত হাতে লিখে ছোকরা চাকরকে ডেকে পোস্টাপিসে পাঠিয়ে দিল হোমস।

তারপর আমার সামনের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে বললে, খুবই মামুলি মার্ডার কেস। এর চাইতে ভালো কেস তোমার মুখে শোনার আশা করছি। ভায়া, তুমি হলে গিয়ে অপরাধের ঝড়ো পেট্রোল পক্ষী –ক্রাইম সংবাদ ল্যাজে বেঁধে উড়ে আসো। বল, কী করতে পারি।

চিঠিটা এগিয়ে দিলাম। মন দিয়ে পড়ল হোমস।

বলল, চিঠি লিখেছেন একজন মহিলা।

মোটেই না। পুরুষের হাতের লেখা।

না। অত্যন্ত বিরল চরিত্রের এক মহিলা তোমার বন্ধুর হয়ে এই চিঠি লিখেছেন। সূত্রপাতেই বিষয়টা খুবই চিত্তাকর্ষক। ওয়াটসন, কেসটা আমার কৌতূহল জাগিয়েছে। কালবিলম্ব না-করে তোমার কূটনীতিবিদ বন্ধু এবং তার শ্রুতি লেখিকার সন্দর্শনে রওনা হতে চাই।

ওয়াটার্লু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ওকিংয়ে। ব্রায়ারব্রে বাড়িটা স্টেশন থেকে মিনিট কয়েকের পথ। কার্ড পাঠানোর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে–চল্লিশের কাছাকাছি। আমুদে দুই চোখে আনন্দ নৃত্য করছে অষ্টপ্রহর। গোলগাল দুষ্টু ছেলের মতোই টুকটুকে লাল দু-গাল।

হইহই করে আমাদের করমর্দন করলেন ভদ্রলোক। খুশি উপচে উঠল চোখে-মুখে কথায় বার্তায়, আঃ বাঁচালেন আপনারা! সকাল থেকে পার্সি বেচারা হাপিত্যেশ করে বসে আছে। আপনাদের পথ চেয়ে।

আপনাকে এ-ফ্যামিলির কেউ বলে তো মনে হচ্ছে না? হোমসের প্রশ্ন।

অবাক হয়ে চাইলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নীচের দিকে চেয়ে অট্টহেসে বললেন, দারুণ চমকে দিয়েছিলেন। বুদ্ধি বটে আপনার। লকেটে J. H. অক্ষর দেখেই ধরেছেন আমি ফেল্পস ফ্যামিলির মানুষ নই। কিন্তু কুটুম হতে চলেছি শিগগিরই। আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন। আমার বোন পার্সির হবু বউ। দু-মাস পার্সিকে ও-ই তো সেবা করছে। চলুন, চলুন, ওর ঘরে যাওয়া যাক।

ফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো একটা ঘরে ঢুকলাম। খোলা জানলা দিয়ে বাগানের মিষ্টি হাওয়া আসছে। জানলার ধারে পাশাপাশি বসে একজন যুবক আর একজন যুবতী। যুবক কঙ্কালসার, শীর্ণ এবং বিলক্ষণ উদবিগ্ন।

আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল যুবতী মেয়েটি, পার্সি, আমি আসি।

হাত ধরে মেয়েটিকে টেনে বসাল পার্সি। খুশি উচ্ছল কণ্ঠে বললে, ওয়াটসন, তোমাকে যে চেনা মুশকিল! গোঁফখানা যা বাগিয়েছ। ইনি নিশ্চয় মি. শার্লক হোমস?

পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলে চেয়ার টেনে বসলাম। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার সহোদরা পার্সির হাত ধরে বসে রইলেন। মেয়েটি শ্যামা, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী এবং খর্বকায়া। কিন্তু কৃষ্ণ কেশ, চামড়ার লাবণ্য আর ইতালীয় চক্ষুপল্লবের দরুন নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। পাশেই ঝরা পাতার মতো শুকনো লাগছে পার্সি ফেল্পসকে।

পার্সি বললে, মি. হোমস অযথা সময় নষ্ট না-করে কাজের কথায় আসছি। ওয়াটসনের মুখে শুনেছেন নিশ্চয় মামার সুপারিশে বৈদেশিক দপ্তরে ভালো কাজ পাই। মামা, মানে লর্ড হোল্ডহার্স্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার পর বিশ্বাস করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিতেন, নিজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করায় আমার ওপর তার অবিচল আস্থা জন্মেছিল। ঠিক এই সময়ে, আমার বিয়ের ঠিক মুখেই, এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে আমার ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।

আড়াই মাস আগে তেইশে মে মামা আমাকে ওঁর প্রাইভেট রুমে ডেকে দেরাজ থেকে ধূসর রঙের একটা পাকানো কাগজ বার করে বললেন–তোমাকে এবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চাই। ইংলন্ড আর ইতালির মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছে, এই হল সেই সন্ধিপত্র। খবরটা এতই গোপনীয় যে রাশিয়া বা ফ্রান্সের দূতাবাস এর বিষয়বস্তু জানবার জন্যে মোটা টাকা ছাড়তে রাজি আছে। এর মধ্যেই এ নিয়ে কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেছে, এগুলো তাই সাবধানে রেখো। তোমার ঘরে দেরাজ আছে তো?

আছে!

নকল করবার দরকার হয়েছে বলেই দেরাজ থেকে বার করলাম–নইলে করতাম না। তুমি এর কপি করবে নিজের হাতে–অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও থাকবে। কাজ শেষ হলে, নকল আর আসল দুটোই দেরাজে চাবি দিয়ে রাখবে। কাল সকালে আমার হাতে দিয়ে যাবে।

কাগজটা হাতে নিয়ে—

এক সেকেন্ড। বাধা দিল হোমস। এই কথার সময়ে ঘরে আর কে ছিল?

আমি আর মামা ছাড়া কেউ না।

ঘরটা কত বড়ো?

লম্বায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় তিরিশ ফুট। বেশ বড়ো ঘর।

আপনারা ছিলেন ঠিক মাঝখানে?

প্রায় তাই।

কথা বলছিলেন খাটো গলায়?

মামা খাটো গলাতেই কথা বলেন! আমি কিছু বলিনি।

তারপর? চোখ মুদে বললে হোমস।

মামা হুকুমমতো অফিস ছুটি না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম! কেরানি চার্লস গোরোর একটু কাজ বাকি ছিল–সেই ফাঁকে আমি খেয়ে এলাম। এসে দেখলাম সে চলে গেছে। ঝটপট কাজ শেষ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম। কেননা, আমার হবু শ্যালক জোসেফ হ্যারিসন তখন শহরেই রয়েছে। এগারোটার ট্রেনে তার ওকিং যাওয়ার কথা। পারলে আমিও একই ট্রেনে ওকিং ফিরব ঠিক করলাম।

দলিল নিয়ে প্রথমেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম, সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। মামা একটুও বাড়িয়ে বলেননি। বিষয়বস্তু ত্রিশক্তির মিত্রতার ব্যাপারে নৌ বিভাগ সংক্রান্ত।

পড়া শেষ করে কপি করতে বসলাম। বিরাট ডকুমেন্ট। মোট ছাব্বিশটা ভাগে ফরাসি ভাষায় লেখা। ঝড়ের মতো হাত চালিয়েও ন-টা ভাগ লিখতেই রাত নটা বেজে গেল। মাথা ঝিম ঝিম করছিল সারাদিন পরিশ্রমের দরুন। ঘুম ঘুম পাচ্ছিল এক পেট খাওয়ার ফলে। তাই ভাবলাম কফি খেয়ে চাঙা হওয়া যাক। সিঁড়ির নীচে একজন দারোয়ান থাকে, আমাদের জন্যে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে কফি বানিয়ে দেয়। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম তাকে।

ঘণ্টার জবাবে ঘরে ঢুকল অ্যাপ্রন পরা বিরাট চেহারার এক স্ত্রীলোক। মুখটা রুক্ষ। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। শুনলাম সে দারোয়ানের স্ত্রী। কফি আনতে বললাম তাকে।

বলে, ফের নকল করতে বসলাম। দুটো ভাগ কপি করা হয়ে গেল। অথচ কফি এল না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এদিকে ঢুলছি বললেই চলে। ঘুম তাড়াবার জন্যে উঠে পায়চারি করতে করতে ভাবলাম নিজে গিয়ে তাড়া দিই দারোয়ানকে। দরজা খুলে প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। একটা ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছিল প্যাসেজে। সেখান থেকে সিঁড়ি ঘুরে চাতালে পৌঁছেছে। চাতাল থেকে একটা ছোটো সিঁড়ি ডান দিকে ঘুরে পাশের গলিতে গেছে। এ-সিঁড়ি দিয়ে চাকরবাকর বা তাড়াতাড়ি থাকলে কেরানিরা যাতায়াত করে। মূল সিঁড়িটা চাতাল থেকে সোজা নেমে হল ঘরে পৌঁছেছে। বাঁ-দিকে থাকে দারোয়ান–তারপরে সদর আর রাস্তা। এই নকশাটা দেখলেই বুঝবেন।

ভালোই বুঝছি, বললে হোমস।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে নেমে সিঁড়ি বেয়ে হল ঘরে পৌঁছোলাম। দেখলাম, মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে দারোয়ান। জ্বলন্ত স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর টগবগ করে ফুটছে জলের কেটলি। ধাক্কা মেরে তুলব বলে হাত বাড়াতে-না-বাড়াতেই ঝনঝন করে বেজে উঠল মাথার কাছেই ঘণ্টাটা। ধড়মড় করে উঠে বসল দারোয়ান।

আমাকে দেখেই থতোমতো খেয়ে বললে, মি. ফেল্পস! দেখুন দিকি কী কাণ্ড! জল গরম করতে দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েছি। বলেই বিমূঢ় চোখে ঘণ্টা আর আমার দিকে চাইতে লাগল। ঘণ্টা তখনও কাঁপছে। হতভম্ব মুখে বললে, আশ্চর্য ব্যাপার তো! আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে অথচ ঘণ্টা বাজল কী করে?

কোন ঘণ্টা?

আপনি যে-ঘরে কাজ করেছিলেন, এ-ঘণ্টা সেই ঘরের ঘণ্টা।

শুনেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ঘর খোলা, টেবিলে গোপন দলিল ফেলে এসেছি কফির তাগাদা দিতে। নিশ্চয় কেউ ঘরে ঢুকেছে। পাগলের মতো বেরিয়ে এলাম হল ঘরে–লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঢুকলাম ঘরে। দেখলাম ঘর শূন্য, নকল দলিল যেমন তেমনি পড়ে–উধাও হয়েছে আসল দলিল।

দু-হাত ঘষে উঠে বসল হোমস। সমস্যাটা নিশ্চয় মনোমতো হয়েছে।

মৃদুকণ্ঠে বললে, তখন কী করলেন?

আমি ধরে নিলাম পাশের সিঁড়ি দিয়ে চোর ঢুকেছিল ঘরে–নইলে আমার চোখে পড়ত।

ঘরের মধ্যে বা প্যাসেজে কোথাও লুকিয়ে ছিল না তো? আপনি তো বললেন ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছিল প্যাসেজে।

অসম্ভব। লুকোনোর জায়গা ওখানে নেই।

তারপর?

ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাকে ছুটতে দেখে দারোয়ান আমার পেছন পেছন ওপরে এসেছিল। আমার ফ্যাকাশে মুখ দেখে বুঝলে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। দুজনে মিলে ছোটো সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম পাশের গলিতে। এদিকের দরজা বন্ধ—কিন্তু তালা দেওয়া নেই। ঠিক এই সময়ে কাছেই একটা গির্জেতে পরপর তিনবার ঘণ্টা বাজল। রাত তখন ঠিক সোয়া দশটা।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আস্তিনে সময়টা লিখে নিল হোমস।

অন্ধকার রাত। ঝুপঝাঁপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার অন্যদিকে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। গাড়িঘোড়া স্রোত বয়ে চলেছে হোয়াইট হলের দিকে। লোকজন কিন্তু নেই।

হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে তাকে বললাম, ভীষণ কাণ্ড! পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা দারুণ

গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি হয়ে গেল এক্ষুনি। কাউকে যেতে দেখেছ এদিক দিয়ে?

পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে আছি। এর মধ্যে গায়ে শাল জড়ানো ঢ্যাঙামতো একজন স্ত্রীলোক ছাড়া কেউ যায়নি।

দারোয়ান ঝটিতি বললে, আরে সে তো আমার স্ত্রী। আর কেউ গেছে?

না।

আমার হাত ধরে টেনে দারোয়ান বললে, তাহলে সে অন্যদিকে পালিয়েছে।

আমার কিন্তু খটকা লাগল। অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতলব মনে হল। কনস্টেবলকে। জিজ্ঞেস করলাম কোনদিকে গেছে স্ত্রী-লোকটা?

অত দেখিনি। তবে খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাঁটছিল দেখেছি।

কতক্ষণ আগে?

মিনিট পাঁচেক তো বটেই।

চিৎকার করে দারোয়ান বলে উঠল, খামোকা সময় নষ্ট করছেন, মি. ফেল্পস। এ-ব্যাপারে আমার স্ত্রী নেই। তার চেয়ে রাস্তার ওদিকটা খুঁজে দেখলে কাজ দিত। আপনি যখন যাবেন না, আমিই যাচ্ছি।

বলে যেই ছুটতে যাবে, আমি খপ করে ওর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, থাকা হয় কোথায়?

ব্রিক্সটনের ষোলো নম্বর আইভি লেনে। কিন্তু কেন বাজে চিন্তা করছেন মি. ফেল্পস? এখনও সময় আছে, ওইদিকটা দেখে আসতে দিন।

ভেবে দেখলাম, তাতে ক্ষতি নেই। পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হনহন করে গিয়ে দেখে এলাম রাস্তার অন্যদিক। কিন্তু গাড়িঘোড়া আর লোকজন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

অফিসে ফিরে এসে প্যাসেজ পরীক্ষা করলাম। লিনোলিয়াম দিয়ে ঢাকা মেঝেতে পায়ের চিহ্ন থাকা উচিত কিন্তু সে-রকম কিছুই পেলাম না।

সন্ধে থেকে বৃষ্টি পড়ছিল? জিজ্ঞেস করল হোমস।

সাতটা থেকে।

কিন্তু মেয়েটা আপনার ঘরে ঢুকেছে ন-টা নাগাদ। জলকাদায় ভিজে বুটের ছাপ পড়া উচিত ছিল লিনোলিয়ামে।

দারোয়ানের ঘরে ঢুকে বুট খুলে চটি পরে এসেছিল।

ইন্টারেস্টিং। তারপর?

ঘরটা পরীক্ষা করলাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা আছে, তাই চোরা দরজা নেই। দেওয়ালেও লুকোনো পথ নেই। তিরিশ ফুট উঁচু দুটো জানলাই ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। চুনকাম করা কড়িকাঠ। দরজা ছাড়া ঢোকার আর পথ নেই–চোর দরজা দিয়েই এসেছিল।

ফায়ার-প্লেস দেখেছিলেন?

ফায়ার-প্লেসের বালাই নেই ঘরে। একটা স্টোভ আছে। তারে বাঁধা ঘণ্টার দড়ি ঝোলে আমার টেবিলের ডান দিকে। তার মানে ঘণ্টা বাজানোর জন্যে তাকে টেবিলের ডান দিকে। আসতে হয়েছে। কিন্তু চোরটা কি ঘণ্টা বাজিয়ে চুরি করে? এ কী বিষম সমস্যায় পড়লাম বলুন তো?

অসাধারণ ঘটনা নিঃসন্দেহে। পোড়া চুরুট, ফেলে-যাওয়া দস্তানা, চুলের কাটা বা ওই জাতীয় কিছু ঘরে পাওয়া গেছে?

না।

গন্ধ?

গন্ধর কথা তো আগে ভাবিনি!

তামাকের গন্ধ-টন্ধ পাওয়া গেলে তদন্ত করতে সুবিধে হত।

দেখুন, আমি তামাক খাই না। কাজেই সে-রকম গন্ধ থাকলে নিশ্চয় টের পেতাম। দারোয়ানের স্ত্রী-র হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফেরাটা আমার ভালো মনে হয়নি। দারোয়ান অবশ্য বললে, রাত হয়ে গেছে বলেই হয়তো তাড়াতাড়ি করেছে স্ত্রী, জবাবটা সন্তোষজনক– নিছক অজুহাত বলেই মনে হয়েছে। তাই দলিলটা বাড়ি থেকে হাওয়া হওয়ার আগেই হানা দেব ঠিক করলাম।

আধঘণ্টার মধ্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ মি. ফোর্বসকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম দারোয়ানের বাড়ি। দারোয়ানের বড় মেয়ে দরজা খুলে বললে, এখনও বাড়ি ফেরেনি। আমরা সামনের ঘরে বসলাম।

মিনিট দশেক পরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠতেই মেয়েটি গিয়ে দরজা খুলে বললে,মা, দুজন ভদ্রলোক তোমার জন্যে বসে রয়েছেন। কথা শেষ হতে-না-হতেই ছুটে যাওয়ার আওয়াজ শুনলাম। মি. ফোর্বস লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেলেন। আমিও পেছন পেছন ছুটলাম। দারোয়ানের স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে পেছনের রান্নাঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আমরাও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেল দারোয়ানের স্ত্রী। বললে, আরে? মি. ফেল্পস যে!

মি. ফোর্বস বললেন, পালানোর আগে আমরা কে বলে মনে করেছিলে?

আমি তো ভাবলাম দালালরা এসেছে। একটা দোকানদারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

মি. ফোর্বস বললেন, ওটা কি একটা জবাব হল নাকি? পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটু আগেই একটা ডকুমেন্ট লোপাট করে এসেছ বলেই আমরা তোমার পেছনে পেছনে এসেছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলো–সার্চ করা হবে তোমাকে।

রান্নাঘরটা পরীক্ষা করে কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। উনুনের মধ্যে দলিলটা যদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে, এই ভেবে উনুনটাই আগে দেখলাম, কিন্তু আধপোড়া কাগজ বা ছাই কিছুই চোখে পড়ল না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেয়ে-পুলিশ দিয়ে দারোয়ানের স্ত্রীর দেহ তল্লাশ করেও ডকুমেন্ট পাওয়া গেল না।

তখনই বুঝলাম কী সর্বনাশ হতে চলেছে। আমার ভবিষ্যৎ তো ঝরঝরে হয়ে গেলই, মুখে চুনকালি পড়ল আমার মামার। চোখের সামনে ভেসে উঠল কীভাবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাছে অপদস্থ হচ্ছেন মামা আমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে। মাথা ঘুরে গেল আমার। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, বহু লোক যেন আহা, আহা করে সহানুভূতি জানাচ্ছিল আমাকে। ওরাই ধরে এনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। একই কামরায় ডক্টর ফেরিয়ার বাড়ি ফিরছিলেন তিনি আমার ভার নিয়েছিলেন। স্টেশনে পৌঁছে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার সময়ে পাগলের মতো চেঁচামেচি কান্নাকাটি করেছিলাম।

ডা. ফেরিয়ারই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেন। বেশ বোঝা গেল বেশ কিছুদিনের জন্যে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে আমাকে। আমার অবস্থা দেখে জোসেফ তৎক্ষণাৎ এই খোলামেলা শোয়ার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যায় এবং ঝটপট বিছানা সাজিয়ে ফেলে। সেই থেকে এই ঘরে ন-সপ্তাহ শুয়ে আছি। দিনরাত সেবা করেছে মিস হ্যারিসন আর একজন নার্স। মাত্র তিনদিন হল স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে এসেছে। মি. ফোর্বসকে টেলিগ্রাম করে জানলাম, সবরকমভাবে তদন্ত করেও দলিল উদ্ধার করা যায়নি। দলিল চুরি যাওয়ার দিন অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর গোরো বলে একজন অল্পবয়েসি কেরানি বাড়তি কাজ করেছিল—আপনাকে বলেছি আগেই। তার ফরাসি নাম এবং বিশেষ ওই দিনেই বাড়তি কাজ করা—এই দুই কারণে পুলিশ তাকেও সন্দেহ করে। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, সে চলে যাওয়ার পর আমি দলিল নকলে হাত দিয়েছিলাম। মি. হোমস, এই অবস্থায় আপনিই আমার শেষ ভরসা। দলিল উদ্ধার করতে আপনিও যদি ব্যর্থ হন, আমার মানসম্মান চাকরিও ইতি হয়ে গেল জানবেন।

দীর্ঘ বক্তিমে শেষ করে এলিয়ে পড়ল পার্সি ফেল্পস। গেলাসে করে ওষুধ খাইয়ে দিলেন মিস হ্যারিসন সম্ভবত চাঙা করার জন্যে। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে এমনভাবে রইল হোমস যেন কোনো ব্যাপারেই তার আগ্রহ নেই। নতুন লোকের কাছে সেইরকম মনে হলেও এ-লক্ষণ আমি চিনি। অন্তরের অন্দরে ডুব দিয়েছে শার্লক হোমস।

হঠাৎ বললে, কয়েকটা প্রশ্ন করব। আপনার এই গুরু দায়িত্বর কথা কাউকে বলেছিলেন?

না।

মিস হ্যারিসনকে?

দায়িত্ব কাঁধে চাপবার একটু পরেই কাজ শুরু করেছিলাম–ওকিং এলাম তো দলিল চুরি যাওয়ার পর।

আপনার বাড়ির লোকেরা কেউ আপনাকে দৈবাৎ দেখে ফেলেনি তো?

না।

ওঁরা আপনার অফিস চেনেন?

নিশ্চয়। সবাইকে দেখিয়েছি।

দারোয়ান লোকটা কীরকম?

আগে সৈন্য ছিল শুনেছি।

কোন রেজিমেন্টের?

কোল্ডস্ট্রিম গার্ডস–যদ্দূর জানি।

ধন্যবাদ।–মি. ফোর্বসের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেবখন, বাঃ, গোলাপটা ভারি সুন্দর তো!

অকস্মাৎ জানলার ধারে গিয়ে বোঁটাসমেত একটা গোলাপ নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে খেতে যেন আবিষ্ট হয়ে গেল শার্লক হোমস। প্রকৃতি সৌন্দর্যে এভাবে কখনো ওকে বিহ্বল হতে দেখিনি। বন্ধুবরের চরিত্রের আর একটা দিক খুলে গেল সেই মুহূর্তে। দু-আঙুলে গোলাপ ধরে হালু চোখে সেদিকে তাকিয়ে আবেশভরা কণ্ঠে ফুল সম্পর্কে কত কথাই-না বলে গেল। বেঁচে থাকার জন্যে রোজ আমাদের অনেক জিনিস দরকার হয় ঠিকই, কিন্তু ফুলের দরকার হয় তার চেয়েও বেশি কারণে। ফুলের গন্ধ, ফুলের রং জীবনকে সাজিয়ে তোলে, জীবনে আশা আনে।

স্তম্ভিত হয়ে বক্তৃতা শুনছিল পার্সি আর তার প্রণয়িনী।নিঃসীম নৈরাশ্য প্রকট হয়ে উঠল দুজনেরই চোখে-মুখে, পরমুহূর্তেই মিস হ্যারিসনেরতীক্ষ্ণ কণ্ঠে মিলিয়ে গেল হোমসের দিবাস্বপ্ন–ফিরে এল মাটির পৃথিবীতে।

রুক্ষ কণ্ঠে বললেন মিস হ্যারিসন, মি. হোমস, রহস্য সমাধানের কোনো সম্ভাবনা দেখছেন?

স্বর্গ থেকে বুঝি পতন ঘটল শার্লক হোমস। বলল, রহস্য? কেস বড়ো জটিল, বুঝলেন কিনা, তবে কথা দিচ্ছি, মনের মতো সূত্র হাতে এলেই আপনাদের জানাব।

সূত্র কি আদৌ পেয়েছেন?

মোট সাতটা সূত্র পাওয়া গেছে–তবে তা যাচাই সাপেক্ষ।

কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?

নিজেকে সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি।

তাহলে লন্ডনে ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত যাচাইকরুন।

তাই করব ভাবছি, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে হোমস বললে, অপূর্ব উপদেশ দিয়েছেন। মি, ফেল্পস, ব্যাপারটা সাংঘাতিক প্যাচালো–মিথ্যে আশার স্বপ্ন দেখবেন না!

কিন্তু আপনাকে আবার না-দেখলে যে প্রাণে শান্তি পাব না, সত্যিই ককিয়ে ওঠে পার্সি।

আমি তো আসছি কালকেই। তবে কী জানেন, ফলাফলটা না-বাচকই হবে।

হোকগে। আপনাকে তো দেখতে পাব। তবুও জানব, তদন্ত তো চলছে। ভালো কথা, হোল্ডহাস্ট একটা চিঠি লিখেছেন।

কী লিখেছেন?

মোদ্দা কথা হল, আমি সুস্থ না-হয়ে-ওঠা পর্যন্ত আমার চাকরি থাকবে কি যাবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে না। মোলায়েমভাবেই ইঙ্গিত করেছেন–পাছে ফের ধাক্কা খাই অসুস্থ অবস্থায়।

ভালোই করেছেন। চলো, ওয়াটসন।

জোসেফ হ্যারিসন স্টেশন পর্যন্ত এলেন আমাদের সঙ্গে, ট্রেনে চাপবার পর ক্ল্যাপহ্যাম জংশন ছাড়িয়ে না-আসা পর্যন্ত গুম হয়ে বসে রইল হোমস। তারপর আচম্বিতে বলল, নীচের ওই বাড়িগুলো দেখেছ? ঠিক যেন সিসে রঙের সমুদ্রে ইটের তৈরি দ্বীপ।

ওগুলো ছেলেদের বোর্ডিং স্কুল।

উঁহু, ওই হল আগামীকালের ইংলন্ড! উজ্জ্বলতর, সুন্দরতর, বিজ্ঞতর ইংলন্ডের বীজ রয়েছে ওইসব ইটের দ্বীপে। ওয়াটসন, ফেল্পস নিশ্চয় মদ্যপ নন?

মনে তো হয় না।

আমারও তাই মনে হয়। বদমাশটা ওকে এমন গাড্ডায় ফেলেছে যে টেনে তোলা মুশকিল। মিস হ্যারিসনকে কেমন লাগল?

শক্ত ধাতের মেয়ে।

চরিত্রে একদম ভেজাল নেই। নর্দাম্বারল্যান্ডের১৪ লোহার কারবারির একমাত্র মেয়ে। গত শীতে ফেল্পসের সঙ্গে আলাপ এবং প্রণয়। বিয়ের আগে বাড়ি এনে রেখেছিল সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলে দাদাও এসেছে সঙ্গে। তারপরেই দেখ এই বিপত্তি। ভাইবোন দুজনেই আটকে গেল বাড়িতে। আজ সারাদিন তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকব।

আমার ডাক্তারি—

খেঁকিয়ে উঠল হোমস, তোমার ডাক্তারি আমার কেসের চেয়ে যদি বড়ো বলে মনে হয়—

আরে গেল যা! আমি বলতে যাচ্ছি ডাক্তারিটা আপাতত মুলতুবি রাখতে পারব। রুগির ভিড় এ সময়ে তেমন থাকে না।

মুহূর্তে সহজ হয়ে উঠল হোমস। বললে, তাহলে তো ভালোই হল। একসঙ্গে চলো ঝাঁপ দিই তদন্তে।

কী সূত্র পেয়েছ বলছিলে?

পেয়েছি ঠিক। কিন্তু বাজিয়ে না-দেখা পর্যন্ত বলতে চাই না। যে-অপরাধের মোটিভ থাকে , সে-অপরাধের অপরাধীকে পাকড়াও করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে লাভটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে-লাভ কার? ফরাসি রাজদূতের? যে তাদের দলিলটা বিক্রি করবে, তার? না, লর্ড হোল্ডহার্স্টের?

লর্ড হোল্ডহার্স্টের কী লাভ?

অনেক লাভ। কূটনৈতিক কারণে মূল্যবান একটা দলিল কায়দা করে লোপাট করিয়ে দিতে পারলে লাভ কি কম?

তিনি কিন্তু সে-রকম চরিত্রের মানুষ নন। অতীত অত্যন্ত উজ্জ্বল।

জানি, জানি, সেইজন্যেই তো তার সঙ্গে আজ একবার মোলাকাত হবে আমার। ভালো কথা, আমি কিন্তু তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছি। ওকিং স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সবকটা সান্ধ্য দৈনিকে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপতে বলেছি।

নোট বইয়ের ছেড়া পাতায় লেখা একটা বিজ্ঞাপনের কপি এগিয়ে দিল হোমস। বিজ্ঞাপনটা এই–দশ পাউন্ড পুরস্কার। গত তেইশে মে পররাষ্ট্র দপ্তরের সামনে অথবা

কাছাকাছি রাত দশটা পনেরো মিনিট নাগাদ একজন যাত্রীকে যে ঘোড়ার গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তার নম্বর চাই। ২২১বি, বেকার স্ট্রিটে জবাব পাঠান।

তার মানে তোমার বিশ্বাস চোর ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল?

নইলে লিনোলিয়ামে বৃষ্টিতে ভেজা জুতোর ছাপ পড়ত–কাদামাটির দাগ থাকত। বৃষ্টিঝরা রাতে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল বলেই সে-ছাপ পড়েনি।

তাও তো বটে।

আমি কিন্তু ধাঁধায় পড়েছি ঘণ্টা রহস্য নিয়ে। চোর কেন ঘণ্টা বাজাল? নাকি, চুরিতে বাধা দেওয়ার জন্যে কেউ বাজিয়েছিল? এমনও হতে পারে—

বলেছ চুপ মেরে গেল বন্ধুবর। বুঝলাম, নতুন সম্ভাবনা মাথায় উঁকি দিয়েছে।

যাই হোক, লন্ডন পৌঁছে হোটেলে খানাপিনা করে সোজা গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। হোমস ডিটেকটিভ ফোর্বসকে আগেই খবর দিয়েছিল। খর্বকায় ধূর্ত চেহারার তীক্ষ্ণ-প্রকৃতি কাঠখোট্টা মানুষটা হোমসকে দেখেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। তিরিক্ষে গলায় বললে, দেখুন মশায়, আপনি লোকটা সুবিধের নন। পুলিশের কাছ থেকে খবর-টবর বার করে নিয়ে মামলা সমাধান করে পুলিশের ঘাড়েই বদনামটা চাপান।

ঠিক উলটো বললেন, সবিনয়ে বললে হোমস, গত তিপ্পান্নটা মামলায় নাম কিনেছেন পুলিশ–মাত্র চারটে মামলায় লোকে জেনেছে এই অধমের কীর্তি। সব খবর রাখেন না আপনার বয়স আর অভিজ্ঞতা কম বলে। কিন্তু ঝগড়া না-করে যদি হাত মেলান আপনার কর্তব্যটা ভালোভাবেই করতে পারবেন বলে আশা করি।

তৎক্ষণাৎ সুর পালটে ফোর্বস বললে, কিছুই তো বুঝছি না। দু-একটা পয়েন্ট যদি ধরিয়ে দেন তো সুবিধে হয়।

কদ্দূর এগিয়েছেন আগে বলুন।

কিছুই এগোইনি। দারোয়ানকে নিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তার চরিত্র ভালো। ওর বউটা মদ খায়। সন্দেহ তাকেই। তাই মেয়ে-পুলিশ লাগিয়েছিলাম মদের ঘোরে পেট থেকে কথা বার করানোর জন্যে। কিন্তু লাভ হয়নি। বাড়িতে যে-দালালরা হানা দিত তাদের টাকাও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টাকাটা এল কোত্থেকে?

দারোয়ানের পেনশনের পাওনা টাকা থেকে।

মি, ফেল্পস কফির জন্যে ঘণ্টা বাজালেন। কিন্তু ঘরে ঢুকল দারোয়ানের স্ত্রী। কেন?

স্বামী দেবতা নাকি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে বিরক্ত করতে চায়নি।

চেয়ারে বসে দারোয়ানের ঘুমটাই অবশ্য তার প্রমাণ। স্বামী স্ত্রী কারোর বিরুদ্ধেই দেখছি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না স্ত্রীর সন্দেহজনক চরিত্রটা ছাড়া! হন্তদন্ত হয়ে ওই রাতে বাড়ি ফেরার কারণটা জিজ্ঞেস করেছিলেন? পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত লক্ষ করেছিল ওর তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরা? কেন?

অন্যদিনের চেয়ে বেশি দেরি করে ফেলেছিল বলে।

সে বেরিয়ে যাওয়ার অন্ততপক্ষে মিনিট কুড়ি পরে আপনি পুলিশ ডিটেকটিভকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন অথচ বাড়ি পৌঁছেছিলেন তার আগে। ব্যাপারটা বলেছিলেন তাকে?

ও বললে, এক ঘোড়ায় টানা এক্কাগাড়ি বাসের চাইতে আগেই তো পৌঁছোবে। বাড়ি পৌঁছেই বাড়িতে লোক আছে শুনে রান্নাঘরে ভো দৌড় দিল কেন?

দালালদের পাওনা মেটানোর টাকা নাকি রান্নাঘরেই ছিল।

সব প্রশ্নেরই জবাব দেখছি তৈরি। পাশের গলি চার্লস স্ট্রিটে বেরিয়ে কাউকে দেখেছিল কি?

কনস্টেবল ছাড়া কাউকে নয়।

এ ছাড়া আর কী করেছেন?

কেরানি গেরোর পেছনে এই ন-টা সপ্তাহ হাল্লাক করে ঘুরে লাভ হয়েছে কত্তা।

ঘণ্টা বাজার রহস্য উদ্ধার করেছেন?

একদম না। কারণটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল হোমস। সোজা গেল ডাউনিং স্ট্রিটে ইংলন্ডের আগামী প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে ক্যাবিনেট মন্ত্রী লর্ড হোল্ডহাস্টের অফিসে। হোমস কার্ড পাঠাল। তলব এল তৎক্ষণাৎ। ফায়ার প্লেসের দু-ধারে দুটো চেয়ারে বসলাম আমি আর হোমস। মাঝখানে অভিজাত চেহারা নিয়ে ভাবনা-আঁকা মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বিখ্যাত পুরুষটি। কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে, দীর্ঘ আকৃতির প্রতিটি প্রত্যঙ্গে শান দেওয়া তীক্ষ্ণতা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বনেদিয়ানা যে তার রক্তে–ধার করা নয়–তা এক নজরেই মালুম হয়।

মৃদু হেসে বললেন, মি. হোমস আপনার সুনাম আমি শুনেছি। আপনার এখানে আসার একটা কারণই আমার অফিসে ঘটেছে। কে কাজে লাগিয়েছে আপনাকে?

মি. পার্সি ফেল্পস। বললে হোমস।

বেচারা ভাগনে। রক্তের সম্পর্ক আছে বলেই ওকে বাঁচানো যাবে না।

আর যদি ডকুমেন্ট উদ্ধার হয়?

তাহলে ফলাফল শুভ হবে।

দলিলটা নকল করার কথা কি এই ঘরে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

বাইরে থেকে কেউ শুনেছিল কি?

অসম্ভব।

কাউকে জানিয়েছিলেন কি যে দলিল নকল করতে যাচ্ছেন?

না।

তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হয় চোর কিছুই না-জেনে হঠাৎ ঘরে ঢুকে দলিলটা দেখতে পেয়ে পকেটে করে নিয়ে গেছে।

আমি এর জবাব দিতে অক্ষম।

সন্ধিপত্রের বিষয়বস্তু ফাঁস হয়ে গেলে কি সত্যিই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে?

মুখ কালো হয়ে গেল লর্ড হোল্ডহার্স্টের, তা হবে।

সে-রকম প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছে কি?

এখনও টের পাইনি।

সন্ধিপত্র ফরাসি বা রুশ দূতাবাসে পৌঁছে গেলে টের পেতেন কি?

পেতাম।

আড়াই মাসেও যখন পাননি, তখন কি ধরে নিতে পারি না যে সন্ধিপত্র কোনো দূতাবাসেই পৌঁছোয়নি?

চোর কি তাহলে দলিলটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবে বলে নিয়েছে?

বেশি দামের তালে আছে হয়তো।

আর দেরি করলে এক পয়সাও পাবে না। মাস কয়েকের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু সবাইকে জানানো হবে।

পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। চোর হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়—

চোখ জ্বলে উঠল লর্ড মশায়ের, ব্রেন-ফিভার, কেমন?

শান্ত কণ্ঠে হোমস বলে, সে-রকম ইঙ্গিত আমি করিনি। যাক গে, অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। এখন আসি।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে লর্ড হোল্ডহার্স্ট বললেন, মি. হোমস, চোর যেই হোক না কেন, আমি চাই তাকে আপনি পাকড়াও করুন।

বাইরে এসে হোমস বললে, ভদ্রলোক খাসা লোক, গরিব হলেও আত্মমর্যাদা সচেতন। বুটে নতুন সুখতলা লাগিয়েছেন দেখেছিলে? যাক ভায়া, তোমাকে আর আটকে রাখব না। কালকে একই ট্রেনে আবার ওকিং যেতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।

পরদিন সকালে দেখা করলাম বন্ধুবরের সঙ্গে। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নির্বিকার হয়ে রইল হোমস। ইচ্ছে করলেই এ-রকমভাবে মুখটা ভাবলেশহীন করতে পারে ও।

শুধু শুনলাম, যে-তিমিরে ছিল গতকাল, আজও রয়েছে সেই তিমিরে। গাড়ির নম্বর চেয়ে বিজ্ঞাপনের জবাব আসেনি।

ওকিং পৌঁছে দেখলাম গতকালের মতোই প্রণয়িনীকে পাশে নিয়ে বসে আছে পার্সি। তবে চেহারা অনেকটা সতেজ।

আমাদের দেখেই অভ্যর্থনা জানাল সোল্লাসে। মি. ফোর্বস আর লর্ড হোল্ডহাস্টের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেছে এবং ভেঙে পড়ার মতো কিছুই ঘটেনি এখনও হোমসের মুখে এই খবর শুনে খুশি হলেন মিস হ্যারিসন।

ফেল্পস বললে, এর চাইতে জোরালো খবর আপনাকে দেবার জন্যে বসে রয়েছি।

উৎসুক হোমস।

ফেল্পস বললে, একটা নারকীয় ষড়যন্ত্র চলছে আমাকে ঘিরে। কাল রাতের সাংঘাতিক ঘটনাটাই তার প্রমাণ। আমি অজাতশত্রু, অথচ শুধু আমার সম্মান নয়, আমার জীবন নিয়েও টানাটানি চলছে।

খুলে বলুন।

আড়াই মাস পর এই প্রথম গতকাল রাতে একা শুয়েছিলাম ঘরে। নার্স রাখিনি, অনেকটা সুস্থ বোধ করছিলাম বলে। অল্প আলো জ্বলছিল ঘরে। রাত দুটোর সময়ে খুটখাট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক যেন ইঁদুরে খুটুর খুটুর করে গর্ত খুঁড়ছে। একটু একটু করে আওয়াজটা বেড়েই চলল। তারপর ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির চড়া আওয়াজ পেলাম। পর পর দুটো আওয়াজ। ঠিক যেন কাচের শার্সির পাল্লার ফাঁকে সরু মতো কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েই টেনে বার করে নেওয়া হল।

তারপর দশ মিনিট চুপচাপ কোনো শব্দ নেই। লোকটা বোধ হয় খুলতে লাগল জানলার পাল্লা। আমার দুর্বল স্নায়ু আর সইতে পারল না। লাফ দিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললাম পাল্লা দুটো। চকিতের জন্যে দেখলাম গোবরাটের নীচে গুটি মেরে বসে একটা লোক–আলখাল্লায় ঢাকা মুখের নীচের অংশ। এর বেশি আর দেখতে পেলাম না বিদ্যুতের মতো লাফ দিয়ে উধাও হল সে। আমার এই দুর্বল শরীর নিয়ে পেছন নেওয়া সম্ভব নয় বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ি মাথায় করলাম। সবার আগে ছুটে এল জোসেফ। তারপর সবাই মিলে দেখল, জানলার ঠিক নীচেই পায়ের ছাপ আছে বটে, কিন্তু দিনটা শুকনো থাকার ফলে সে-ছাপ কোনদিকে গেছে–তা ধরা যাচ্ছে না। তবে বাগানের বেড়া এক জায়গায় ভেঙে গেছে খুব সম্ভব টপকে পালানোর সময়ে ভেঙে পেরিয়ে গেছে। পুলিশকে এখনও কিছু বলিনি। ভাবলাম আপনার মতামত আগে শোনা যাক।

মক্কেলের এই কাহিনি অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল শার্লক হোমসের ওপর। বসে থাকতে পারল না চেয়ারে। পায়চারি করতে লাগল ঘরময়।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বলল, চলুন মি. ফেল্পস, আপনাকে নিয়ে বাড়িটা একপাক ঘুরে আসি।

নিশ্চয়। জোসেফও চলুক সঙ্গে, বলল পার্সি।

আমি যাব, বায়না ধরলেন মিস হ্যারিসন।

বাধা দিল হোমস, না। আপনি চেয়ার ছেড়ে নড়বেন না।

অপ্রসন্ন হলেন মিস হ্যারিসন। চেয়ারে বসে রইলেন। সঙ্গে এলেন তার দাদা জোসেফ হ্যারিসন। চারজনে মিলে লন পেরিয়ে গেলাম পার্সির জানলার তলায়। মাটিতে সত্যিই পায়ের ছাপ রয়েছে কিন্তু তা এতই আবছা যে কিছু বোঝা যায় না।

হতাশ হয়ে হোমস বললে, এত ঘর থাকতে চোরের এই ঘরটাই-বা পছন্দ হল কেন বুঝছি না। বসবার ঘর বা খাবার ঘরে ঢুকলেই তো পোয়াবারো ছিল।

রাস্তার দিক থেকে এই জানলাটাই আগে চোখে পড়ে, বললেন জোসেফ হ্যারিসন।

বেশ তো, তাহলে এই দরজাটা দিয়ে এলেই তো হত। কীসের দরজা এটা?

বাইরের কিছু লোক বেসাতি করতে এলে এই দরজা দিয়ে আসে। রাত্তিরে তালা ঝোলে।

আগে কখনো চোর পড়েছিল এ-বাড়িতে?

কক্ষনো না।

সিঁধ দিয়ে লাভ হতে পারে, এমনি কিছু কি আছে বাড়িতে?

সে-রকম মূল্যবান তো কিছু নেই।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পকেটে হাত পুরে এদিক-ওদিক দেখল হোমস–এ-রকম গা-ঢালা ভাব কিন্তু ওর মধ্যে এর আগে কখনো দেখিনি।

একবার বললে, বেড়া ভেঙে চোর পালিয়েছে শুনছিলাম। কোনখানটা?

পার্সি দেখালে জায়গাটা। ভাঙা টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হোমস বললে, মনে হয় না কাল রাতে এখান দিয়ে কেউ গেছে। কেননা, টুকরোটা পুরোনো। চলুন, আর কিছু দেখবার নেই।

ভাবী শ্যালকের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলল পার্সি। হোমস লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল অনেক আগেই পেছনে আমি!

খোলা জানলার ধারে গিয়ে মিস হ্যারিসনকে ডেকে সিরিয়াস গলায় হোমস বললে, আজ সারাদিন এ-ঘরে থাকবেন–একদম বেরোবেন না কোনো অজুহাতেই নয়। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

অবাক হয়ে গেলেন মিস হ্যারিসন, বেশ, তাই হবে।

কথা দিন রাতে শোবার আগে দরজায় তালা দিয়ে নিজের কাছে চাবি রাখবেন।

পার্সি কোথায় থাকবে তাহলে?

উনি আমার সঙ্গে লন্ডনে যাবেন।

আমি একা থাকব এখানে?

তাঁর ভালোর জন্যেই থাকবেন। কথা দিন–তাড়াতাড়ি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিস হ্যারিসন। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে পেছনে শোনা গেল জোসেফ হ্যারিসনের গলা, হাঁ করে কী বসে আছিস ওখানে? আয়, রোদে এক চক্কর দিয়ে যা।

না, দাদা। বড্ড মাথা ধরেছে।

হোমস বললে, মি. ফেল্পস, সিঁধেল চোরের চেয়ে বড়ো হল দলিল চোর। আমার সঙ্গে আপনি লন্ডনে এলে চোর ধরতে সুবিধে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন।

রাতটা?

শহরেই কাটাবেন।

ছুরি হাতে রাতের কুটুম যদি আবার আসে, হতাশ হবে আমাকে না-দেখলে। জোসেফ যাবে তো আমার দেখাশোনা করতে?

তার কী দরকার? ওয়াটসন, ডাক্তার মানুষ, আপনার ভালোমন্দ ওর ওপর ছেড়ে দিন।

দুপুরে লাঞ্চ খেলাম খাবার ঘরে। মিস হ্যারিসন অক্ষরে অক্ষরে তামিল করলেন হোমসের নির্দেশ। পার্সির শোবার ঘরে বসে রইলেন–একসঙ্গে খেতেও এলেন না। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার জন্যেই তোক কি ঘটনাপ্রবাহ তরতরিয়ে নতুন খাতে বয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক, আনন্দে আটখানা হয়ে খাবার ঘরে একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খেল পার্সি। আমি কিন্তু হোমসের আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারলাম না। কী চায় ও? পার্সিকে মিস হ্যারিসনের কাছ থেকে তফাতে রাখাই কি ওর আসল মতলব?

চমক সৃষ্টিতে জুড়ি নেই শার্লক হোমসের। স্টেশনে গেলাম তিনজনে–কিন্তু আমাকে আর পার্সিকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর আচমকা হোমস বললে, তার নাকি এখন লন্ডনে গেলে

চলবে না। ওকিংয়ে এখনও কিছু কাজ বাকি। কাল সকালে বেকার স্ট্রিটে ব্রেকফাস্টের টেবিলে ফের দেখা হবে।

পার্সি তো হতভম্ব। ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বললে, বাড়িতে খবর দিয়ে দেবেন–কাল রাতে ফিরব। প্রসন্ন কণ্ঠে হোমস পালটা চিৎকার জানিয়ে দিলে, বাড়িতে সে যাচ্ছে না।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল ট্রেন। হোমসের অকস্মাৎ থেকে যাওয়া নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করলাম দুই বন্ধু।

ফেল্পস বললে, কাল রাতের চোরকে নিয়ে নিশ্চয় তদন্ত করতে চান মি. হোমস। লোকটাকে। মামুলি চোর বলতে আমি অন্তত রাজি নই।

তবে কী?

রাজনৈতিক খুনে। ঘোর চক্রান্ত চলছে আমাকে ঘিরে। ছুরি হাতে এসেছিল আমাকে খুন করতে। চোর কখনো ছোরা নিয়ে আসে? যে-ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই, সে-ঘরে কেন আসতে চেয়েছিল বুঝতে পারছ না?

সেটা যে ছুরি, বুঝেছ কী করে? সিঁধকাঠিও তো হতে পারে।

না, না, না। স্পষ্ট দেখেছি চকচকে ফলাটা ঝকঝক করছে।

তুমি যা বললে, হোমস যদি তাই মনে করে থাকে, তাহলে ওর ওকিংয়ে থেকে যাওয়ার কারণটা অন্তত বোঝা যায়। সিধেল চোরকে পাকড়াও করে ও হয়তো দলিল চুরির ফয়সালা করতে চায়।

কিন্তু উনি তো বললেন বাড়িতে যাবেন না।

হোমসকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। অকারণে কিছু করা ওর ধাতে নেই।

ট্রেনে এ-প্রসঙ্গে আর কথা হল না। সাত পাঁচ কথায় ভুলিয়ে রাখলাম পার্সিকে। একে অসুস্থ, তার ওপর দলিল হারানোর উদবেগ। তাই হাজার গল্পের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চাইলাম ওর মনের উৎকণ্ঠা, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। কিন্তু মন বড়ো বিচিত্র বস্তু। বাগে আনা মুশকিল। পার্সি বেচারাও দেখলাম কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। বেকার স্ট্রিটে এসেও সেই একই কথায় ফিরে এল বার বার। হোমস কি পারবে দলিল উদ্ধার করতে? কেন সে চুপচাপ রয়েছে? রহস্য সমাধান অসম্ভব জেনেই কি নীরব?

আমি ওকে পইপই করে বোঝালাম, শার্লক হোমস যখনই মুখে চাবি দেয়, তখনই বরং বুঝতে হবে লক্ষণ শুভ–রহস্য সমাধান হতে আর দেরি নেই। সমাধানের সংকেত যে পেয়ে গেছে, বাজিয়ে না-দেখা পর্যন্ত চুপ করে থাকতে চাইছে।

যাই হোক, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তো শুতে পাঠালাম ওকে কিন্তু মনে বুঝলাম এত উদবেগ নিয়ে কখনোই ঘুমোতে পারবে না। আমিও কি ছাই ঘুমোতে পারলাম? আদ্ধেক রাত কেবল এপাশ-ওপাশ করেই কাটিয়ে দিলাম। দুম করে হোমস ওকিং থেকে গেল কেন? কেন সে কথাটা পার্সির পরিবারের কাউকে বলল না? কেন পার্সিকে তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে সরিয়ে আনল? কেন ভদ্রমহিলাকে সারাদিন পার্সির ঘরে বসে থাকতে বলল? এক-একটা কেন এক-একটা দুরমুশের মতো মাথার মধ্যে পিটুনি আরম্ভ করলে কি ঘুম হয়?

সক্কালবেলা পার্সির ঘরে গিয়ে দেখি তারও এক অবস্থা। চেহারা আধখানা–অনিদ্রায় মুখ আমসি।

ওর প্রথম প্রশ্নই হল, মি. হোমস ফিরেছেন?

ফিরবে, ফিরবে, হোমসের কথার নড়চড় হয় না।

হলও না। ঘড়িতে আটটা বাজার একটু পরেই এক ঘোড়ায় টানা একটা এক্কাবাড়ি এসে দাঁড়াল সদর দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নামল শার্লক হোমস। জানলা থেকে দেখলাম বাঁ-হাতে বিরাট ব্যান্ডেজ। মুখ শুকনো আর গম্ভীর।

ফেল্পস বললে, হেরে এলেন মনে হচ্ছে।

সত্যি সত্যিই পরাজয়ের চিহ্ন প্রকট হয়েছে শার্লক হোমসের চেহারার মধ্যে।

বললাম, গোলকধাঁধার চাবিকাঠি তাহলে ওকিংয়ে নেই–লন্ডনে রয়েছে।

কিন্তু হাতে ব্যান্ডেজ কেন? ফেল্পস যেন ককিয়ে উঠল।

হোমস ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম, হোমস, জখম হয়েছ মনে হচ্ছে?

সামান্যই দোষটা আমার। হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। গুড মর্নিং মি. ফেল্পস। আপনার এই কেসের মতো জটপাকানো মামলা খুব বেশি হাতে আসেনি আমার।

জট ছাড়ানো শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। তাই না?

অভিজ্ঞতাটাই-বা কম কী।

আমি বললাম, ব্যান্ডেজটা কীসের? রোমাঞ্চকর কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে?

আগে খাওয়া, তারপর কথা। তিরিশ মাইল টাটকা হাওয়া খেতে খেতে এসেছি–পেটে আগুন জ্বলছে। গাড়ির নম্বর চেয়ে বিজ্ঞাপনের আর জবাব এল না দেখছি। যাকগে, সব চেষ্টাই কি আর ফলপ্রসূ হয়।

খাবার আনার জন্যে ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে চা আর কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস হাডসন। মিনিট কয়েক পরে নিয়ে এল ঢাকনা দেওয়া খাবারের ডিশ, রাখল টেবিলে। আমরা বসলাম টেবিলের ধারে। হোমস চনমনে খিদে নিয়ে ঝলমলে, আমি উৎসুক, ফেল্পস ম্রিয়মাণ।

চিকেন-কারির ঢাকনা খুলতে খুলতে হোমস বললে, মিসেস হাডসন রাঁধেন খাসা। ওয়াটসন, তুমি কী নিলে?

ডিম আর শূকর মাংস।

অপূর্ব! মি. ফেল্পস, আপনি? কী নেবেন? মুরগি না ডিম?

ধন্যবাদ। আমার খিদে নেই।

আরে মশাই, এই পদটা একটু চেখেই দেখুন না।

ধন্যবাদ। খেতে রুচি নেই।

দুষ্টুমি নৃত্য করে উঠল হোমসের হীরক উজ্জ্বল দুই চোখে।

বলল, বেশ, বেশ। তাহলে আমাকে বাড়িয়ে দিন প্লেটটা।

ঢাকা খুলে প্লেটটা বাড়াতে গিয়ে থ হয়ে গেল পার্সি। ধবধবে সাদা প্লেটের মতোই সাদা মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল প্লেটের ঠিক মাঝখানে নীলাভ-ধূসর রঙের পাকানো কাগজটার দিকে। পরক্ষণেই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বিস্ফারিত দুই চোখ দিয়ে যেন গিলে নিল কাগজের চেহারাটা। তারপরেই বিকট চেঁচিয়ে উঠে চেয়ার থেকে ছিটকে গিয়ে মাথার ওপর কাগজ তুলে ধরে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াতে লাগল ঘরময়। সে কী তাণ্ডব নৃত্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ শরীরে বেদম হয়ে পড়ল অকস্মাৎ উত্তেজনার বিস্ফোরণে। আমরা ধরাধরি করে ওকে টেনে বসিয়ে দিলাম সোফায়–গলায় ঢেলে দিলাম ব্র্যান্ডি।

কাঁধ চাপড়ে হোমস বললে, আস্তে! আস্তে! আপনাকে চমকে দেওয়াটা নিশ্চয় ঠিক হয়নি। তবে ওয়াটসন জানে, নাটক দেখানোর লোভ আমি সামলাতে পারি না।

হোমসের হাত জড়িয়ে ধরে চুমু-টুমু খেয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল ফেল্পস, ভগবান আপনার ভালো করবেন। আমার মান রাখলেন আপনি।

সেইসঙ্গে আমার নিজেরটাও রাখলাম। দায়িত্বপূর্ণ কাজে আপনার গাফিলতির মতোই গুরুত্বপূর্ণ জানবেন রহস্য সমাধানের ব্যাপারে আমার ব্যর্থতা।

কোটের সবচেয়ে ভেতরের পকেটে দলিলটা গুঁজে রাখতে রাখতে ফেল্পস বললে, কিন্তু পেলেন কী করে?

হোমস তখন মাংস, ডিম, কফি খেয়ে নিয়ে আড় হয়ে বসে পাইপ ধরিয়ে যা বললে তা এই :

আপনারা তো চলে গেলেন, আমি ফ্লাস্কে চা আর পকেটে স্যান্ডউইচ নিয়ে সন্ধে নাগাদ গিয়ে দাঁড়ালাম আপনার বাড়ির পাশের রাস্তায়।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে-না-যাওয়া পর্যন্ত সবুর করলাম। তারপর বেড়া টপকে ঢুকলাম বাগানে। ফটক দিয়ে এলাম না পাছে কেউ দেখে ফেলে। গাছের আড়ালে গা ঢেকে পৌঁছোলাম আপনার জানলার সামনে রডোডেনড্রন ঝোঁপের মধ্যে। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়েছে বলে প্যান্টের হাঁটুর এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

জানলা খোলা–খড়খড়ি তোলা। দেখলাম টেবিলে বসে বই পড়ছেন মিস হ্যারিসন। রাত সাড়ে দশটায় উঠে পড়লেন। দরজায় চাবি দিয়ে শুতে গেলেন।

দরজায় চাবি দিল কেন? ফেল্পসের প্রশ্ন।

আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম বলে। আরে মশাই, আপনার পকেটের ওই কাগজটা কোনো কালেই আপনার পকেটে ফিরে আসত না তার সাহায্য না-পেলে। যাক, বসে রইলাম তো রইলামই। পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজতে লাগল দূরের গির্জেতে। দুটো নাগাদ

খিল খোলার আর চাবি ঘোরানোর ক্যাঁচ ক্যাচ শব্দ কানে এল। চাকরদের যাতায়াতের দরজা খুলে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়ালেন মি. জোসেফ হ্যারিসন।

জোসেফ! যেন দম আটকে এল ফেল্পসের।

মাথায় টুপি নেই, কালো আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা মুখের নীচের অংশ যাতে হঠাৎ দেখলে চেনা না-যায়। দেওয়ালের ছায়া গা ঢেকে পা টিপে টিপে আপনার জানলার সামনে গিয়ে একটা লম্বা ছোরা বার করে ঢুকিয়ে দিলেন খড়খড়ির পাল্লায় ফাঁকে। চাড় মারতেই সরে গেল ছিটকিনি খুলে গেল পাল্লা।

খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম, শামাদানে মোমবাতি জ্বেলে দরজার কাছের কার্পেটের খানিকটা তুলে ফেললেন মি. হ্যারিসন। পাইপ মিস্ত্রি গ্যাসপাইপের জোড় ঢাকবার জন্যে কাঠের ব্লক চাপা দেয়। ঠিক সেইরকম একটা চৌকোনা কাঠ তুললেন কার্পেটের তলা থেকে। নীচের রান্নাঘরে গ্যাসের চালান যায় যে T জয়েন্টের মধ্যে দিয়ে, কাঠের টুকরো দিয়ে ঢাকা ছিল সেই জয়েন্টটা। পাকানো কাগজটা খুপরি থেকে তুলে নিয়ে ফের কাঠ-চাপা দিয়ে কার্পেট টেনে দিলেন মি. হ্যারিসন। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে জানলা গলে এসে পড়লেন আমার দু-বাহুর মধ্যে স্বাগতম জানানোর জন্যে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।

কিন্তু জোসেফ লোকটা যে এতটা খারাপ হবে ভাবতে পারিনি। সাংঘাতিক বদমাশ। ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।দু-বার আছড়ে ফেললাম ঘাসের ওপর আমার

আঙুলের গাঁট কেটে গেল ছোরার ঘায়ে–তারপর ঘুসি মেরে একটা চোখ প্রায় কানা করে দেওয়ার পর মক্কেল বুঝল এ বড়ো শক্ত ঠাঁই। তাতেও কি হার মানে। একটা চোখেই দেখলাম খুনির চেহারা পারলে তখনই খুন করে দেয় আমাকে। যাই হোক, বেগতিক বুঝে দলিলটা আমার হাতে দিতে আমিও ছেড়ে দিলাম। অবশ্য আজ সকালে ফোর্বসকে টেলিগ্রামে সব জানিয়েছি। যদি তাড়াতাড়ি যেতে পারে, পাবে জোসেফকে। নইল দেখবে পিঞ্জর শূন্য–পাখি ভাগলবা। তাতে অবশ্য সরকারের লাভ।এ-নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হোক, আপনারা মামা-ভাগনে নিশ্চয় তা চান না।

ফেল্পস খাবি খেতে খেতে বললে, আপনি বলছেন কী? আড়াই মাস যে দলিলের চিন্তায় শয্যাশায়ী, একই ঘরে তা পড়েছিল অ্যাদ্দিন?

হ্যাঁ।

জোসেফ! শেষকালে জোসেফ! চোর, বদমাশ, শয়তান!

চেহারা দেখে কি মানুষ ধরা যায়? জোসেফের বাইরে এক, ভেতরে আর এক। কালকে রাতেই শুনলাম জুয়ো খেলে দেনায় ডুবতে বসেছে। তাই বোনের সর্বনাশ হবে জেনেও এক ঝকমারির মধ্যে নাক গলিয়েছে। স্বার্থ ছাড়া তার কাছে কিছুই বড়ো নয়।

চেয়ারে এলিয়ে পড়ল ফেল্পস, আমার মাথা ঘুরছে! সব গুলিয়ে দিলেন আপনি।

হোমস তখন বিশ্লেষণী ভঙ্গিমায় বললে, কেসটায় গোড়া থেকেই মূল সূত্রগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছিল অবান্তর সূত্রের বাড়াবাড়িতে। আমি বাজে সূত্র বাদ দিলাম, কাজের সূত্রগুলোকে পর-পর সাজালাম। জোসেফকে সন্দেহ করলাম প্রথম থেকেই কেননা তার সঙ্গেই আপনার এক ট্রেনে ওকিং ফেরার কথা হয়েছিল। সেই রাতে খুবই স্বাভাবিক আপনাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরে সে গেছিল, আপনার অফিস সে চেনে। বিনা নোটিশে তাকে ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে আপনার ওই অবস্থার জন্যে। তারপর যখন শুনলাম, প্রথম যে-রাতে নার্স রইল না ঘরে, সেই রাতেই চোর ঢুকতে চেয়েছিল সেই ঘরেই–তখনই বুঝলাম চোর মহাপ্রভু বাড়ির কেউ হবে কেননা সব খবর সে রাখে।

ইস। কী অন্ধ আমি!

ব্যাপারটা কী হয়েছিল শুনুন। আপনি যখন দারোয়ানের কাছে কফির তাগাদা দিতে ঘরের বাইরে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে পাশের গলি চার্লস স্ট্রিট দিয়ে অভ্যেসমতো আপনার অফিসে ঢুকেছিল জোসেফ হ্যারিসন আপনাকে নিয়ে স্টেশনে যাবে বলে। ঘরে ঢুকেই আপনাকে না-দেখে ঘণ্টা বাজিয়েছে–পরমুহূর্তেই চোখ পড়েছে টেবিলের ওপর মহামূল্যবান দলিলটার ওপর। পাক্কা বদমাশ হলেও পলকের মধ্যে বুঝতে পেরেছে এ-জিনিস হাতাতে পারলে লাভ বিস্তর। তাই নকল দলিল ফেলে আসলটা পকেটে নিয়ে তরতরিয়ে নেমে গিয়েছে ছোটো সিঁড়ি দিয়ে চার্লস স্ট্রিটে। দারোয়ান যখন অবাক হয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কে ঘণ্টা বাজাল, তার মধ্যেই ঘটে গেছে এতগুলো ঘটনা।

ট্রেনে ওকিং ফিরে এল জোসেফ। দলিল পরীক্ষা করে বুঝলে দু-একদিনের মধ্যে কোনো দূতাবাসে পাচার করতে পারলে দু-পয়সা পকেটে আসবে। তাই লুকিয়ে রাখল নিজের ঘরের কার্পেটের তলায়। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। রাত্রে উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন আপনি ওরই ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল আপনার, দলিলটা সেই থেকে সরানোর সময় সে পায়নি ঘরে অষ্টপ্রহর লোক থাকায়। নার্স না-থাকায় প্রথম সুযোগেই এল দলিল সরাতে। কিন্তু আপনি জেগে থাকায় তাও হল না। সে-রাতে নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খাননি?

না।

জোসেফ কিন্তু ভেবেছিল আপনি খেয়েছেন এবং ঘুমোচ্ছেন। তাই ঠিক করলাম ওকে আর একটা সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু যাতে সন্দেহ না হয়, তাই সারাদিন মিস হ্যারিসনকে দিয়ে পাহারা দেওয়ালাম। দলিল ওই ঘরেই আছে আঁচ করেছিলাম, কিন্তু কোথায় আছে জানতাম না। সব লাটঘাট করার চেয়ে ওকে দিয়েই খুঁজে বার করতে চেয়েছিলাম। আর কিছু জানবার থাকলে বলুন।

কিন্তু অত ঝামেলা করে জানলা খোলার চেষ্টা না-করে দরজা দিয়ে এলেই তো হত? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সাতজনের শোবার ঘর পেরিয়ে তবে দরজার সামনে পৌঁছোতে হত। খামোখা ঝুঁকি না-নিয়ে লন পেরিয়ে জানলায় গিয়েছিল সেই কারণেই।

ছোরা নিয়েছিল কেন? মানুষ খুনের জন্যে নিশ্চয় নয়। জানলা খোলার জন্যে, তাই না? উৎসুক কণ্ঠে শুধোয় পার্সি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, হলেও হতে পারে। তবে জোসেফ হ্যারিসনের হৃদয় যে খুব একটা দরাজ নয়–আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

——————

টীকা

নিখোঁজ নৌ-সন্ধিপত্র : দ্য নেভাল ট্রিটি স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯৩-এর অক্টোবর এবং নভেম্বর সংখ্যায়, দুই কিস্তিতে। নিউইয়র্কের হাপার্স উইকলিতেও প্রকাশিত হয় দুই কিস্তিতে ১৪ এবং ২১ অক্টোবর ১৮৯৩ সংখ্যায়।

বুনসেন বার্নার : জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট বুনসেন প্রবর্তিত যন্ত্র। প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝড়ো পেট্রোল পক্ষী : দ্য রেইগেট স্কোয়ারস গল্পে হোমস নিজের সম্পর্কে এই উপমা ব্যবহার করেছিলেন।

ওকিং : সারে কাউন্টির অন্তর্গত একটি লোকালয়। ব্রিটেনের প্রাচীনতম মসজিদটি এখানে অবস্থিত।

গোঁফখানা : ড. ওয়াটসনের গোঁফের উল্লেখ আরও পাওয়া যায় দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন এবং দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কল গল্পে।

ইংলন্ড আর ইতালির মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয়েছে : এই দুই দেশের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে।

তুমি এর কপি করবে নিজের হাতে : জেমস ওয়াট কপি-প্রেস তৈরি করেন ১৮৭০ সালে। তারপর একে একে নানা ধরনের লেটার কপিইং প্রেস, রোলার কপিয়ার, কপিইং বাথ প্রভৃতি তৈরি হতে শুরু হয়। দ্য নেভাল ট্রিটি-র ঘটনাকালে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তরে এই ধরনের কোনো যন্ত্র ছিল না–এ-কথা যথেষ্টই কষ্টকল্পিত।

ত্রিশক্তির মিত্রতা : ত্রিশক্তি হল ১৮৭৯-তে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গারি এবং ১৮৮২-তে তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ ইতালি। এই জোট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ ১৯১৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফরাসি ভাষায় লেখা : সেই সময়ের কূটনীতিতে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ফরাসি প্রচলিত থাকলেও ব্রিটেন এবং ইতালির মধ্যে চুক্তিতে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হওয়া কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।

একটা গির্জেতে : চার্লস স্ট্রিটে ফেল্পসের অফিসের কাছাকাছি সেন্ট মার্গারেট চার্চ এবং ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি অবস্থিত। এখানকার ঘড়ির ঘন্টার শব্দ ফেল্পস শুনে থাকবে।

একজন স্ত্রীলোক ছাড়া কেউ যায়নি : ফেল্পস কফি আনতে বলা থেকে এত দেরি পর্যন্ত দারোয়ানের বউ কী করছিল অফিসে?

কোল্ডস্ক্রিম গার্ডস : রিচার্ড ক্রমওয়েলের সরকারের পতনের পর জেনারেল জর্জ মঙ্ক-এর নেতৃত্বে লন্ডন শহরে প্রবেশ করে এই বাহিনি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এই বাহিনির সদস্যদের কোয়ালিস বলা হত।

সাতটা সূত্র : দ্য কপার বীচেস গল্পেও সাতটা সূত্র পেয়েছিলেন শার্লক হোমস। গবেষকরা সাত সংখ্যাটির প্রতি তার অহেতুক প্রীতি লক্ষ করেছেন এই দুটি বক্তব্যে।

নর্দাম্বারল্যান্ড : ইংলন্ডের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত ঠান্ডা এবং জংলা পরিবেশ-সংবলিত কাউন্টি।

রেড ইন্ডিয়ানদের মতো নির্বিকার : ইংলন্ডের অনেক তামাকের দোকানে রেড ইন্ডিয়ানদের কাঠের মূর্তি সাজানো থাকত। কিছু গবেষক মনে করেন, সেই ঋজু এবং নির্বিকার মূর্তিগুলির কথাই ড. ওয়াটসন বোঝাতে চেয়েছেন।

বিকলাঙ্গের বিচিত্র উপাখ্যান

[দ্য ক্রুকেড ম্যান]

আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। গরমকাল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গিয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পর পাইপ খেতে খেতে উপন্যাস পড়ছি। স্ত্রী শুতে চলে গেছে। চাকরবাকররাও বিদেয় নিয়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম দরজার।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে বারো মিনিট বাকি। এত রাতে রুগি ছাড়া আর কেউ আসে। মনটা খিঁচড়ে গেল। সারাদিন ধকলের পর রাতটুকুও কি জিরোতে পারব না?

কিন্তু কর্তব্য আরামের চাইতে বড়ো। তাই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস।

আমাকে দেখেই বলল সোল্লাসে, ঠিক জানতাম রাত হলেও তোমাকে পাওয়া যাবে।

কী সৌভাগ্য! ভেতরে এসো!

আইবুড়ো সময়ের অভ্যেস দেখছি এখনও ছাড়তে পারনি, আর্কেডিয়া মিক্সচার না হলে পাইপ খাওয়া হয় না। কোটের ছাইগুলোই অকাট্য প্রমাণ। আর মিলিটারি ধড়াচূড়াও

এখনও ছাড়তে পারনি, তাই আস্তিনে রুমাল গুঁজে রাখ এখনও। ভায়া, রাতটা থাকা যাবে এখানে?

স্বচ্ছন্দে।

টুপির আলনায় টুপি ঝুলছে না যখন পুরুষ-অতিথি বাড়িতে নেই।

হোমস, তুমি থাকলে আমি বর্তে যাব।

যাক, ঠাঁই তাহলে পাওয়া গেল। বাড়িতে মিস্ত্রি এসেছিল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, গ্যাস বিগড়েছিল। কার্পেটে বুটের ছাপ রেখে গেছে। এবার একটু পাইপ খাওয়া যাক।

মুখোমুখি বসে নীরবে ধূমপান করতে লাগল বন্ধুবর। আমিও কথা বললাম না। জরুরি দরকার না-থাকলে এত রাতে বাড়িতে হানা দেওয়ার পাত্র সে নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরতে হবে, একটু পরেই সব বলবে।

আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে, পসার খুব জমেছে দেখছি।

কী করে বুঝলে?

তোমার জুতো দেখে। দিব্যি ঝকঝক করছে। তার মানে খুব ঘোড়ার গাড়িতে চাপছ। আমি তো জানি, কাছাকাছি যেতে হলে হাঁটা পছন্দ কর–তুমি গাড়িতে চাপো না।

চমৎকার! প্রশংসামুখর হলাম আমি।

কিন্তু খুবই সামান্য ব্যাপার। নজরটা ঠিকমতো দিতে পারলে শ্রোতাকে এইভাবে বক্তার পক্ষে চমকে দেওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। আসল জিনিসটা চোখ এড়িয়ে গেলে এইরকমই হয়। ভায়া, একই কথা প্রযোজ্য তোমার ওই গল্পগুলোর ক্ষেত্রেও। নিজের কায়দায় লিখতে গিয়ে সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত কর পাঠককে। এই মুহূর্তে আমার হাতে এমনি একটা কেস এসেছে। বড়ো অদ্ভুত কেস-মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। এখনও খেই পাচ্ছি না কিন্তু পাবই, ওয়াটসন, অন্ধকারে আলো আমি দেখতে পাবই। বলতে বলতে দু-চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বন্ধুবরের, পাতলা গালে দেখা দিল রক্তিম আভা। মুহূর্তের জন্যে যেন একটা আবরণ উঠে গেল ওর সুতীব্র, সুতীক্ষ্ণ প্রকৃতির ওপর থেকে। কিন্তু তা পলকের জন্যেই। পরের মুহূর্তেই ফের দেখলাম রেড ইন্ডিয়ানদের মতো ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখচ্ছবি–মুখের এই বিচিত্র বিকারবিহীন ভাবের জন্যেই অনেকে ওকে একটা নিছক যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না।

ওয়াটসন, সমস্যাটা রীতিমতো ইন্টারেস্টিং–অত্যন্ত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ। ভেবেচিন্তে একটা সমাধান আঁচ করেছি। তোমাকে এর মধ্যে পেতে চাই।

সানন্দে যাব, হোমস।

কালকে অলডারশট যেতে হবে।

যাব।

ওয়াটারলু থেকে দশটা দশের গাড়ি?

ভালোই তো।

ঘুম পেয়েছে কি?

পেয়েছিল–এখন উড়ে গেছে।

তাহলে ঘটনাটা ছোটো করে বলছি, শোনো। অলডারশটে রয়্যাল ম্যালোজের প্রাক্তন কর্নেল বার্কলের খুন সম্পর্কে কিছু শুনেছ?

না।

রয়্যাল ম্যালোজ হল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সুবিখ্যাত আইরিশ রেজিমেন্ট। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আর সিপাই বিদ্রোহে এদের কৃতিত্ব ভোলবার নয়। জেমস বার্কলে গত সোমবার পর্যন্ত

কম্যান্ডার ছিলেন এই রেজিমেন্টের। ঢুকেছিলেন গাদা বন্দুক বইতে–ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছেন–সিপাই বিদ্রোহের পর অফিসার হয়ে যান–পরে রেজিমেন্টের সর্বময় কর্তা।

সার্জেন্ট থাকার সময়ে রেজিমেন্টের এক কৃষ্ণকায় সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি টিভয়কে উনি বিয়ে করেন। এসব বিয়ে সমাজ চট করে মেনে নেয় না।তাদেরও নেয়নি। পরে ঠিক হয়ে যায়।

মেয়েটা সুন্দরী তিরিশ বছর বিবাহিত জীবনের পরেও।

বিয়ে করে সুখী হয়েছিলেন কর্নেল বার্কলে। প্রাণ দিয়ে ভালাবাসতেন স্ত্রীকে। স্ত্রী-ও ভালোবাসতেন তাকে কিন্তু সে-ভালোবাসায় স্বামীর ভালোবাসার মতো আদিখ্যেতা ছিল না। কাজেই এ-রকম অপূর্ব জুটির এ-ধরনের পরিণতি কল্পনা করা যায় না।

কর্নেল বার্কলে এমনিতে ফুর্তিবাজ, কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ মুখ কালো করে বসে থাকতেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইচই করতে করতে আচমকা গুম হয়ে যেতেন। দিনকয়েক কাটত এইভাবে। মনে হত যেন ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছেন। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করেছেন।ওঁর অফিসার-বন্ধুদের কাছেই শুনেছি এই ব্যাপার।

অলডারশটের ক্যাম্পে বিবাহিত অফিসাররা বাইরে রাত কাটান। আট মাইল দূরে ল্যাচেন বলে একটা বাড়িতে দুজন ঝি আর একজন কোচোয়ান নিয়ে সস্ত্রীক থাকতেন কর্নেল। বাড়িটা খালি জমি ঘেরা, পশ্চিমদিকে তিরিশ গজ দূরে বড়োরাস্তা।

গত সোমবার রাত আটটায় গির্জেতে একটা মিটিংয়ে গিয়েছিলেন মিসেস বার্কলে। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। মিস মরিসন নামে একটি তরুণীর সঙ্গে মিটিংয়ে যান এবং সওয়া ন-টায় তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন।

রাস্তার দিকে কাচের দরজাওলা এটা ঘর আছে ল্যাচেনে। সকালের দিকে ঘরে বসা হয়, সন্ধের পর খালি থাকে। কাচের দরজায় পর্দা নেই। দরজার সামনে তিরিশ গজ লম্বা সবুজ ঘাস-ছাওয়া লন, তারপর রেলিং-দেওয়া পাঁচিলের পর রাস্তা। মিসেস বার্কলে এই ঘরে এসে এক কাপ চা আনতে বললেন ঝি-কে, অথচ ও সময়ে কখনো তিনি চা খান না। স্ত্রী ফিরেছে শুনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে হল ঘর পেরিয়ে এই ঘরে ঢোকেন কর্নেল বার্কলে, দেখেছে কোচোয়ান। তারপর আর তাকে জীবিত দেখা যায়নি।

দশ মিনিট পরে চা নিয়ে এসে ঝি দেখল দরজা ভেতর থেকে চাবিবন্ধ এবং অত্যন্ত চড়া গলায় গিন্নি ঝগড়া করছেন কর্তার সঙ্গে। কর্নেল বার্কলে এত আস্তে নরম গলায় জবাব দিচ্ছেন যে কথা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু গিন্নিমার কথাগুলো শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়ে সবাইকে ডেকে আনে সে। মিসেস বার্কলের প্রত্যেকটা কথায় আতীব্র ঘৃণা ঠিকরে পড়ছিল। স্বামীকে তিনি বার বার কাপুরুষ বলে গাল পাড়ছিলেন। তোমার সঙ্গে থাকতেও আমার গা রি-রি করছে! ফিরিয়ে দাও আমার জীবন! আর কি তা পাব? এখানে আর এক মুহূর্ত নয়! কাপুরুষ কোথাকার! কাপুরুষ! কাপুরুষ! আচমকা পুরুষকণ্ঠে শোনা গেল একটা আর্ত চিৎকার! দড়াম করে আছড়ে পড়ার আওয়াজ এবং নারীকণ্ঠে মুহুর্মুহু বুকফাটা হাহাকার। দরজা খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কোচোয়ান লনের

দিক থেকে একটা খোলা জানলা গলে ঢুকে পড়ে ভেতরে। দেখে, সোফায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে মিসেস বার্কলে। আর, চেয়ারের হাতলে দু-পা রেখে ফায়ার প্লেসের ঝাঝরির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে কর্নেল বার্কলে। প্রাণহীন। ঘরে রক্তগঙ্গা বইছে।

ভেতর থেকে দরজা খুলতে গিয়ে মুশকিলে পড়ল কোচোয়ান দরজার চাবি কোথাও পাওয়া গেল না। কাজেই জানলা গলে বাইরে এসে ডেকে আনল পুলিশ আর ডাক্তার। অজ্ঞান অবস্থায় মিসেস বার্কলেকে ঘরের বাইরে আনা হল। এ অবস্থায় সন্দেহটা তার ওপরেই পড়ে এবং তার ব্যতিক্রম হল না। দেখা গেল, মাথার পেছনে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা মারাত্মক চোট পেয়ে মারা গেছেন কর্নেল, একটা ভোতা ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে খুলিতে। অস্ত্রটাও পাওয়া গেল দেহের পাশে। অদ্ভুত হাতিয়ার। একটা নিরেট গদা, হাতলটা হাড় দিয়ে বাঁধানো। কাঠের ওপর অদ্ভুত সব খোদাইয়ের কাজ। দেশবিদেশে লড়াই করে নানারকম বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করে এনেছিলেন কর্নেল, এই গদাটিও হয়তো তারই সংগ্রহ, অথচ চাকরবাকরেরা এ-জিনিস এর আগে কখনো বাড়িতে দেখেনি। চাবিটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অলডারশট থেকে তালা-মিস্ত্রি আনিয়ে দরজা খুলতে হল।

গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই হল ঘটনাপ্রবাহ। কর্নেলের বন্ধু মেজর মর্ফি আমাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে গেলেন অলডারশটে পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে। যে ঝি-টা কাগিন্নির ঝগড়া বাইরে থেকে শুনেছিল, তাকে জেরা করতে গিয়ে একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম। গিন্নিমা নাকি রাগের মাথায় কর্তাকে ডেভিড বলেছিলেন বার কয়েক, অথচ কর্তার নাম জেমস। ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য। রহস্য সমাধানের প্রথম ধাপ এইটাই হওয়া উচিত।

আরও একটা ব্যাপারে তাক লেগে গেছে চাকরবাকর এবং পুলিশ মহলের। কর্নেলের মুখের পরতে পরতে প্রকট হয়েছে বিষম আতঙ্ক। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যেন ভূত দেখে চমকে উঠে সিঁটিয়ে গিয়েছেন। পুলিশের বিশ্বাস, প্রাণাধিকা স্ত্রী গদা দিয়ে তাকে মারছে, ভয়ানক এই দৃশ্য দেখেই নাকি তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। ভদ্রমহিলা নিজে এখন ব্রেন ফিভারে আক্রান্ত, কোনো কথা তার মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে না।

মিসেস বার্কলের সঙ্গে মিস মরিসন ফিরেছিলেন গির্জের মিটিং থেকে, হঠাৎ মিসেস বার্কলে কেন এত খাপ্পা হয়ে গেলেন, এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি মিস মরিসন।

চাবি যখন কোথাও পাওয়া গেল না, ধরে নিলাম বাইরের কেউ ঘরে ঢুকে চাবি নিয়ে ভাগলবা হয়েছে। তাই জানলার বাইরে লন আর রাস্তা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবসুদ্ধ পাঁচটা পায়ের ছাপ আমি পেলাম। আততায়ী রাস্তা থেকে পাঁচিল টপকে লনে ঢুকেছে, বেগে লন পেরিয়ে এসেছে, যে কারণে পায়ের পাতা পায়ের গোড়ালির চাইতে মাটিতে বেশি চেপে বসেছে, তারপর জানলা টপকে ঘরে ঢুকেছে। পাঁচটা ছাপের একটা পেলাম রাস্তায়, দুটো লনে, দুটো জানলার গোবরাটে। কিন্তু আততায়ীর সঙ্গে তার একজন যে-এসেছে, আমাকে বেশি তাজ্জব করেছে সে।

খুনের স্যাঙাত?

পকেট থেকে একটা পাতলা ফিনফিনে কাগজ বার করে হাঁটুর ওপর সন্তর্পণে মেলে ধরল হোমস।

বলল, বলো তো ছাপগুলো কীসের?

কাগজভরতি অনেকগুলো কিম্ভুতকিমাকার পদচিহ্ন দেখলাম। বড়ো বড়ো নখ আছে পায়ে এবং নখ-টখ মিলিয়ে পুরো পায়ের ছাপ আইসক্রিম চামচের চেয়ে বড়ো নয়।

কুকুরের পায়ের ছাপ, বললাম আমি।

কুকুর কি পর্দা বেয়ে ওঠে? এ কিন্তু উঠেছিল, পর্দায় ছাপ পেয়েছি।

তাহলে বাঁদর?

বাঁদরের পায়ের ছাপ এ-রকম হয় না।

তবে?

কুকুর, বেড়াল, বাঁদর বা চেনাজানা কোনো জন্তুই নয়। এই দেখ এক জায়গায় ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের পা আর পেছনের পায়ের মধ্যে ব্যবধান পনেরো ইঞ্চি। এর সঙ্গে গলা আর মাথা জুড়লে লম্বায় সে কম করেও দু-ফুট। ল্যাজ থাকলে তো

আরও বেশি। হেঁটেছে কিন্তু তিন ইঞ্চি দীর্ঘ পদক্ষেপে। অর্থাৎ জন্তুটার পা বেঁটে, কিন্তু দেহ লম্বা। লোম-টোম ফেলে গেলে আঁচ করতে সুবিধে হত। আপাতত শুধু বোেঝা যাচ্ছে, বিচিত্র এই প্রাণীটা মাংসাশী, আর পর্দা বেয়ে সরসর করে উঠতে পারে।

মাংসাশী জানলে কী করে?

পর্দা বেয়ে উঠে জানলার ওপরে রাখা একটা পাখির খাঁচার দিকে গিয়েছিল বলে। এই সব দেখেই মনে হয় অদ্ভুত এই জীবকে দেখতে অনেকটা বেজির মতো, কিন্তু বেজিরা যত বড়ো হয়, তার চেয়ে অনেক বিরাট।

বেজির সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক?

এখনও তো ধোঁয়াটে। খবর পেলাম, কর্তাগিন্নির ঝগড়ার সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাকি একটা লোক রগড় দেখছিল। জানলা খোলা ছিল, পর্দা ছিল না, ঘরে আলো জ্বলছিল। তারপর এইসব পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পাঁচিল টপকে লন পেরিয়ে তার চার-পেয়ে সঙ্গীকে নিয়ে জানলা গলে ঘরে ঢুকেছিল। তারপর হয় সে কর্নেলের মাথা ফাটিয়েছে, অথবা কর্নেল তাকে দেখে আঁতকে উঠে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ঝাঝরিতে নিজের মাথা নিজেই ফাটিয়েছেন। রহস্যময় এই উটকো আততায়ী প্রস্থান করেছে কিন্তু ঘরের চাবিটা পকেটে নিয়ে।

হোমস, রহস্য কিন্তু আরও জট পাকিয়ে গেল।

খাঁটি কথা। মিস মরিসন কিন্তু নিশ্চয় জানেন খোশমেজাজে সাড়ে সাতটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেন অত বদমেজাজে ন-টায় বাড়ি ফিরলেন মিসেস বার্কলে। এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা অঘটন ঘটেছে যে মিসেস বার্কলে বাড়ি ফিরেই নিরালা থাকবার জন্যে বাইরের ঘরে ঢুকেছিলেন। স্ত্রী বাড়ি ফিরেছে শুনে কর্নেল সেই ঘরে ঢুকতেই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। ফেটে পড়েছেন কর্নেল-গৃহিণী। কিন্তু কেন? নিশ্চয় জানেন মিস মরিসন।

তাই মিস মরিসনকে সোজাসুজি বললাম, তিনি যা জানেন, যদি না বলেন, মিসেস বার্কলের ফাঁসি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

ভদ্রমহিলা বেশ সেয়ানা। সব শুনে যা বললেন তা এই :

গির্জের মিটিং থেকে বেরোনোর পর জনহীন হাডসন স্ট্রিটের মোড়ে একজন বাক্স কাঁধে বিকলাঙ্গ কুঁজো পা টেনে টেনে যেতে যেতে আচমকা মিসেস বার্কলকে দেখে আরে, ন্যান্সি যে! বলেই ভীষণ চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গেসঙ্গে মড়ার মতো সাদা হয়ে যায় মিসেস বার্কলের মুখ। এমনভাবে টলে ওঠেন যে মিস মরিসন ধরে না-ফেললে নির্ঘাত পড়ে যেতেন রাস্তায়।

মিস মরিসন পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দেন মিসেস বার্কলে। মোলায়েম সুরে বিকৃতদর্শন লোকটিকে বলেন, হেনরি, তুমি! আমি তো জানতাম তুমি মারা গেছ! তিরিশ বছর আমার কাছে তুমি বেঁচে নেই।

সত্যিই কি আমি বেঁচে আছি? আমি তো অতীতের প্রেত! এমন সুরে এমন বিকট মুখভঙ্গি করে কথাগুলো বলল বীভৎস সেই নিশীথ পথচারী যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মিস মরিসনের। লোকটার চুল আর জুলপি হাঁসের পালকের মতো সাদা, মুখের চামড়া শুকনো আপেলের মতো অদ্ভুতভাবে কুঁচকানো। দু-চোখে যেন দু-টুকরো অঙ্গার জ্বলছে ধকধক করে রাতে ঘুমের মধ্যেও এই চোখে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছেন মিস মরিসন।

মিসেস বার্কলে কিন্তু নীরক্ত মুখে কাঁপা ঠোঁটে মিস মরিসনকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। ভয়ানক সেই মানুষটার সঙ্গে নাকি তার কথা আছে। কাজেই এগিয়ে গেলেন মিস মরিসন। একটু পরেই পাশে চলে এলেন মিসেস বার্কলে। পেছন ফিরে মিস মরিসন দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো শূন্যে মুষ্টি নিক্ষেপ করছে বিকলাঙ্গ কুজ।

মিসেস বার্কলে নীরবে বাড়ি পর্যন্ত এসে মিস মরিসনকে দিয়ে কথা আদায় করে নিলেন, এই ব্যাপার যেন কাকপক্ষীও না-জানে। লোকটা নাকি তাঁর পূর্ব-পরিচিত, এখন গোল্লায় গেছে।

সব শুনে বুঝলাম মূল রহস্য নিহিত ওই বিকলাঙ্গ লোকটার মধ্যে। বদখত চেহারার লোককে খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। হলও না। অলডারশটে মিলিটারি আদমিই বেশি থাকে। বাইরের লোক কম–তার মধ্যে বিকলাঙ্গ একজনই আছে। নাম হেনরি উড। দিন পাঁচেক হল এসেছে–উঠেছে হাডসন স্ট্রিটেরই একটা ভাড়াটে কোঠায়। বাড়িউলি তটস্থ থাকেন লোকটার সঙ্গী-সাথি জন্তুগুলোর জন্যে। এদেরকে নিয়ে সে ভেলকি দেখিয়ে বেড়ায় মিলিটারি ক্যাম্পে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ভাষায় নিজের সঙ্গেই কথা বলে। দিন দুয়েক নাকি ঘরের মধ্যে থেকে গুঙিয়ে গুঙিয়ে একটানা একঘেয়েমি কান্না কেঁদে চলেছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাড়িউলি। টাকাকড়ির ব্যাপারে লোকটা পরিষ্কার হলে কী হবে–জমা বাবদ একটা অদ্ভুত মুদ্রা রেখেছে বাড়িউলির কাছে। আমি দেখলাম মুদ্রাটা। ভারতবর্ষের টাকা।

ভায়া ওয়াটসন, আমার বিশ্বাস এই লোকটাই সেদিন ঘরে ঢুকেছিল। তারপর কী ঘটেছিল, ওর মুখেই শুনতে চাই। তোমাকে রাখতে চাই সাক্ষী হিসেবে। বেকার স্ট্রিটের উঞ্ছ-বাহিনীর একটা ছোকরাকে বিকট লোকটার ওপর নজর রাখতে বলে এসেছি। বাড়ি ছেড়ে চম্পট দিলেও রেহাই নেই, পেছন নেবে আমার চর।

অলডারশট পৌঁছানোর পরদিন দুপুরে। হাডসন স্ট্রিটে যেতেই একটা উঞ্ছ ছোকরা এসে ফিসফিস করে হোমসকে বলে গেল সব ঠিক আছে।

ছোকড়াকে বিদেয় করে আমাকে নিয়ে বিশেষ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল হোমস। কার্ড পাঠাল ভেতরে। একটু পরেই ডাক এল ভেতরে।

ঢুকলাম একটা বদ্ধ উত্তপ্ত ঘরের মধ্যে। একে তো গরমকাল, তার ওপরে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ঘরে। ঘরটা তেতে উঠেছে উনুনের মতো। আগুনের সামনে গুটিসুটি মেরে বসে কিম্ভুতকিমাকার একটা লোক। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে দুমড়ে ভাঁজ করে বসে আছে যে এক নজরেই বোঝা যায় সাংঘাতিকভাবে বিকৃত তার প্রতিটি অঙ্গ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই কিন্তু ময়লা কুচ্ছিত মুখটার মধ্যে কোথায় যেন একটা হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যের ছোঁয়াচ দেখলাম। এককালে এ-মুখে রূপ ছিল, আকর্ষণ ছিল, এখন বিতৃষ্ণা জাগায় মলিনতা আর শ্রীহীনতার জন্যে।

লোকটা সন্দিগ্ধ আবিল চোখে আমাদের নিরীক্ষণ করে ইঙ্গিতে বসতে বলল দুটো চেয়ারে।

হোমস প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, মি. হেনরি উড, আপনি এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে। কর্নেল বার্কলের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কিন্তু আমি তার কী জানি? ব্যাপারটা যদি স্পষ্ট না হয়, আপনার বান্ধবী মিসেস বার্কলের ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।

চমকে উঠল বিকলাঙ্গ হেনরি উড, কে আপনি? এত খবর আপনি জানলেন কী করে? যা বললেন, তা সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। জ্ঞান ফিরলেই গ্রেপ্তার হবেন মিসেস বার্কলে।

আপনি কি পুলিশের লোক?

না।

তবে আপনি এ-ব্যাপারে এসেছেন কেন?

সত্যকে জানতে চাই বলে।

মিসেস বার্কলে নিরপরাধ।

তাহলে কি অপরাধটা আপনার?

না।

তাহলে কে খুন করল কর্নেলকে?

নিয়তি। আমি নিজের হাতে খুন করলে প্রাণটা ঠান্ডা হত ঠিকই, বুকজোড়া ধিকিধিকি আগুন কিন্তু নিভত না–যা হারিয়েছে, তা আর ফিরে আসত না। তবে শুনুন আমার অবিশ্বাস্য কাহিনি।

আজকে আমার এই বাঁকাচোরা চেহারা দেখে আপনাদের হাসি পাচ্ছে জানি। পিঠজোড়া কুঁজ আর তেউড়োনো পাঁজরা দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন এ-রকম চেহারা নিয়ে আছি কী করে। কিন্তু একদিন ১১৭ নং পদাতিক বাহিনীর সবচেয়ে স্মার্ট মানুষ ছিলাম আমি–কর্পোরাল হেনরি উড। ভারতবর্ষের ভুর্তি অঞ্চলের ক্যান্টনমেন্টে ছিলাম আমি। সার্জেন্ট বার্কলেও ছিল সেখানে। আর ছিল ন্যান্সি টিভয় কৃষ্ণকায় সার্জেন্ট টিভয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা।

ন্যান্সির প্রেমে পাগল হয়েছিল দুটি পুরুষ–বার্কলে আর উড। ন্যান্সি কিন্তু পাগল হয়েছিল আমার জন্যে, কারণ আমার রূপ ছিল। কিন্তু ন্যান্সির বাবার পছন্দ বার্কলেকে–কারণ তার ভবিষ্যৎ ছিল। আমি নাকি একটা মাকাল ফল হইচই করেই দিন কাটাই, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি না।

ঠিক এই সময়ে শুরু হল সিপাই বিদ্রোহ। দেশজোড়া অরাজকতার মাঝে নির্বিচারে তুঙ্গে পৌঁছোল আমাদের প্রেম। তারপরেই দশ হাজার বিদ্রোহী ঘিরে ধরল আমাদের। বাচ্চাকাচ্চা মেয়েদের নিয়ে আমরা তখন হাজার জন। জেনারেল নীল এসে যদি উদ্ধার করেন, তাহলেই প্রাণে বাঁচব। নইলে কচুকাটা হতে হবে।

ন্যান্সির মুখ চেয়ে এবং হাজার জনের কথা ভেবে আমি একা গিয়ে জেনারেল নীলকে খবর দিতে চাইলাম। বার্কলে পথঘাটের হদিশ জানত। সে ছক এঁকে দেখিয়ে দিলে কোন পথে যেতে হবে। রাত দশটা নাগাদ সেই পথে যেতে গিয়ে ধরা পড়লাম ছ-জন

বিদ্রোহীর হাতে। আগে থেকেই খবর পেয়ে ওরা ওখানে ওত পেতে ছিল আমাকে ধরবার জন্যে। মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর খবরটা কে দিয়েছে কানে এল। মন ভেঙে গেল কথাটা শুনে, সার্জেন্ট বার্কলে রাস্তার ছক এঁকে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েই চাকর মারফত গোপনে জানিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহীদের।

এই ঘটনা থেকেই বুঝবেন, জেমস বার্কলের অসাধ্য কিছু ছিল না এ-সংসারে। যাই হোক, জেনারেল নীল পরের দিন উদ্ধার করেন আটক শিবিরবাসীদের। বিদ্রোহীরা আমাকে নিয়ে পিছু হটে গেল। দীর্ঘদিন কাটল ওদের সঙ্গে। ইংরেজের মুখ দেখিনি–শুধু যন্ত্রণা পেয়েছি। অকথ্য কষ্ট দিত। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছি, নিগ্রহ আরও বেড়েছে। বিকলাঙ্গ হয়েছি অবর্ণনীয় অত্যাচারে। তারপর কয়েকজন আমাকে নিয়ে গেল নেপালে। সেখান থেকে দার্জিলিংয়ে। পাহাড়িদের আক্রমণে প্রাণ হারাল পলাতক বিদ্রোহীরা, আমাকে গোলাম বানিয়ে রাখল বেশ কিছুদিন। এবার পালিয়ে উত্তরে গিয়ে পড়লাম আফগানদের হাতে। সেখান থেকে পাঞ্জাবে এসে অনেক রকম লাগ-ভেলকি ম্যাজিক শিখলাম। ইংলন্ডে ফিরে পুরোনো বন্ধুদের কাছে বিকট এই চেহারা দেখাতে মন চাইল না। ঠিক করলাম, ন্যান্সি আর বন্ধুদের কাছে আমি বরং মৃত থাকি। ন্যান্সি যে বার্কলেকে বিয়ে করেছে, সুখে ঘরকন্না করছে, সে-খবর পেয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও অতীতকে খুঁচিয়ে জাগাতে চাইনি। ইংলন্ডে ফিরতে চাইনি।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে দেশের মাটির প্রতি টানও বাড়ে। তাই একদিন ফিরলাম ইংলন্ডে। সৈন্য-শিবিরে ভেলকি দেখিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান করতে লাগলাম।

শার্লক হোমস বলল, সত্যিই ইন্টারেস্টিং আপনার কাহিনি। মিসেস বার্কলের সঙ্গে দেখা হল কীভাবে শুনেছি। তারপর নিশ্চয় ওঁর পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত এসে বাইরের থেকে স্বামী-স্ত্রীর দারুণ ঝগড়া শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি–ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন?

হ্যাঁ। আমাকে দেখামাত্র মুখচোখের চেহারা যেন কীরকম হয়ে গেল বার্কলের। আসলে আচমকা দেখেই নিদারুণ মানসিক আঘাতে মারা গিয়েছিল সঙ্গেসঙ্গে আমার চেহারাটাই যেন বন্দুকের বুলেট হয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল ওর পাপজীর্ণ হৃৎপিণ্ড। মৃতদেহটা আছড়ে পড়ে মেঝেতে মাথা ফেটে যায় ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরিতে লেগে। আর্তনাদ করে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায় ন্যান্সি। চাবিটা নিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে ভাবলাম, কাজটা ঠিক হবে না। আমাকেই খুনি বলে সাব্যস্ত করা হতে পারে। তাই চাবি পকেটে নিয়ে টেডিকে পর্দার ওপরে ধরতে গিয়ে হাতের লাঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল। পালিয়ে এলাম জানলা গলে।

টেডি কে?

হেনরি উড হেঁট হয়ে একটা খাঁচার ঢাকনি খুলে দিতেই ভেতর থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে এল হিলহিলে চেহারার একটা লালচে-বাদামি লোমশ জীব। শক্ত বেঁটে পা, সরু লম্বা নাক, ঝিলমিলে টুকটুকে চোখ।

সবিস্ময়ে বললাম, আরে, এ যে বেজি দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ। একে দিয়ে সাপ ধরি আমি। আমার কাছেই বিষদাঁত ভাঙা একটা সাপ আছে। ক্যান্টনমেন্টে রাত্তিরে যাই টেডিকে দিয়ে সাপ ধরার খেলা দেখাতে। আর কিছু জানবার থাকলে বলুন।

মি. হেনরি উড, অতীতকে বর্তমানে টেনে আনতে চাই না। মিসেস বার্কলে বিপদগ্রস্ত না হলে আপনাকে নিয়ে আর টানাটানি করব না। মহাপাপী জেমস বার্কলে ত্রিশ বছর ধরে অনুশোচনায় দগ্ধে মরেছেন তিল তিল করে শেষ মৃত্যু হল নাটকীয়ভাবে আপনার দর্শনের ফলে। চললাম। উঠে পড়ল হোমস।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেল মেজর মর্জির সঙ্গে। হোমসকে দেখেই ভদ্রলোক সোল্লাসে বললেন, এই যে! খবর শুনেছেন? সবই তো পণ্ডশ্রম হল।

কী ব্যাপার বলুন তো?

ডাক্তারের রিপোর্ট এসেছে। জেমস বার্কলে সন্ন্যাস রোগে মারা গেছেন। খুবই সোজা কেস।

সোজাই বটে। ওয়াটসন, চলো, অলডারশটে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, একজনের নাম জেমস, আর একজনের হেনরি ডেভিড তাহলে কে? মিসেস বার্কলে কাকে ডেভিড বলছিলেন?

ভায়া ওয়াটসন, তুমি আমাকে যুক্তিবাদী বলে প্রচার করো। সত্যিই যদি তাই হতাম, যুক্তিযুদ্ধি সত্যিই যদি মগজে থাকত–শুধু ডেভিড নামটা শুনেই রহস্য সমাধান করতে পারতাম। ডেভিড বলে কাউকে ডাকা হয়নি, গালাগাল দেওয়া হয়েছে।

গালাগাল দেওয়া হয়েছে?

ইউরিয়া আর বাথসেবার গল্পটা মনে পড়ছে? বাইবেলের কাহিনি? আমার জ্ঞান অতটা স্পষ্ট নয়, প্রথম কি দ্বিতীয় স্যামুয়েল খুলে ঝালিয়ে নিয়ো। সার্জেন্ট জেমস বার্কলের মতোই গর্হিত কাজ করেছিলেন ডেভিড।

—————-

টীকা

বিকলাঙ্গর বিচিত্র উপাখ্যান : দ্য ক্রুকেড ম্যান জুলাই ১৮৯৩-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলিতে প্রকাশিত হয় ৮ জুলাই ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে অগাস্ট ১৮৯৩ সংখ্যায়।

সবে বিয়ে হয়েছে : হোমস-গবেষকদের মতে ওয়াটসন মেরি মার্স্টনের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ১৮৮৮-র অগাস্ট মাসে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : পূর্ববর্তী কাহিনির টিকা দ্রষ্টব্য।

সিপাই বিদ্রোহে : ভারতীয় সিপাই এবং রাজন্যবর্গের একাংশের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের সময়কাল ১৮৫৭-৫৮ সালে। অর্থাৎ গল্পের ঘটনার ঠিক ত্রিশ বা একত্রিশ বছর আগে।

দরজার চাবি কোথাও পাওয়া গেল না : এই ধরনের ঘটনা, বিশেষত্ব হত্যা, সংবলিত কাহিনির সাহিত্যের ভাষায় পোশাকি নাম ক্লোজড বা লকড রুম মিস্ট্রি। এখানে অপরাধ যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আসা বা সেখান থেকে বাইরে যাওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না। গোয়েন্দাকে খুঁজে বার করতে অপরাধীর আসা-যাওয়ার পথ। এডগার অ্যালান পো-র মার্ডার্স ইন দ্য রু মর্গ এই ধরনের গল্পের প্রাচীনতম উদাহরণ।

বেকার স্ট্রিটের উঞ্ছ বাহিনীর : বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে এই ছেলেদের ব্যবহার করেছেন হোমস। এদের নেতা হিসেবে উইগিন্স-এর নাম শোনা গিয়েছে। এই দলের আর এক সদস্যর নাম সিম্পসন।

ভুর্তি : ভুর্তি কল্পিত অঞ্চল। তবে জেনারেল নীলের কীর্তির বিচারে এটি আগ্রা হওয়া সম্ভব।

জেনারেল নীল : জেনারেল জেমস জর্জ নীল (১৮১০-১৮৫৭) ব্রিটিশ সৈন্যদলকে নিয়ে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছোন। লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের হাতে নীলের মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে মরণোত্তর নাইটহুড লাভ করেন জেনারেল নীল।

নিয়ে গেল নেপালে : সিপাই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবীদের একাংশ নেপালে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা নানাসাহেব।

দার্জিলিংয়ে : নেপাল লাগোয়া দার্জিলিং ১৮৩৫ পর্যন্ত ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। ওই বছর সিকিম ব্রিটিশদের দার্জিলিং হস্তান্তর করে এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এই পার্বত্য অঞ্চল।

ইউরিয়া আর বাথসেবার গল্পটা : ইউরিয়ার স্ত্রী বাথসেবা ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি নজরে পড়েন ইজরায়েলের রাজা ডেভিডের। ডেভিড বাথসেবাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে বাথসেবাকে উপভোগ করলে বাথসেবা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। ইউরিয়া ফিরে এসে আবার যুদ্ধে যান এবং সেখানে মৃত্যু হয় তার। তখন বাথসেবাকে বিবাহ করে রানির মর্যাদা দেন ডেভিড। দ্বিতীয় স্যামুয়েলে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মাসগ্রেভ-সংহিতা

[দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল]

শার্লক হোমসের চিন্তায় শৃঙ্খল ছিল, পোপাশাকে পরিপাট্য ছিল, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ছিল না ব্যক্তিগত অভ্যাসে। পারস্য দেশের চটির মধ্যে তামাক, কয়লা রাখার জায়গায় চুরুট, কাঠের ম্যান্টলপিসে ছুরি দিয়ে গাঁথা জবাব-না-দেওয়া চিঠি, যেখানে সেখানে কাগজের স্তূপ আর যত্রতত্র রাসায়নিক বিশ্লেষণের সরঞ্জাম। গুছিয়ে রাখা ওর ধাতে নেই–কাউকে গুছোতেও দেবে না। কুঁড়ের বাদশার মতো দিনরাত হয় বেহালা, নয় বই নিয়ে বসে থাকত চেয়ারে। একদিন তো চেয়ারে বসেই এক-শোটা কার্তুজ নিয়ে পিস্তল ছুঁড়তে লাগল দেওয়াল লক্ষ করে এবং গুলির দাগ দিয়ে চুনকাম খসিয়ে V.R. অক্ষর দুটো ফুটিয়ে তুলল দেওয়ালে।

ন-মাসে ছ-মাসে একবার অমানুষিক পরিশ্রম করে পুরোনো কেসের কাগজপত্র সাজিয়ে রাখত একটা বাক্সে। ফিতে দিয়ে বাঁধত, ক্রমিক সংখ্যা দিত। দলিলগুলো ছিল ওর বুকের পাঁজর। কিন্তু ওই একবারই। তারপর আবার আলসেমিতে পেয়ে বসত। উদ্যম বিস্ফোরিত হয়েই মিলিয়ে

যেত–আসত অপরিসীম নিষ্ক্রিয়তা।

একদিন বিরক্ত হয়েই বললাম ঘরের কোণে ছড়ানো কাগজের উঁইগুলো সাজিয়ে রাখতে। বিরস বদনে শোবার ঘরে উঠে গেল হোমস। হিড়হিড় করে একটা পেল্লায় বাক্স টানতে টানতে ফিরে এল একটু পরেই। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পাশে।

ডালা খুলে নষ্টামির সুরে বলল, ভায়া ওয়াটসন, এর মধ্যে এমন সব কেস আছে যা তুমি টেনে বার করতে চাইবে, নতুন কেস ভেতরে পুরতে চাইবে না।

দেখলাম বাক্সটার তিন ভাগ ভরতি রাশি রাশি লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা কাগজের বান্ডিল।

পুরোনো মামলার দলিল? বললাম আমি।

হ্যাঁ। আমার জীবনীকারটি আমার জীবনে আসার আগে যেসব আশ্চর্য মামলার কিনারা করেছিলাম, এর মধ্যে আছে সেইসবের বৃত্তান্ত।

বলতে বলতে নীচ থেকে একটা কাঠের বাক্স টেনে বার করল হোমস। বাচ্চাদের খেলনার বাক্সের মতো ডালাটা একপাশে টেনে খুলতে হয়। ভেতরে থেকে বেরোল অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস।

দলা পাকানো একটা কাগজ, মান্ধাতার আমলের একটা পেতলের চাবি, একটা কাঠের গোঁজের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা মরচে পড়া তিনটে ধাতুর টুকরো।

অবাক হয়ে বললাম, অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস জোগাড় করেছ দেখছি।

এর সঙ্গে যে-ইতিহাসটা জড়িয়ে আছে, সেটাও কম অদ্ভুত নয়।

বলে, জিনিসগুলো একে একে সাজিয়ে রাখল টেবিলে। নিবিড় চোখে চেয়ে রইল সেইদিকে। দুই চোখে দেখলাম আত্মপ্রসাদের ঝিলিক।

বলল, মাসগ্রেভ-সংহিতা যাতে কখনো না-ভুলি, এ-সংগ্রহ সেই কারণেই।

মাসগ্রেভ-সংহিতা নামটা এর আগেও তোমার মুখে শুনেছি। ঘটনাটা শুনিনি। বলবে?

দুই চোখে দুষ্টুমি নাচিয়ে হোমস বললে, তাহলে কিন্তু কাগজের পাহাড় যেমন তেমনি পড়ে থাকবে। কেসটা কিন্তু সত্যিই অসাধারণ। আমার কীর্তির তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ-ঘটনা না প্রকাশ পেলে।

লন্ডনে প্রথমে এসে বাসা নিলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোণে মন্টেগু স্ট্রিটে।গ্লোরিয়া স্কট কেসেই প্রথম বুঝি কোন পথে জীবিকা অর্জন করতে হবে আমাকে। মাসগ্রেভ সংহিতা আমার তৃতীয় কেস।

প্রথম দিকে কেস আসত ছাত্রবন্ধু মারফত। বাকি সময়টা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বই পড়তাম, নিজেকে আরও তৈরি করতাম।

রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ পড়ত একই কলেজে। খানদানি চেহারা। চেহারা দেখলেই চোখের সামনে যেন ভেসে উঠত সামন্তযুগের বিরাট খিলানওয়ালা পুরোনো প্রাসাদ। উত্তর অঞ্চলে সুপ্রাচীন মাসগ্রেভদের মূল অংশ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম সাসেক্সে হার্লস্টোনে।

বছর চারেক ওকে দেখিনি। হঠাৎ একদিন হাজির হল মন্টেগু স্ট্রিটের বাসায়। বলল, হোমস, কলেজে যেসব ভেলকি দেখিয়ে অবাক করে দিতে সবাইকে, শুনলাম সেইসব কায়দায় অনেক সমস্যার সমাধান করছ ইদানীং?

সায় দিলাম আমি। ও তখন বললে, হার্লস্টোনে অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ হালে পানি পাচ্ছে না।

শুনে মনটা নেচে উঠল আমার। পুলিশ যেখানে থই পায় না, আমি সেখানে কিছু করতে পারব, এ-বিশ্বাস আমার বরাবরের। আর এইরকম সমস্যার জন্যেই তো হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা।

সাগ্রহে বললাম, কী ব্যাপার বলো তো?

রেজিন্যাল্ড সিগারেট ধরিয়ে বললে, বছর দুই হল বাবা মারা গেছে। আমি এখনও বিয়ে করিনি। পুরোনো আমলের বাড়ি। ফি বছরে শিকারের জন্যে অনেক লোককেও নেমন্তন্ন

করতে হয়। কাজেই বেশ কিছু চাকরবাকর দরকার হয়। আটজন ঝি, রান্নার ঠাকুর, বাটলার, দুজন দারোয়ান, আর একটা বাচ্চা চাকর। এ ছাড়া বাগান আর আস্তাবল দেখাশুনোর জন্যেও লোক আছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো লোক হল বাটলার ব্রানটন। আগে স্কুল মাস্টারি করত। চাকরি যাওয়ার পর বাবা খাসচাকরের কাজ দেয়। খুব সুন্দর চেহারা। স্বভাবও তেমনি। বছর চল্লিশ বছর বয়স। বেশ কয়েকটা ভাষা বলতে পারে, যেকোনো বাজনা বাজাতে পারে। কুড়ি বছর আমাদের বাড়িতে আছে।

দোষ ওর একটিই... মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা।

যদ্দিন বউ ছিল, ব্রানটনও বেশ ছিল। বিপত্নীক হওয়ার পরেই আরম্ভ হল মেয়েদের নিয়ে খেলা। ঝি র‍্যাচেলকে তো বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে দিল–কিন্তু তারপরেই তাকে ছেড়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে এমন মাখামাখি আরম্ভ করল যে ব্রেন-ফিভার হয়ে গেল র‍্যাচেলের। শরীর আধখানা হয়ে গেল। মেয়েটি সত্যিই ভালো। কিন্তু ওয়েলসের মেয়ে তো, উত্তেজিত হয় পান থেকে চুন খসলে। ছায়ার মতো এখন বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়–আগেকার র‍্যাচেল আর নেই। এই হল গিয়ে হার্লস্টোনের প্রথম নাটক। দ্বিতীয় নাটকের শুরুতে বদনাম নিয়ে চাকরি খোয়াল ব্রানটন।

ব্রানটনের গুণ অনেক। বুদ্ধিও প্রখর। কিন্তু এই বুদ্ধিই ওর সর্বনাশ করে ছাড়ল। বেশি বুদ্ধি থাকার জন্যেই সব জিনিসই জানতে চাইত—সব ব্যাপারেই কৌতূহল থাকত–যা ওর জানার কথা নয়–সে-ব্যাপারও। ছোট্ট একটা ঘটনায় একদিন চোখ খুলে গেল আমার।

গত বেস্পতিবার রাত্রে খাওয়ার পর কড়া পানীয় খাওয়ায় ঘুম আসছিল না। রাত দুটোর সময় ভাবলাম–ধুত্তোর, জেগে শুয়ে থাকার চাইতে বরং আধ-পড়া উপন্যাসখানা শেষ করি। বইটা বিলিয়ার্ড-ঘরে রেখে এসেছিলাম। ড্রেসিংগাউন গায়ে চাপিয়ে আনতে চললাম।

লাইব্রেরি-ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয় বিলিয়ার্ড-রুমে। হঠাৎ দেখলাম আলো বেরুচ্ছে লাইব্রেরির খোলা দরজা দিয়ে। চমকে উঠলাম। নিশ্চয় চোর ঢুকেছে। কেননা, আলো নিভিয়ে গেছিলাম। বাড়িটা আমাদের পুরোনো। প্রায় সব বারান্দা আর করিডোরের দেওয়ালে হাতিয়ার টাঙানো থাকে। একটা টাঙি পেড়ে নিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালাম লাইব্রেরি-রুমের দরজায়।

দেখলাম, ইজিচেয়ারে বসে ঘাড় হেঁট করে একমনে একখানা ম্যাপের মতো কাগজ দেখছে ব্রানটন। কোনোদিকে হুঁশ নেই। পরনে পূর্ণ পোশাক, রাতের পোশাক নয়। স্তম্ভিত হয়ে দেখছি এই দৃশ্য। ম্যাপখানা দেখা শেষ করে উঠে গেল ও দেরাজের কাছে। চাবি দিয়ে পাল্লা খুলে একটা কাগজ টেনে বার করল খুপরি থেকে। টেবিলের ছোটো আলোর পাশে মেলে ধরে পড়তে লাগল তন্ময় হয়ে।

পারিবারিক কাগজপত্রে ওর এই গোপন কৌতূহল দেখে রাগে ঘেন্নায় গা জ্বলে গেল আমার। এক পা এগুতেই চেয়ার থেকে ছিটকে গেল ব্রানটন। দেখলাম ভয়ে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। ম্যাপের মতো কাগজখানা ঝট করে ভাঁজ করে রেখে দিল বুকপকেটে।

ফেটে পড়লাম আমি। বলে দিলাম, সকাল হলেই যেন এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হয়। এত বড়ো স্পর্ধা!

ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে গেল ব্রানটন। এত তন্ময় হয়ে কী পড়ছিল, দেখবার জন্যে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কাগজখানা খুব একটা দরকারি কিছু নয়। মাসগ্রেভ-সংহিতা। ধর্মীয় নির্দেশের কায়দায় শ্লোকের মতো লেখা কতকগুলো বাণী। মাসগ্রেভ বংশে সাবালক হলেই প্রত্যেককে এটা একবার পড়তে হয়। এ ছাড়া এর আর কোনো দাম নেই।

চাবি লাগানো ছিল দেরাজে। পাল্লা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম ব্রানটন আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

কাকুতিমিনতি করে একমাস সময় চাইল। লোকে যদি জানে, গলা ধাক্কা খেয়ে রাতারাতি চাকরি গিয়েছে, মাথা কাটা যাবে। তাই যেন নিজেই চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে এইভাবে এক মাসের নোটিশ দিতে চাইল।

আমি বললাম, তোমার মতো বদ চরিত্রের লোককে একমাস এ-বাড়িতে আর রাখা যায়। যাই হোক, অনেকদিন নুন খেয়েছ, পাঁচজনের সামনে তাই তোমার মাথা হেঁট করব না। সাতদিন সময় দিলাম।

ও যেন ককিয়ে উঠল। কাতরভাবে পনেরোটা দিন সময় চাইল। আমি একদিনও বাড়ালাম। বিধ্বস্ত মুখে মাথা নীচু করে ও চলে গেল।

দু-দিন মুখ বুজে কাজ করে গেল ব্রানটন। আমিও কারো কাছে কিছু ভাঙলাম না। তৃতীয় দিন সকালে রোজকার মতো সারাদিনের নির্দেশ নিতে আমার টেবিলে এল না।

ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে র‍্যাচেলকে দেখলাম। রোগভোগের জন্যেই মুখখানা বড্ড বেশি লম্বা আর ফ্যাকাশে ঠেকল। বললাম, এখন ওর কাজ করার দরকার নেই। গায়ে শক্তি আসুক। ডাক্তার যদি বলে, তাহলে কাজে লাগবে।

বললাম, নীচে গিয়ে ব্রানটনকে পাঠিয়ে দাও।

ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল র‍্যাচেল। আচমকা পাগলের মতো হাসতে আর কাঁদতে কাঁদতে বললে, চলে গেছে ব্রানটন... চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

জানি না... জানি না... ব্রানটন পালিয়েছে... পালিয়েছে... হাঃ হাঃ হাঃ...–তারপরেই হাউ হাউ করে কান্না।

দেখলাম হিস্টিরিয়ায় ধরেছে র‍্যাচেলকে। লোকজন ডেকে ওকে ঘরে নিয়ে যেতে হুকুম দিলাম। নিজে গেলাম ব্রানটনের ঘরে। বিছানায় শোয়নি রাতে, কিন্তু কালো সুট পরে বেরিয়েছে–অথচ জুতো রেখে গেছে, শুধু চটি পায়ে দিয়েছে। জানলা দরজা বন্ধ। টাকাপয়সা, ঘড়ি, জামাকাপড় সব রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো। তাহলে ও গেল কোথায়?

বিরাট বাড়ির সর্বত্র খোঁজা হল–চিলেকোঠা থেকে পাতালঘর পর্যন্ত ওকে পাওয়া গেল। পুলিশ ডাকলাম। আগের রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাগানের ভিজে মাটির রাস্তায় নিশ্চয় পায়ের ছাপ থাকত–তাও নেই। জিনিসপত্র না-নিয়েই উধাও হয়েছে ব্রানটন এবং অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে।

দু-দিন প্রলাপ বকে গেল র‍্যাচেল। নার্স মোতায়েন করলাম দিনে রাতে। তৃতীয় রাতে র‍্যাচেল ঘুমোচ্ছে দেখে নার্স চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে দেখলে সে নেই। জানলার নীচ থেকে তার পায়ের ছাপ গিয়ে শেষ হয়েছে জলার ধারে। হ্রদের জল মাত্র আট ফুট গভীর। জাল ফেলা হল জলে। র‍্যাচেলকে পাওয়া গেল না। কিন্তু জালে উঠে এল একটা কাপড়ের থলির মধ্যে অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস। জং-ধরা কতকগুলো বেরং ধাতব টুকরো আর কয়েকটা ম্যাটমেটে রঙের নুড়ি বা কাচ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ব্রানটন বা র‍্যাচেলের টিকি দেখা যায়নি। পুলিশ হালে পানি পাচ্ছে না। হোমস,

তাই এসেছি তোমার কাছে। ওয়াটসন, অদ্ভুত অন্তর্ধান কাহিনি শুনে মনটা আমার নেচে উঠল। সবগুলো ঘটনা দেখে মনে মনে পরপর সাজিয়ে নিলাম। ব্রানটন আর র‍্যাচেল দুজনেই নিখোঁজ। র‍্যাচেল প্রথমে ভালোবাসত ব্রানটনকে পরে তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। সে উদ্দাম, উত্তাল, আবেগময় ওয়েলসের মেয়েরা যা হয়। ব্রানটন পালিয়ে গেছে, এই ঘটনায় তার হিস্টিরিয়া হয়েছিল। তারপর লেকের জলে অদ্ভুত জিনিস বোঝাই থলি ফেলে উধাও হয়েছে।

বললাম, ম্যাসগ্রেভ, ব্রানটন যে-কাগজখানা দেখছিল, সেটা কোথায়?

এই নাও, বলে এই কাগজটা বাড়িয়ে দিল মাসগ্রেভ। সেইসঙ্গে বললে, এটা কিন্তু এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।

ওয়াটসন, এই সেই কাগজ। মাসগ্রেভ-সংহিতা। অদ্ভুত ছড়া, বিচিত্র প্রশ্নোত্তর। সাবালক হলেই মাসগ্রেভ বংশধরদের পড়তে হত। শোনো পড়ছি :

এটা কার?

যে গেছে, তার।

পাবে কে?

যে আসবে, সে।

মাস-টা তখন কী?

প্রথম থেকে ষষ্ঠ।

সূর্য তখন কোথায়?

ওক গাছের মাথায়।

ছায়া তখন কোথায়?

এলম গাছের তলায়।

পায়ের মাপ কেমন?

উত্তরে দশ আর দশ, পুবে পাঁচ আর পাঁচ, দক্ষিণে দুই আর দুই, পশ্চিমে এক আর এক, তার পরেতে নীচে।

বিনিময়ে দেব কী?

যা আছে সব–আবার কী?

দিতেই-বা যাব কেন?

বিশ্বাসের দাম যে তাই।

মাসগ্রেভ বললে, তারিখ নেই। কিন্তু বানান দেখে মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা। আসল রহস্যের কিনারা এতে হবে না।

আমি বললাম, আমার কিন্তু মনে হয় একটা রহস্যের সমাধান করলে আর একটারও হয়ে যাবে। একটা কথা বলে রাখি। কিছু মনে কোরো না। ব্রানটন তোমাদের বংশের দশ পুরুষের যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। কাগজটা সে আগেও অনেকবার দেখেছে। শেষবার দেখছিল ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যে সেই সময় তুমি ওকে ধরে ফেলেছিলে।

মাসগ্রেভ বললে, হতে পারে। এমন কিছু দরকারি নয় বলেই কাগজখানা ওইভাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তবে এর কোনো বাস্তব দাম আছে বলে মনে হয় না।

ঠিক উলটো। এটা দারুণভাবে একটা বাস্তব ব্যাপার। ব্রানটন ঠিক সেই চোখেই এ-কাগজ দেখেছিল। ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিল ছড়ার কথা। ম্যাপটা পকেটে নিয়ে গেছে, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাপের সঙ্গে মাসগ্রেভ-সংহিতার কী সম্পর্ক বুঝছি না।

সেট বোঝবার জন্যেই প্রথম ট্রেনে সাসেক্স যাব।

বিকেল বেলা পোঁছোলাম হার্লস্টোন। বাড়িটা প্রকাণ্ড। ইংরেজি L অক্ষরের মতো। একটা দিক বেজায় পুরোনো। দরজার মাথায় লেখা ১৬০৭। এদিকটা এখন গুদোমঘর আর মদ রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর একটা দিক পরে তৈরি হয়েছে। বাড়ির সামনে বাগান। বাগান ঘিরে পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড গাছ। লোকটা দু-শো গজ দূরে বড়োরাস্তার ধারে।

আগে থেকেই কেসটা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত মাথার মধ্যে খাড়া করে নিয়েছিলাম। মাসগ্রেভ-সংহিতাই এই রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। আজব ছড়াটা আবোল-তাবোল বকুনি মোটেই নয়। কোনো এক বুদ্ধিমান পূর্বপুরুষ হেঁয়ালি দিয়ে একটা পরম সত্যকে গোপন করেছেন, প্রতিটি বংশধরের সামনে সেই গুপ্ত সত্যকে মেলে ধরা হয়েছে–কেউ আসল অর্থ ধরতে পারেনি। পেরেছে ব্রানটন। ছড়ার মানে সে বুঝেছে। সেইমতো ম্যাপ এঁকেছে। নিশ্চয় কোনো একটা লুকোনো জায়গার হদিশ সেই ম্যাপে আর এই ছড়ার মধ্যে আছে। আমাকেও তা খুঁজে বার করতে হবে ওকগাছ আর এলম গাছের অবস্থান জেনে নিয়ে। আশ্চর্য সুন্দর একটা ওকগাছ দেখলাম বাড়ির ঠিক সামনেই রাস্তার ডান পাশে। গাছ তো নয়–মহীরুহ-সম্রাট বললেই চলে।

www.bengaliebook.com

পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। মাসগ্রেভকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, কাগজের ছড়া যখন লেখা হয়, এ-গাছ তার চাইতেও পুরোনো। নর্মানরা ইংলন্ড জয় করে যখন, তখনও ছিল। পরিধি তেইশ ফুট।

আমার এক নম্বর অনুমান তাহলে সত্যি হল। ছড়ার মধ্যে ওকগাছের উল্লেখ করা হয়েছে। কেন বোঝা গেল। এবার দেখা দরকার এলম গাছটা কোথায়। জিজ্ঞেস করলাম মাসগ্রেভকে। যখন লেখা হয়, সেই সময়কার কোনো এলম গাছের হদিশ সে জানে কি না।

ও বললে, নিশ্চয় জানি। কিন্তু দশ বছর আগে বাজ পড়ে পুড়ে গেছে। গুড়িটাও কেটে ফেলা হয়েছে।

কোথায় ছিল গাছটা, জিজ্ঞেস করলাম। নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখাল মাসগ্রেভ। বাড়ি থেকে ওকগাছ পর্যন্ত লাইন টানলে ঠিক মাঝখানে পড়ে সেই জায়গাটা। দু-নম্বর অনুমানও সত্যি হতে চলেছে বুঝলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, এলম গাছটা কতখানি উঁচু ছিল, জানা আছে কি? ঝট করে মাসগ্রেভ বললে, চৌষট্টি ফুট। আমি তো অবাক ওর ঝটপট জবাব শুনে। তারপর শুনলাম, ট্রিগোনোমেট্রির অঙ্ক শেখবার সময়ে মাস্টারমশায়ের পাল্লায় পড়ে বাগানের সবকটা গাছের উচ্চতা সে বার করেছে। এলম গাছের উচ্চতাও সে জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, মাসগ্রেভ, কখনো এ-প্রশ্ন তোমাকে করেছে?

মাসগ্রেভ অবাক হয়ে বললে, তুমি জানলে কী করে? মাস কয়েক আগে সহিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটির সময়ে সত্যিই আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, কত উঁচু ছিল এলম গাছটা।

বুঝলাম, ঠিক পথে তদন্ত চলেছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওকগাছের মাথা ছোঁবে তপনদেব। আশ্চর্য-সংহিতার একটা কথা মিলে যাবে। এখন দেখতে হবে এলম গাছের শেষ প্রান্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে। কাজটা খুবই কঠিন, কেননা এলম গাছই নেই।

কিন্তু ব্রানটন যা পেরেছে, আমি তা পারব না, তা কি হয়? মাসগ্রেভকে নিয়ে গেলাম ওর পড়ার ঘরে। কাঠের এই গোঁজটা বানিয়ে নিলাম, তাতে বাঁধলাম এই লম্বা দড়িটা, এক গজ অন্তর একটা গিট দিলাম। তারপর একটা ছিপ নিলাম, লম্বায় ছ-ফুট। মাসগ্রেভকে নিয়ে ফিরে এলাম এলম গাছ যেখানে ছিল, সেইখানে। ওকের মাথা ছুঁয়েছে সূর্য। ছিপটা খাড়া করে গেঁথে ছায়াটা মেপে দেখলাম লম্বায় ন-ফুট।

হিসেবটা এখন জলের মতো সোজা। ছ-ফুট লম্বা ছিপের যদি ন-ফুট লম্বা ছায়া পড়ে চৌষট্টি ফুট লম্বা গাছের ছায়া হবে ছিয়ানব্বই ফুট লম্বা, একই লাইনে পড়বে সেই ছায়া। ছিয়ানব্বই ফুট মেপে পৌঁছে গেলাম বাড়ির দেওয়ালের কাছে। গোঁজটা পুঁতলাম

সেখানে। দু-ইঞ্চি তফাতে দেখলাম শঙ্কুর মতো কাঠি দেবে গেছে। অর্থাৎ ব্রানটন এইখানে চিহ্ন দিয়েছিল। আমি এখন চলেছি তার মাপের পেছন পেছন।

এই পয়েন্ট থেকে পা ফেলে এগোতে হবে। আগে পকেট কম্পাস দিয়ে দেখে নিলাম উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম ঠিক কোন কোন দিকে। বাড়ির সমান্তরাল লাইনে এগোলাম বাঁ-পায়ে দশ পা, আবার ডান পায়ে দশ পা। একটা খোঁটা পুঁতলাম সেখানে। ঠিক সেইভাবে হিসেব করে পাঁচ পা ফেললাম পুবদিকে, দু-পা দক্ষিণ দিকে। সেকেলে দরজার সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে। গেলাম। এখন দু-পা পশ্চিমে এগোনো মানে পাথর-বাঁধানো গলিপথে দু-পা ফেলা। সংহিতায় ঠিক এই জায়গার কথাই বলা হয়েছে।

ওয়াটসন, জীবনে এ-রকম হতাশ হইনি। মুহূর্তের জন্যে মনে হল নিশ্চয় গোড়ায় গলদ করে বসেছি। হিসেবে ভুল হয়েছে। পড়ন্ত রোদ পড়েছে গলিপথের মেঝেতে। সর্বত্রই একইরকম নিরেট আওয়াজ শুনলাম, ফাটল বা চিড় কোথাও দেখলাম না। আমার কাজ দেখে মাসগ্রেভের টনক নড়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ও আঁচ করেছিল। হিসেবটা ঠিক আছে কি না দেখার জন্যে বার করল সংহিতা।

বললে সোল্লাসে, তার পরেতে নীচে–হোমস, তার পরেতে নীচে কথাটা খেয়াল করছ না কেন?

আগে ভেবেছিলাম, এ-কথার মানে পাথর খোঁড়া। এখন বুঝলাম ভুল করেছি। উত্তেজিত গলায় বললাম, এর নীচে পাতাল-কুঠরি আছে নাকি?

আছে, আছে, সেকেলে বাড়ি তো! একদম নীচে যেতে হবে, এই দরজা দিয়ে।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে পৌঁছোলাম, এক নজরেই বোঝা গেল, আগেও সেখানে লোক এসেছে। লণ্ঠনটা রাখলাম একটা পিপের ওপর।

আগে এখানে কাঠ রাখা হত। মাঝখান থেকে কাঠ সরিয়ে মেঝে খালি করা হয়েছে। জংধরা লোহার আংটা লাগানো পাথরের চাঁই বসানো সেখানে। আংটায় জড়ানো একটা পুরু চেককাটা মাফলার।

অবাক হয়ে মাসগ্রেভ বললে, এ তো ব্রানটনের মাফলার দেখছি। এখানে মরতে এসেছিল কেন?

দুজন পুলিশের সামনে আংটা ধরে পাথরটা টেনে তোলা হল।একা পারলাম না। একপাশে পাথর রেখে অন্ধকার গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল লণ্ঠন।

লম্বায় চওড়ায় চার ফুট আর সাত ফুট গভীর একটা কুঠরির মধ্যে এক কোণে পেতলের পাত দিয়ে মোড়া একটা কাঠের বাক্স দেখলাম। ডালাটা ভোলা। গায়ে চাবি লাগানো–এই সেই চাবি, ওয়াটসন। ধুলো আর ছ্যাতলা লাগানো কাঠে পোকা লেগেছে। কতকগুলো গোলমতো ধাতুর চাকতি–মানে, সেকেলে মুদ্রা ছাড়া বাক্সর ভেতরে আর কিছু নেই। একটা মুদ্রা আমার কাছে রেখেছি–এই দেখ।

সেই মুহূর্তে বাক্সর দিকে কারো নজর যায়নি। দেখছিলাম, বাক্সের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে থাকা একটা নিস্পন্দ মনুষ্য-মূর্তিকে। পরনে কালো সুট। মুখ নীরক্ত নীল। দেখেই চিনতে পারল মাসগ্রেভ। ব্রানটন।

ব্রানটন অন্তর্ধান-রহস্যের সমাধান হল বটে, কিন্তু মাসগ্রেভ-সংহিতা যে-তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। বুঝলাম না, ব্রানটন মারা গেল কীভাবে, র‍্যাচেলের ভূমিকাই-বা কী।

আমার যা পদ্ধতি, তাই করলাম। মনে মনে ব্রানটনের জায়গায় কল্পনা করে দেখলাম কী-কী ঘটতে পারে। ব্রানটন বুদ্ধিমান পুরুষ। পাতাল-কুঠরিতে নিশ্চয় দামি কিছু লুকোনো আছে জানতে পেরে সে একাই সব আত্মসাৎ করবে ঠিক করলে। কিন্তু অতবড়ো পাথর একা সরানো সম্ভব নয়। দোসর চাই। বাড়ির কাউকে বিশ্বাস করা যায় না–একমাত্র র‍্যাচেলকে ছাড়া। র‍্যাচেল তাকে ভালোবাসত। মেয়েদের প্রেম কখনো মরে না–সব পুরুষই তাই ভাবে। মিষ্টি কথায় বশ করে র‍্যাচেলকে নিয়ে সে এল পাতাল-কুঠুরিতে।

কিন্তু একজন মেয়েছেলেকে নিয়ে পেল্লায় এই পাথর সরাতে নিশ্চয় হিমশিম খেয়েছে ব্রানটন। কাজটা সহজ করার জন্যে নিশ্চয় অন্য কায়দার কথা ভাবতে হয়েছে। মেঝের ওপর ছড়িয়ে থাকা কাঠগুলো পরীক্ষা করলাম। চেপটা-হয়ে-যাওয়া কতকগুলো ছোটো কাঠ পেলাম। তারপর একটা ফুট তিনেক লম্বা কাঠের একদিক চেপটে গেছে দেখেই

বুঝলাম কী বুদ্ধি খাঁটিয়েছিল ব্রানটন। ভারী পাথরটা একটু একটু করে টেনে তুলছে আর ফাঁকের মধ্যে কুচো কাঠ ঠেসে ধরেছে। এইভাবে খানিকটা উঠে আসার পর গুড়ি মেরে ও ভেতরে ঢুকেছে, তারপর আংটার গায়ে বড়ো কাঠখানা ঢুকিয়ে পাথরে ঠেসে দিয়ে রেখেছে। অতবড়ো পাথরের সমস্ত ওজন ওই কাঠের ওপর পড়ায় একটা দিক ওইভাবে চেপটে গিয়েছে।

ব্রানটন তো ভেতরে ঢুকল। র‍্যাচেল দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। বাক্স খুলে জিনিসপত্র বার করে র‍্যাচেলের হাতে দিল ব্রানটন। তারপর?

অনেকগুলো সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে এরপরে। কেল্ট্রের উদ্দাম রক্ত বইছে র‍্যাচেলের ধমনীতে। প্রতিশোধস্পৃহা তার অণু-পরমাণুতে। গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে হাতে মূল্যবান সম্পদ নিয়ে সে কি হঠাৎ প্রতিহিংসা কামনায় পাগল হয়ে গিয়েছিল? যে-লোকটির বিশ্বাসঘাতকতায় তার আজ এই অবস্থা, তাকে শায়েস্তা করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে আংটায় লাগানো কাঠটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল? না, আপনা থেকেই কাঠ সরে যাওয়ায় দমাস করে পাথর পড়ে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? জানি না কী ঘটেছিল। এইটুকু শুধু কল্পনা করতে পারি যে জীবন্ত কবর হয়ে গেল লোভী ব্রানটনের। কবরের ভেতর তার গোঙানি আর দমাদম লাথি ঘুসি মারার চাপা শব্দ বেরিয়ে এল বাইরে। আর সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মতো থলি হাতে দৌড়োতে লাগল র‍্যাচেল পেছনে তখন দম বন্ধ মরতে বসেছে তার অভিশপ্ত প্রেমাস্পদ পুরুষ।

এই কারণেই পরদিন সকালে অমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল র‍্যাচেল। হিস্টিরিয়া রুগির মতো কেঁদেছে আর হেসেছে। তারপর পালিয়েছে বাড়ি ছেড়ে। পাথরের নুড়ি আর ধাতুর টুকরো সমেত থলিটা ফেলে গেছে জলার জলে।

পাতাল-কুঠরিতে কুড়ি মিনিট ধরে পুরো ঘটনাটা মনে মনে সাজিয়ে নিলাম। মুখ কালো করে পাশে বসে রইল মাসগ্রেভ।

ব্রানটনের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গর্ত থেকে। লণ্ঠন নামিয়ে বাক্সের মুদ্রাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও বললে, হোমস, সংহিতার রচনাকাল সঠিক আঁচ করেছিলাম। মুদ্রাগুলো প্রথম চার্লসের।

সঙ্গেসঙ্গে সংহিতার প্রথম কথা দুটো বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল মাথার মধ্যে। চিকার করে বললাম, প্রথম চার্লসের আরও সম্পদ এবার তাহলে পাওয়া যাবে। সেই থলিটা কোথায়?

পড়ার ঘরে গেলাম দুই বন্ধু। জল থেকে উদ্ধার করা থলি বার করে ভেতরের জঞ্জালের স্তূপ বার করে রাখল আমার সামনে। ওর ধারণায় ওগুলো জঞ্জালই কোনো দাম নেই। দেখতে অবশ্য সেইরকমই। কালচে মেরে আছে ধাতুর টুকরো, পাথরগুলো ম্যাড়মেড়ে অনুজ্জ্বল। একটা নিয়ে ঘষলাম জামার হাতায়–ভেতর থেকে রোশনাই ঠিকরে এল আগুনের ফুলকির মতো। ধাতুর টুকরোগুলো ডবল রিং-এর আকারে তৈরি। কিন্তু বেঁকিয়ে মূল আকার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, মাসগ্রেভ, রাজার মৃত্যুর পরেও রাজার দল ইংলন্ডে আধিপত্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে যখন দেশ ছেড়ে পালায়, দামি দামি জিনিসপত্র মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল ফিরে বসে ভোগ করার জন্যে।

লাফিয়ে উঠল মাসগ্রেভ, আমার পূর্বপুরুষ র‍্যালফ মাসগ্রেভ দ্বিতীয় চার্লসের১৩ ডান হাত ছিলেন কিন্তু।

আমি বললাম, তাহলে তো হয়েই গেল–সব বোঝা গেল। এবার বুঝেছ তো এগুলো জঞ্জাল নয় মোটেই? এর অর্থমূল্য তো আছেই, তার চাইতেও বেশি হল এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

অবাক হয়ে ও বললে, জিনিসগুলো কী বলে মনে হয় তোমার?

ইংলন্ডের পুরোনো রাজমুকুট।

রাজমুকুট!

হ্যাঁ, রাজমুকুট। সংহিতার প্রথম আর দ্বিতীয় কথাটা মনে করে দেখো। এটা কার? যে গিয়েছে তার।পাবে কে?যে আসবে, সে। অর্থাৎ প্রথম চার্লস খুন হয়েছেন, মুকুটটা তারই। কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস তো আসবেনই মুকুট মাথায় দেবেন তখন।

কিন্তু পুকুরে গেল কীভাবে?

খুলে বললাম, কীভাবে। সব শুনে মাসগ্রেভ বললে, দ্বিতীয় চার্লস ফিরে আসার পর রাজমুকুট তাঁর হাতে গেল না কেন?

জবাবটা কোনোদিনই পাবে না। তিনি জানতেন, দেহ রাখার আগে কাউকে বলে যাননি, অথবা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সংহিতার মাধ্যমে উত্তরাধিকারীকে জানিয়ে গেছেন কোথায় আছে সেই অমূল্য রাজমুকুট। সেই থেকে বংশপরম্পরায় খবরটা সবাই পড়েছেন কিন্তু মানে ধরতে পারেননি। যে পেরেছে, সে এ-বংশের কেউ নয়। প্রাণ দিয়ে অন্যায়

কৌতূহলের দাম দিতে হয়েছে।

ওয়াটসন, মাসগ্রেভ-সংহিতার কাহিনি তো শুনলে। রাজমুকুটটা দেখে যদি চোখ সার্থক করতে চাও তো হার্লস্টোন প্রাসাদে চলে যাও অনেক টাকার বিনিময়ে প্রাসাদেই সেটা রাখার অধিকার পেয়েছে মাসগ্রেভরা। আমার নাম করলেই দেখাবে তোমাকে। র‍্যাচেল মেয়েটার আর খবর পাওয়া যায়নি। পাপের স্মৃতি নিয়ে বোধ হয় ভিনদেশে পালিয়েছে।

———

টীকা

মাসগ্রেভ-সংহিতা : দ্য মাসগ্রেভ রিচুয়াল মে ১৮৯৩ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইংলন্ডে এবং ১৩ মে ১৮৯৩ তারিখের হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় আমেরিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

: ইংলন্ডের তৎকালীন রানি ভিক্টোরিয়ার নামের আদ্যক্ষর। Victoria Regina। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের : 'সোনার দাঁতের রহস্য' কাহিনির টীকা দ্রষ্টব্য।

মন্টেগু স্ট্রিটে : হোমস-গবেষক মাইকেল হ্যারিসন অনুমান করেছেন, হোমসের এই কাল্পনিক বাসাবাড়িটি ছিল রাসেল স্কোয়্যারের ২৬, মন্টেগু স্ট্রিটে। চারতলা বাড়িটি ১৯০০ সাল নাগাদ লন্সডেল হোটেল নিয়ে নেয়।

তৃতীয় কেস : গ্লোরিয়া স্কট যদি প্রথম কেস না হয়, তাহলে প্রথম দুটি কেসের বিবরণ লেখেননি ড. ওয়াটসন।

একই কলেজে : রেজিল্যান্ড মাসগ্রেভের মতো খানদানি পরিবারের সদস্যর সহপাঠী হওয়ার কারণেই বিশেষজ্ঞরা আন্দাজ করেন যে হোমস ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হার্লস্টোনে : হার্লস্টোনকে কল্পনা করা হয়েছে পশ্চিম সাসেক্সের ড্যানি-র কথা মাথায় রেখে। মত প্রকাশ করেছেন একাধিক হোমস-গবেষক।

ফি বছর শিকারের জন্য : ইংলন্ডে শিকারের মরসুম অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস। ওই সময়ে ফেজেন্ট শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে না।

কাগজখানা খুব একটা দরকারি কিছু নয় : দিনের বেলা, যখন রেজিল্যান্ড বাড়িতে থাকে না, তখন কেন ব্রানটন কাগজ আর ম্যাপ মিলিয়ে দেখতে গেল না?

অদ্ভুত ছড়া, বিচিত্র প্রশ্নোত্তর : টি. এস. ইলিয়ট মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল-এ প্রায় একইরকম একটি প্রশ্নোত্তর সংবলিত ছড়া সংযুক্ত করেন। তিনি পরে স্বীকার করেন সেটি মাসগ্রেভ রিচুয়ালের অনুকরণে রচিত।

আছে, আছে সেকেলে বাড়ি তো : আশ্চর্যের বিষয় হল রেজিন্যাল্ড হোমসকে প্রথমেই জানিয়েছিল : বিরাট বাড়ির সর্বত্র খোঁজা হল–চিলেকোঠা থেকে, পাতালঘর পর্যন্ত ওকে পাওয়া গেল না।

প্রথম চার্লস : চার্লস দ্য ফার্স্ট (১৬০০-১৬৪৯) ছিলেন ১৬২৫ থেকে ১৬৪৯ পর্যন্ত ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের রাজা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের ফলে ইংলন্ডে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়।

দ্বিতীয় চার্লস (১৬৩৫-১৬৮৫) : প্রথম চার্লসের হত্যার পর অল্প সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু ১৬৫১-তে উস্টারের যুদ্ধে অলিভার ক্রমওয়েলের কাছে পরাস্ত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন এবং ফ্রান্স, জার্মানি এবং হল্যান্ডে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে থাকতে হয়। ১৬৬০-এ অলিভার ক্রমওয়েলের ছেলে রিচার্ডের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় ব্রিটেনের সিংহাসন ফিরে পান।

প্রাসাদেই সেটা রাখার অধিকার পেয়েছে মাসগ্রেভরা : একাধিক গবেষকের মতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মুকুট থাকবার কথা টাওয়ার অব লন্ডনে। মাসগ্রেভদের প্রাসাদে নয়।

রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার

[দ্য রেইগেট স্কোয়ারস]

১৮৮৭ সালের বসন্তকালে শরীর ভেঙে পড়ে শার্লক হোমসের। শরীরের আর দোষ কী! একটানা ছ-মাস অমানুষিক পরিশ্রম করেছে সে। রোজ পনেরো ঘণ্টা এবং বেশ কয়েকবার একনাগাড়ে পাঁচদিন পর্যন্ত তদন্ত নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। এত ধকল সইবার ক্ষমতা রক্তমাংসের শরীরে থাকে না–হোমসের লৌহকঠিন স্বাস্থ্যও টলে গেছে। যে জন্যে এত পরিশ্রম, সে-কেসে সফল হয়েছে ঠিকই। তিন-তিনটে দেশের পুলিশের ব্যর্থতার পর বিরাট সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে সারা ইউরোপে সাড়াও ফেলেছে; অজস্র টেলিগ্রাম-প্রশংসিকায় ঘরের মেঝে ভরে উঠেছে, নিজে কিন্তু বিছানা নিয়েছে ইউরোপের সবচেয়ে ধুরন্ধর জোচ্চোরকে হারিয়ে দেওয়ার বিপুল আনন্দ সত্ত্বেও।

১৪ এপ্রিল লিয় থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে গেলাম। অসুস্থ হোমসকে তিনদিন পরে নিয়ে এলাম বেকার স্ট্রিটের বাসায়। হাওয়া বদলের দরকার বুঝে ওকে নিয়ে সাতদিন পরে পৌঁছোলাম রেইগেটের আইবুড়ো কর্নেল হেটারের নতুন কেনা বাড়িতে। ভদ্রলোক আমার রুগি ছিলেন আফগানিস্তানে। অনেকদিনের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত রক্ষে করলাম হোমসকে নিয়ে গিয়ে। ভদ্রলোক আইবুড়ো জেনে হোমসও আপত্তি জানায়নি। পরে দেখা গেল, দুজনেই প্রায় একই ধাতে তৈরি।

যেদিন পৌঁছোলাম, সেইদিন সন্ধেবেলা খাওয়া সেরে কর্নেলের হাতিয়ার-সম্ভার দেখছি আমি, এমন সময়ে কর্নেল বললেন, আজ একটা পিস্তল নিয়ে শুতে হবে দেখছি। বিপদ ঘটতে পারে।

কীসের বিপদ? শুধোই আমি।

চোরের। গত সোমবার এখানকার বুড়ো মোড়ল অ্যাক্টনের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। চোর ভাগলবা দামি জিনিস চুরি করতে পারেনি।

হোমস এলিয়ে পড়েছিল সোফায়। এখন বললে, সূত্র পাওয়া গেছে?

না। ইন্টারেস্টিং কোনো বৈশিষ্ট্য?

তেমন কিছুই নয়। লাইব্রেরি তছনছ করে ড্রয়ারগুলো টেনে নামিয়েছে চোরের দল। কিন্তু নিয়ে গেছে পোপের লেখা পুরোনো হোমার বইখানা, এক বান্ডিল টোন সুতো, একটা ছোট্ট ওক কাঠের ব্যারোমিটার, একটা হাতির দাঁতের কাগজ-চাপা, দুটো বাতিদান। মানে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়েই চম্পট দিয়েছে।

হোমস গজগজ করে বললে, গাঁয়ের পুলিশগুলোও হয়েছে তেমনি—

হোমস, এসেছ জিরোতে, নতুন সমস্যায় মাথা গলালে অনর্থ করব বলে দিলাম, হুঁশিয়ার করে দিলাম আমি।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, এত করেও আগলাতে পারলাম না বন্ধুবরকে। পরদিন সকাল বেলা প্রাতরাশ খেতে বসে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

ছুটতে ছুটতে চলল কর্নেলের বাটলার। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে খবর দিলে, কাল রাত বারোটায় চোর পড়েছিল গাঁয়ের জমিদার ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে। গুলি করে খুন করে গেছে কোচোয়ান উইলিয়ামকে।

খবর দিয়ে বাটলার বিদেয় হলে কর্নেল বললেন, বুড়ো ক্যানিংহ্যাম কিন্তু লোক ভালো। শেষকালে তার বাড়িতেও চোর পড়ল।

ফের গজগজ করে উঠল হোমস, অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে আজব জিনিসপত্র চুরি হবার পর একই গ্রামে ফের হানা দেওয়াটা চোরেদের পক্ষে কিন্তু বেশ অস্বাভাবিক আচরণ। ব্যাপারটা তাই ইন্টারেস্টিং।

এ-অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু পরিবার বলতে এই দুটি ফ্যামিলিকেই বোঝায়। তাই চোর হানা দিয়েছে দু-বাড়িতে, বললেন কর্নেল।

টাকাপয়সাও আছে নিশ্চয়? হোমসের প্রশ্ন।

তা তো বটেই। বেশ কয়েক বছর মামলা চলছে দু-পরিবারে। ক্যানিংহ্যামের অর্ধেক সম্পত্তির ওপর দাবি রেখেছে অ্যাক্টন। ফলে পোয়াবারো উকিলদের, দোহন করছে দু-পক্ষকেই।

হাই তুলে হোমস বললে, ভয় নেই ওয়াটসন, আমি নেই এর মধ্যে।

বলতে-না-বলতেই বাটলার এসে খবর দিলে ইনস্পেকটর ফরেস্টার এসেছেন দেখা করতে। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন অল্পবয়সি বুদ্ধি-উজ্জ্বল এক পুলিশ অফিসার। ঢুকেই বললেন, সুপ্রভাত কর্নেল। শুনলাম, মি. শার্লক হোমস আপনার এখানে এসেছেন?

হাত তুলে হোমসকে দেখিয়ে দিলেন কর্নেল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর ইনস্পেকটর বললেন, মি. হোমস, কেসটা হাতে নেবেন কি?

আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল হোমস। বলল, ওয়াটসন, তোমার কপাল খারাপ! বলে এমনভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল যে বেশ বুঝলাম সত্যিই আমার কপাল খারাপ। বলল, খুলে বলুন ইনস্পেকটর।

ইনস্পেকটর বললেন, অ্যাক্টনের বাড়িতে সূত্র পাইনি। কিন্তু ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে পেয়েছি। একই লোকের কীর্তি। তাকে দেখা গেছে।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত পৌনে বারোটার সময়ে ড্রেসিংগাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন মি. আলেক ক্যানিংহ্যাম, ছিলেন খিড়কির দরজার কাছে। হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন উইলিয়ামের সঙ্গে ঝটাপটি করছে একটা লোক। ওঁর সামনেই লোকটা উইলিয়ামের বুকে গুলি করে তিরের মতো ছুটে গিয়ে বাগান পেরিয়ে বেড়া টপকে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। শোবার। ঘরের জানলা থেকে মি, ক্যানিংহ্যামও দেখেছেন তাকে নক্ষত্রবেগে পালিয়ে যেতে। মি. অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম তখন উইলিয়ামকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে খুনির পেছন নিতে পারেননি।

অত রাতে উইলিয়াম কী করতে গিয়েছিল ওখানে?

মরবার আগে তা বলে যেতে পারেনি। লোকটা কিন্তু খুব বিশ্বাসী। নিশ্চয় কোনো কাজ ছিল। ঠিক সেই সময়ে তালা ভেঙে দরজা খুলেছিল চোর।

বাড়িতে কিছু বলে এসেছিল উইলিয়াম?

ওর বুড়ি মা এমনিতে কালা, তার ওপর ছেলের শোকে ভেঙে পড়েছে, সে-রকম কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু একটা দরকারি জিনিস পাওয়া গেছে। এই দেখুন।

বলে, নোটবইয়ের একটা ছেড়া পাতা হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরলেন ইনস্পেকটর, নিহত ব্যক্তির মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে। কোণটা ছিঁড়ে হাতের মুঠোয় থেকে গেছে। যে সময়ের কথা লেখা আছে, উইলিয়াম মারা গেছে ঠিক সেই সময়ে। মনে হয়, কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।

কাগজটা হাতে নিল হোমস। হুবহু প্রতিলিপি দিচ্ছি নীচে :

পৌনে বারোটা নাগাদ
জানতে পারবে যা
হয়তো

ইনস্পেক্টর বললেন, আর একটা সম্ভাবনা থাকছে। উইলিয়াম হয়তো চোর মহাপ্রভুর স্যাঙাৎ। ষড় করে এসেছিল, দরজা ভাঙতে, হাতও লাগিয়েছিল। তারপর কোনো কারণে মারপিট লেগে যায় নিজেদের মধ্যে।

হোমস কিন্তু তন্ময় হয়ে দেখছিল ছেড়া কাগজের কথাগুলো। বললে, যা ভেবেছিলাম, দেখছি তার চাইতেও জটিল ব্যাপার। লেখাটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং।

বলে, দুই করতলে মুখ ঢেকে বসে রইল কিছুক্ষণ। বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞকে এইভাবে চিন্তিত হতে দেখে হাসি ফুটল ইনস্পেকটরের ঠোঁটে।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ছিলে-ছেড়া ধনুকের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গেল হোমস। অবাক হয়ে গেলাম ওর মুখচ্ছবি দেখে। স্বাস্থ্যের আভায় ফের জ্বলজ্বল করছে গাল আর চোখ–প্রাণশক্তি আগের মতোই যেন ফেটে পড়ছে চোখে-মুখে।

বলল সহর্ষে, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চাই। ওয়াটসন, কর্নেল আপনারা একটু বসুন। আমি ইনস্পেকটরের সঙ্গে দেখে আসি ব্যাপারটা।

দেড় ঘণ্টা পরে একা ফিরলেন ইনস্পেকটর। বললেন, মি. হোমস মাঠে বেড়াচ্ছেন। ওঁর ইচ্ছে আমরা চারজনেই যাই মি. ক্যানিংহ্যামের বাড়িতে।

কেন বলুন তো?

বলতে পারব না। ওঁর শরীর এখনও ঠিক নেই বুঝতে পারছি। এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করছেন... একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন।

আমি বললাম, ঘাবড়াবেন না। ওর এই খেপামির মধ্যেই জানবেন তদন্তকৌশল প্রচ্ছন্ন থাকে।

অথবা তদন্তকৌশলটার মধ্যেই খেপামি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, গজগজ করতে লাগলেন ইনস্পেকটর, যাবার জন্যে আর তর সইছে না। সমানে লাফাচ্ছেন। চলুন।

বাইরে বেরিয়ে দেখি প্যান্টের পকেটে দু-হাত পুরে ঘাড় হেঁট করে মাঠে বেড়াচ্ছে হোমস।

কী মশায়, ঘটনাস্থল দেখে এলেন? শুধোলেন কর্নেল।

লাশটা দেখলাম। ইন্টারেস্টিং।

কিছু আঁচ করেছেন মনে হচ্ছে?

যাচাই না-করে কিছু বলা মুশকিল। তবে কি জানেন চোর যে-বেড়া ভেঙে পালিয়েছে, সে-জায়গাটাও খুব ইন্টারেস্টিং। মি. ক্যানিংহ্যাম আর তার ছেলের সঙ্গেও আলাপ করে এলাম।

তদন্তের ফলটা কী হল?

ফল? খুবই অদ্ভুত। আসল রহস্য কিন্তু হাতের মুঠোয় পাওয়া ওই ছেড়া কাগজের মধ্যে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

বাকি অংশটা কোথায়?

নিশ্চয় হত্যাকারীর পকেটে। খুন করে উইলিয়ামের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে পালিয়েছে। পকেটটা খুঁজলেই কাগজ পাব–রহস্যও ফর্দাফাঁই হবে।

তা তো হবে। কিন্তু হত্যাকারীকে পাকড়াও না-করে পকেটে হাত ঢোকাবেন কী করে?

তাও তো বটে। খুবই চিন্তার বিষয়!–আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শুনবেন? পত্রলেখক চিঠিটা নিজে গিয়ে দেয়নি উইলিয়ামকে নিজে গেলে চিঠি লেখার দরকার হত না। চিঠিটা তবে গেল কীভাবে?

ডাকে, জবাব দিলেন ইনস্পেকটর।পিয়োনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কাল বিকেলের দিকে একটা চিঠি পায় উইলিয়াম।

সাব্বাস! সোল্লাসে ইনস্পেকটরের পিঠ চাপড়ে দিল হোমস। আপনার সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। এসে গেছি, এই বাড়িটা।

পুরোনো আমলের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। হোমস আমাদের নিয়ে গেল পেছন দিকে। সেখানে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে একজন চৌকিদার।

হোমস বললে, কর্নেল, এইখানে দাঁড়িয়ে মি. ক্যানিংহ্যামের ছেলে দেখেছিল মারপিট করছে দুজনে। ওই জানলাটায় দাঁড়িয়ে মি. ক্যানিংহ্যাম দেখেছেন ওই ঝোপটা ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে চোর বাপ বেটা দুজনেই দেখেছে ঝোপটা, সুতরাং ভুল হবার জো নেই।

বাড়ির কোণ ঘুরে দুই ব্যক্তি এগিয়ে এল আমাদের দিকে। একজন বয়স্ক। অপরজন তরুণ, আমুদে মুখচ্ছবি, ঝকমকে জামাকাপড়।

কাছে এসেই হোমসকে টিটকিরি দিয়ে ছোকরা বললে, এখনও হাল ছাড়েননি দেখছি। কিন্তু হালে পানি পাবেন বলে মনে হয় না, যা মিটমিটে আপনি। লন্ডনের ডিটেকটিভরা এমন হয় জানতাম না।

তা একটু সময় লাগবে বই কী, বাঁকা সুরে বলল হোমস।

সময় নিয়েও সূত্র পাবেন বলে তো মনে হয় না।

জবাবটা দিলেন ইনস্পেকটর, সূত্র পাওয়া গেছে। হত্যাকারীর, ও কী, মি. হোমস কী হল আপনার?

আচম্বিতে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে ধড়াস করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল শার্লক হোমস। দারুণ ভয় পেলাম আমি। ধরাধরি করে তুলে এনে শুইয়ে দিলাম একটা বড়ো চেয়ারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিয়ে উঠে বসল বন্ধুবর।

লজ্জিত মুখে বললে, কিছু মনে করবেন না। ওয়াটসন মানে আমার শরীর কীরকম ভেঙে পড়েছে। স্নায়ুর জোর কমে গেছে। এমন এক-একটা ধাক্কা আচমকা আসে–সামলাতে পারি না।

গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব? বললেন বুড়ো ক্যানিংহ্যাম।

আরে, না, না। এসেছি যখন, একটা ব্যাপার যাচাই করে যাই।

কী ব্যাপার?

আমার বিশ্বাস, চোর চুরি করে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, উইলিয়াম তখন এসে পড়ে–চুরির আগে নয়।

ব্যঙ্গের স্বরে অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম বললে, অথচ আমরা জানি কিছু চুরি যায়নি।

চোর কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। মামুলি জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। যেমন, অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে নিয়েছে কাগজ-চাপা, বাতিদান, টোন সুতো আর বই। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও আমার খটকা লাগছে। কী বলুন তো? আপনারা দুজনেই তখন জেগে ছিলেন?

হ্যাঁ।

ঘরে আলো জ্বলছিল?

হ্যাঁ।

কোন ঘরে?

ওই যে পাশাপাশি দুটো ঘরের জানলা দেখছেন–ওই ঘরে।

দেখুন মি. ক্যানিংহ্যাম, বাড়িতে লোক জেগে আছে, চোখে দেখবার পরেও চোর কি চুরি করতে সে-বাড়িতে ঢোকে?

বুকের পাটা বেশি থাকলে ঢোকে বই কী।

যাই হোক, আপনি একটা পুরস্কার ঘোষণা করুন। তাতে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে উৎসাহ পাবে প্রত্যেকেই। পঞ্চাশ পাউন্ড দিলেই হবে।

আমি পাঁচশো পাউন্ড দিতে রাজি আছি।

তাহলে তো আরও ভালো। এই নিন, একটা খসড়া করে এনেছি আমি। আপনি দয়া করে একটা সই দিয়ে দিন, কাগজ-পেনসিল বাড়িয়ে দিল হোমস।

বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম ঘোষণাপত্রের বয়ানে চোখ বুলিয়েই বললেন, ভুল লিখেছেন দেখছি। পৌনে এগারোটার সময়ে লিখেছেন কেন? ওটা তো হবে পৌনে বারোটার সময়ে।

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল শার্লক হোমস। মনটা আমারও খারাপ হয়ে গেল ওর এই ভুল দেখে। হোমস এত বড়ো ভুল কখনো করে না কিন্তু স্নায়ুর অবস্থা এতই কাহিল যে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও গুলিয়ে ফেলছে। ইনস্পেকটরের ভুরু বেঁকে গেল বিষম বিরক্তিতে। আর বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল তরুণ ক্যানিংহ্যাম। যাই হোক, বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম তৎক্ষণাৎ ভুলটা শুধরে দিয়ে সই করে কাগজ তুলে দিলেন হোমসের হাতে।

পকেট-বুকে কাগজটা রাখতে রাখতে হোমস বললে, এবার চলুন বাড়ির ভেতরটা দেখা যাক। কিছু খোয়া গেছে কি না দেখি।

ভেতরে ঢোকার আগে দরজাটা খুঁটিয়ে দেখল হোমস। উকো বা শক্ত ছুরি দিয়ে তালা ভাঙা হয়েছে কাঠ পর্যন্ত খুবলে গেছে।

দরজায় খিল লাগান না? শুধোয় হোমস।

দরকার হয় না।

কুকুর রাখেন না?

পেছনে বাঁধা থাকে।

চাকরবাকর শুতে যায় কখন?

দশটা নাগাদ।

উইলিয়ামও?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য! ঠিক কালকেই ওকে অত রাতে বিছানা ছেড়ে আসতে হল! চলুন, মি. ক্যানিংহ্যাম, বাড়িটা দেখান।

তন্ময় হয়ে বাড়ির স্থাপত্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল হোমস। কিছুদূর এইভাবে যাওয়ার পর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম বললেন, খামোকা সময় নষ্ট করছেন। সিঁড়ির শেষে ওই দেখুন আমার আর ছেলের ঘর; আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতেই চোর বাড়ি ঢুকে চুরি করে বেরিয়ে গেল, তা কি হয়?

শ্লেষতীক্ষ্ণ হাসি হেসে পুত্র বললে, নতুন সূত্র ধরুন মশায়, কেঁচে গণ্ডুষ করুন।

ভ্রূক্ষেপ না-করে হোমস বললে, শোবার ঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির সামনেটা একটু দেখা দরকার। এইটা বুঝি আপনার ছেলের ঘর? পাশের ঘরের জানলা থেকে দেখি কদ্দূর দেখা যায়। পাইপ খাচ্ছিলেন এই ঘরে বুঝি? বলতে বলতে নিজেই দরজা খুলে উঁকি মেরে সব দেখল হোমস।

বৃদ্ধ ক্যানিংহ্যাম এবার রেগে গেলেন, আপনার দেখা শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দেখা হয়ে গেছে। মানে, যা দেখতে চাইছিলাম দেখে নিয়েছি। এবার চলুন আপনার ঘরটা দেখা যাক।

বৃদ্ধের পেছন পেছন সবাই ঢুকলাম পাশের ঘরে। জানলার দিকে এগোনোর সময়ে পেছিয়ে পড়ল হোমস, অগত্যা আমিও। আচমকা আমার চক্ষু স্থির করে দিয়ে হোমস ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে টেবিলে বসানো ডিশ ভরতি কমলা আর জলের কুঁজোটা উলটে ফেলে দিল মেঝের ওপর। ঝন ঝন করে ভেঙে গেল কাচের কুঁজো আর ডিশ–কমলা গড়িয়ে গেল ঘরময়।

কী কাণ্ড করলে বল তো ওয়াটসন, ঠান্ডা গলায় আমাকেই ধমকে উঠল হোমস। কার্পেটটার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কমলা কুড়োতে লাগলাম আমি। বেশ বুঝলাম, বিশেষ মতলবে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে বন্ধুবর। আমার সঙ্গে প্রত্যেকেই হাত লাগালেন। কমলা কুড়িয়ে

এনে টেবিলটাকে সোজা করে বসালেন। তারপরেই সবিস্ময়ে বললেন ইনস্পেকটর, একী! মি. হোমস কোথায়?

শার্লক হোমস ঘরে নেই! বেমালুম উধাও!

ভদ্রলোকের মাথায় পোকা আছে মনে হচ্ছে। দেখছি আমি। বাবা, এসো, বাপ-বেটায় হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি, ইনস্পেকটর আর কর্নেল।

ইনস্পেকটর বললেন, মি. অ্যালেক ঠিকই বলেছেন। রোগে ভুগে মাথা বিগড়েছে মি. হোমসের–

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আচমকা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে কেঁপে উঠল সারাবাড়ি, বাঁচাও! বাঁচাও! খুন করে ফেলল!

সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সেই চিৎকার শুনে! এ যে হোমসের আর্তনাদ! হোমস চেঁচাচ্ছে! হোমসকে কেউ খুন করতে যাচ্ছে! উন্মত্তের মতো ধেয়ে গেলাম চাতালে। আর্তনাদ তখন বিষম গোঙানিতে এসে ঠেকেছে। চিৎকার লক্ষ করে একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলাম ড্রেসিং রুমে। মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ে শার্লক হোমস। বুকের ওপর চেপে বসেছে ক্যানিংহ্যাম পিতা পুত্র। ছেলে সর্বশক্তি দিয়ে টুটি টিপছে, বাপ

গায়ের জোরে কবজি মোচড়াচ্ছেন। চক্ষের নিমেষে হোমসকে সরিয়ে নিলাম আসুরিক খপ্পর থেকে। টলতে টলতে বিবর্ণ, বেদম মুখে উঠে দাঁড়াল বন্ধুবর।

খাবি খেতে খেতে বললে, গ্রেপ্তার করুন, ইনস্পেকটর, এঁদের গ্রেপ্তার করুন!

কী অপরাধে?

কোচোয়ান উইলিয়ামকে খুন করার অপরাধে।

ইনস্পেকটর তো অবাক, বলেন কী মি. হোমস!

আরে মশাই, ওঁদের মুখের দিকে তাকান না!

সত্যিই তো। মুখের রেখায় এভাবে অপরাধবোধ প্রকট হয়ে উঠতে কখনো তো দেখিনি! বাপ-বেটা দুজনের মুখই চক্ষের নিমেষে পালটে গিয়েছে। বৃদ্ধ যেন ভেঙে পড়েছেন। ক্ষোভে দুঃখে বিবশ হয়ে পড়েছেন। আর ছেলের স্পর্ধিত মুখচ্ছবি অকস্মাৎ ভয়ংকর বন্য জিঘাংসায় ছেয়ে গেছে—কালো চোখে ঝিলিক দিচ্ছে আদিম হিংস্রতা–বিকৃত বিকট হয়ে গেছে সুন্দর মুখখানা। ইনস্পেকটর একটা কথাও না-বলে বাইরে গিয়ে বাঁশি বাজাতেই ছুটে এল দুজন চৌকিদার।

বললেন, মি, ক্যানিংহ্যাম, আমি নিরুপায়।–ওকী! ওকী! ফেলে দিন, ফেলে দিন। বলতে বলতেই এক ঝটকায় অ্যালেক ক্যানিংহ্যামের হাত থেকে সবে টেনে-আনা রিভলভারটা ছিটকে ফেলে দিলেন মেঝেতে।

সঙ্গেসঙ্গে পা দিয়ে রিভলভার চেপে ধরল হোমস।

বলল, ভালো হল। মামলা চলার সময়ে কাজে লাগবে। আর এই দেখুন, এর খোঁজেই এখানে আসা, বলে একটুকরো দলা পাকানো কাগজ নাড়তে লাগল আমাদের সামনে।

কোণ-ছেড়া চিঠির উধাও অংশটা না? লাফিয়ে উঠলেন ইনস্পেকটর।

হ্যাঁ।

পেলেন কোথায়?

যেখানে ছিল জানতাম, সেইখানে। কর্নেল, ওয়াটসনকে নিয়ে দয়া করে বাড়ি যান। একঘণ্টার মধ্যে খাবার টেবিলে দেখা হবে। আপাতত কয়েদিদের সঙ্গে দুটো কথা বলব!

কথা রাখল হোমস। ঠিক একটার সময়ে খর্বকায় এক বয়স্ক ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকল কর্নেলের ঘরে। ভদ্রলোকের নাম মি. অ্যাক্টন। পরিচয় করিয়ে দিল হোমস, এঁর বাড়িতেই

চোর অত কষ্ট করে হানা দেওয়ার পর অদ্ভুত কয়েকটা জিনিস নিয়ে পগার পার হয়েছিল।

বলল, কর্নেল, রহস্য ব্যাখ্যা করার সময়ে মি. অ্যাক্টনকে সামনে রাখতে চাই। তার আগে একটু ব্র্যান্ডি দিন, সাংঘাতিক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

স্নায়ু খুব চোট খেয়েছে দেখছি।

অট্টহেসে হোমস বললে, ও-ব্যাপারটা যথাসময়ে শুনবেন। একটা কথা আগেই বলে রাখি, সফল গোয়েন্দার উচিত এক ঝুড়ি বাজে আর কাজের তথ্য থেকে ঠিক কাজের তথ্যগুলো বেছে। নিয়ে বাজে তথ্যকে ফেলে দেওয়া–এই ক্ষমতা যে-গোয়েন্দার নেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে উপর্যুপরি ঘটনাস্রোতে চিন্তাধারা বয়ে যায় বিপথে। এই কেসে গোড়া থেকেই আমার মন আটকে গিয়েছিল নিহত ব্যক্তির হাতের মুঠোয় পাওয়া চিঠির কোণটার ওপর। বেশ বুঝেছিলাম, রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওর মধ্যেই।

বিশদ ব্যাখ্যার আগে অ্যালেক ক্যানিংহ্যাম ছোকরার জবানবন্দির একটা বৈষম্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ছোকরা দেখেছে নাকি চোর ওর সামনেই উইলিয়ামকে বুকে গুলি করেই নক্ষত্রবেগে পালিয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে ধরাশায়ী উইলিয়ামের হাতের মুঠো থেকে চিঠি খাবলে নিয়ে সে যায়নি। কে নিল তাহলে? নিশ্চয় অ্যালেক ছোকরা নিজে–কেননা তার বাবা চাকরবাকর নিয়ে নীচে নামার আগে বেশ খানিকটা সময় সে পেয়েছিল। এই বৈষম্যটুকু ইনস্পেকটরের মাথায় আসেনি। কেননা,

উনি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে না–জমিদার কখনো খুনি হয় না। আমি কিন্তু ধরাবাঁধা সিদ্ধান্ত নিয়ে কখনো তদন্তে নামি না–আগে থেকেই অমুকটা অসম্ভব ভেবে বসি না, চোখ কান খোলা থাকে।

যাক, চিঠির কোণটা পরীক্ষা করতে গিয়েই পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। সত্যিই অসাধারণ এই ছেড়া কোণটা। বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ করেছেন?

লেখার ধাঁচটা একটু অদ্ভুত বটে, বললেন কর্নেল।

আরে মশাই, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝবেন, লেখাটা দুজনের হাতে লেখা–একজনের হাতে নয়। বারোটা, পারবে আর যা–এই তিনটে শব্দ বাদবাকি সব শব্দের চেয়ে আলাদা। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করলেই তো রহস্যটা ধরা যায়।

সত্যিই তো! কর্নেলের চোখ কপালে ওঠার দাখিল হল। কিন্তু কেন মি. হোমস? একই চিঠি দুজনে লিখতে গেল কেন?

উদ্দেশ্য শুভ নয় বলে। দুজনের একজন অপরজনকে বিশ্বাস করে না বলে। তাই সে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকেও জড়িয়ে রাখতে। পৌনে, নাগাদ, জানতে আর হয়তো, এই শব্দগুলো যে লিখেছে, মূল চক্রী সে-ই। নাটের গুরু বলতে পারেন।

কী করে বুঝলেন?

হাতের লেখা থেকে চরিত্র ধরা যায়। এইমাত্র যে-শব্দগুলো বললাম, দেখুন সেগুলো কত শক্ত হাতে স্পষ্ট লেখা। আগে সে জোরালো হাতে লিখে গেছে–মাঝে দু-জায়গায় ফাঁক রেখে গেছে। ফলে জায়গা কম থাকায় বারোটা শব্দটাকে বেশ ঠেসেটুসে লিখতে হয়েছে দু-নম্বর চক্রীকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রথম বয়ান রচনা করেছে যে, নাটের গুরু সে–খুনের পরিকল্পনা তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে।

চমৎকার বললেন তো! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মি. অ্যাক্টন।

তারপর দেখুন, হাতের লেখায় যারা বিশেষজ্ঞ, তারা লেখা দেখে লেখকের বয়স সঠিকভাবে আঁচ করতে পারে। বুড়ো হলে হাতের লেখা কাঁপা-কাঁপা হয় ঠিকই, আবার অসুস্থ শরীরে জোয়ান লোকে লিখলেও তাই হয়। এটা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখুন, একজনের হাতের লেখা স্পষ্ট, জোরদার। অপরজনের লেখা যেন মেরুদণ্ড-ভাঙা অথচ স্পষ্ট। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রথমজন যুবাপুরুষ, দ্বিতীয়জন বৃদ্ধ কিন্তু অশক্ত নয়। টয়ের টিকিটা দেখছেন কত স্পষ্ট?

চমৎকার! আবার চিৎকার করে উঠলেন মি. অ্যাক্টন।

এবার আসছি আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। দুটো হাতের লেখায় বেশ মিল আছে। রক্তের সম্পর্ক থাকলে যা হয়–একই ফ্যামিলিতে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে মিল দেখা যায়–এই দুই ব্যক্তির হাতের লেখায় সেই মিল অতি সুস্পষ্ট। যেমন জ। এ-রকম আরও তেইশটা

বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে, কিন্তু সেসব বিশেষজ্ঞের শুনতে ভালো লাগবে, আপনাদের ভালো লাগবে না। যাই হোক, এইসব যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট বুঝলাম চিঠিটার যুগ্ম লেখক ক্যানিংহ্যাম পিতা পুত্র।

ধারণাটা যাচাই করার জন্যে লাশ দেখতে গিয়ে সন্দেহটা আরও দূর হল। অ্যালেক ছোকরা বলেছে ধস্তাধস্তি করতে করতে উইলিয়ামের বুকে গুলি করে চোর। অত কাছ থেকে গুলি করলে পোশাকে বারুদের দাগ থাকত। কিন্তু নিহত ব্যক্তির বুকে সে-দাগ নেই। তার মানে, কম করে চার ফুট দূর থেকে গুলি করা হয়েছে। সুতরাং অ্যালেক ছোঁড়া কাঁচা মিথ্যে বলেছে। আর একটা ব্যাপারে আবার বাপ-বেটা দুজনেই মিথ্যে বলেছে। চোরকে নাকি দুজনেই দেখেছেন বিশেষ একটা ঝোপ পেরিয়ে পালাতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা তলা-ভিজে নালা রয়েছে–অথচ ভেজা কাদায় কারো পায়ের ছাপ নেই। এ থেকেই সন্দেহাতীতভাবে বুঝলাম, ঘটনাস্থলে বাইরের লোক কেউ আসেনি।

এরপর অদ্ভুত এই কাণ্ডকারখানার কারণটা ভাবতে বসলাম। প্রথমেই খটকা লাগল মি. অ্যাক্টনের বাড়ির আজব জিনিসপত্র চুরি যাওয়ার ব্যাপারটায়। কর্নেলের মুখে যখনই শুনলাম মি. অ্যাক্টনের সঙ্গে মি. ক্যানিংহ্যামের মোকদ্দমা চলছে বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে, সঙ্গেসঙ্গে বুঝে নিলাম আসল ব্যাপারটা কী। ক্যানিংহ্যামরা মি. অ্যাক্টনের লাইব্রেরিতে হানা দিয়েছিল দরকারি কোনো দলিল পাচার করার মতলবে।

ধরেছেন ঠিক, সায় দিলেন মি. অ্যাক্টন। কাগজটা কিন্তু সলিসিটরের সিন্দুকে রেখেছিলাম বলেই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা। এ-কাগজ যতক্ষণ আমার কাছে, ততক্ষণ ওদের সম্পত্তির অর্ধেকের ওপর আমার দাবি নস্যাৎ করবার ক্ষমতা কারুর নেই।

মুচকি হেসে হোমস বললে। দলিল না-পেয়ে বেচারিরা হতাশ হয়ে ঠিক করলে যা হয় কিছু চুরি করে নিয়ে যেতে হবে, লোকে যাতে ভাবে ছিঁচকে চোর পড়েছিল বাড়িতে। আমি কিন্তু তাতে ভুললাম না। তাই কোণ-ছেড়া চিঠিখানা উদ্ধার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলাম অ্যালেক ক্যানিংহ্যামেরই ড্রেসিংগাউনের পকেট থেকে, কেননা ড্রেসিংগাউন পরেই ছোকরা খুন করেছে বাটলারকে, মুঠো থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিঠিটা, গুঁজে রেখেছে পকেটে। দল বেঁধে বাড়ি গিয়েছিলাম ওই মতলবেই।

বাড়ির বাইরে দেখা হয়ে গেল ক্যানিংহ্যাম বাপ-বেটার সঙ্গে। ঠিক এই সময়ে বোকার মতো মোক্ষম সুত্রটার কথা বলতে গেলেন ইনস্পেকটর। দেখলাম সর্বনাশ হতে চলেছে! ভেঁড়া চিঠির ব্যাপারটা যদি ওদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে ফেলবে, নয়তো নষ্ট করে ফেলবে। তাই ইনস্পেকটর কথা শেষ করবার আগেই আমি মূর্ছা গেলাম, কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলাম।

বলেন কী মশায়। হাসতে হাসতে বললেন কর্নেল। মূর্ছাটা তাহলে অভিনয়?

তাজ্জব হয়ে আমি বললাম, চমৎকার অভিনয় বলতে হবে। আমি ডাক্তার মানুষ, আমি সুষ্ঠু বোকা বনে গেলাম!

অভিনয় জিনিসটা অনেক সময়ে কাজে লেগে যায়। যাই হোক, সুস্থ হয়ে উঠে বসে আবার একটা চাল চাললাম। কায়দা করে বুড়ো ক্যানিংহ্যামকে বারোটা শব্দ লিখিয়ে নিলাম যাতে চিঠির ছেঁড়া কোণে লেখা বারোটা শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি।

ইস, কী উজবুক আমি! বললাম ক্ষোভের সঙ্গে।

মুচকি হাসল হোমস। বলল, ভায়া ওয়াটসন, আমার সাংঘাতিক ভুল দেখে তুমি যে মরমে মরে গিয়েছিলে, তা তোমার কালো মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। আমি দুঃখিত। যাই হোক, ওপরে গিয়ে ছুতোনাতা করে ঘরে ঢুকে দেখে নিলাম দরজার পাশে ঝুলছে যার খোঁজে আসা, সেই ড্রেসিংগাউন। আপনাদের অন্যমনস্ক করে দেওয়ার জন্যে টেবিল উলটে ফেলে দিয়ে গেলাম ড্রেসিংগাউনের পকেট হাতড়াতে।

ঈপ্সিত বস্তু সবে উদ্ধার করেছি, এমন সময়ে বাঘের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপ-বেটা। আপনারা না-এসে পড়লে নির্ঘাত খুন করে ফেলত আমাকে। এখনও গলা টনটন করছে, কবজি টাটিয়ে রয়েছে। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় অতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল দুই মূর্তিমান।

পরে বুড়ো ক্যানিংহ্যাম পেট থেকে সব কথা টেনে বার করলাম। ছেলেটা খোদ-শয়তান বললেই চলে। হাতে রিভলভার পেলে হয় আত্মহত্যা নয় আর একটা নরহত্যা পর্যন্ত করে বসতে পারে। বুড়োর মুখেই শুনলাম মি. অ্যাক্টনের বাড়িতে ওদের নৈশ অভিযান

উইলিয়াম দেখে ফেলেছিল। পেছন পেছন গিয়েছিল এবং পরে এই নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। সব ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে। অ্যালেক ছোকরার গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। সে দেখলে চোরের আতঙ্কে সারা গা তটস্থ। এই সুযোগে আর একটা চুরির নাটক মঞ্চস্থ করে পথের কাঁটা সরানো যাক। তাই চিঠি লিখে বাটলারকে তাতিয়ে এনে খুন করে ফেলল জলজ্যান্ত মানুষটাকে। রাতের অন্ধকারে মুঠোর মধ্যে চিঠির কোণ যে রয়ে গেল, খেয়াল হয়নি। ড্রেসিংগাউনের পকেটটাও বোধ হয় আর দেখেনি। ও-ব্যাপারে আরও একটু হুশিয়ার হলে তিলমাত্র সন্দেহ করা যেত না এদের।

ভায়া, চিঠির রহস্য এবার ভাঙো, বললাম আমি।

শার্লক হোমস তখন দুটো কাগজের টুকরো পাশাপাশি রাখল আমাদের সামনে।

খিড়কির দরজায় এসো, এমন কিছু জানতে পারবে যা তোমাকে দারুণ অবাক করে দেবে এবং হয়তো তোমার আর অ্যানি মরিসনের অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু এব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না।

হোমস বললে, ফাঁদটা অতি চমৎকার। কিন্তু অ্যালেক, অ্যানি আর উইলিয়ামের মধ্যেকার সম্পর্কটা এখনও অস্পষ্টই রয়ে গেল। যাই হোক, ভায়া ওয়াটসন, ভাগ্যিস তুমি আমাকে গাঁয়ে টেনে এনেছিলে। কী সুন্দর বিশ্রাম হল বল তো? নতুন এনার্জি নিয়ে কালকেই বেকার স্ট্রিটে ফিরব ভাবছি।

———

টীকা

১. রেইগেটের গাঁইয়া জমিদার : দ্য রেইগেট স্কোয়ার্স জুন ১৮৯৩-এর স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয় দ্য রেইগেট স্কোয়ার নামে।স্কোয়ার শব্দটি বহুবচনে পরিবর্তিত হয় মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস গ্রন্থে সংকলন হওয়ার সময়ে। ১৭ জুন ১৮৯৩-এর হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় এই গল্প প্রকাশিত হয় দ্য রেইগেট পাজল নামে।

কর্নেলের হাতিয়ার সম্ভার : কোনো গবেষক অনুমান করেছেন, কর্নেল যেহেতু আফগানিস্তানে ছিলেন, সেইহেতু তাঁর হাতিয়ার সম্ভারের মধ্যে একটি জিজেল বন্দুক থাকা সম্ভব।

পোপের লেখা : আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) হলেন ইংরেজ কবি। ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখাতেও পোপ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার বিখ্যাত রচনা দ্য রেপ অব দ্য লক, অ্যান এসে অন ম্যান, অ্যান এসে অন ক্রিটিসিজম প্রভৃতি। হোমারের রচনা অনুবাদ করেছিলেন পোপ মোট এগারো খণ্ডে। ইলিয়াড ছ-টি খণ্ডে এবং ওডিসি পাঁচ খণ্ডে।

লেখার ধাঁচটা : এই গল্পর ঘটনাকালে (১৮৮৭) ইউরোপে অন্যত্র হাতের লেখা ধরন বিচার সম্পর্কে কিছু গবেষণা শুরু হলেও, ইংলন্ডে তা হয়েছে অনেক পরে। এই বিষয়ে

ফরাসি দেশের জা হিপেলিট মিশের দুই খণ্ডে প্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ। কিন্তু আরও বিখ্যাত রচনা ক্রেপপা-জের্মির লেক্রেচার এ লা ক্যারাটেরে প্রকাশিত ১৮৮৮ সালে। অর্থাৎ এই গল্পর ঘটনার পরবর্তী বছরে।

লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি

[দ্য কার্ডবোর্ড বক্স]

শার্লক হোমসের কাহিনি নির্বাচন করতে গিয়ে একটা বিষয়ে সজাগ থেকেছি বরাবর। চাঞ্চল্যকর ঘটনা যথাসম্ভব পরিহার করেছি–এমন কীর্তিকাহিনি লিখেছি যার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে–আমার এই আশ্চর্য বন্ধুটির অসাধারণ প্রতিভা। সবসময়ে অবশ্য তা সম্ভব হয় না–নইলে সত্যের অপলাপ হয়। নীচের লোমহর্ষক অদ্ভুত ঘটনাটি এইরকমই একটি কাহিনি।

অগাস্টের এক তপ্ত দিবস।* বেকার স্ট্রিটে গা ঢেলে বসে আছি আমি আর হোমস। আফগানিস্তানে থাকার ফলে গরম আমার গা-সওয়া। হোমস কিন্তু সোফায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে সকালের ডাকে আসা একটা চিঠি–বার বার পড়ে চলেছে।

এই সময়ে হোমস আমাকে চমকে দিলে মনে মনে কী ভাবছি তার হুবহু বর্ণনা দিয়ে। পরে অবশ্য বুঝিয়ে দিলে কী করে তা বুঝল শুধু আমার মুখের ভাব আর চোখের চাউনি অনুধাবন করে। (রেসিডেন্ট পেশেন্ট কাহিনি দ্রষ্টব্য।)

তারপর বললে, এই তো গেল আমার চিন্তা পঠন বিদ্যার নমুনা। কিন্তু আজ সকালের খবরের কাগজে একটা আশ্চর্য কার্ডবোর্ড বাক্সর যে-খবরটা বেরিয়েছে, তা এত সহজে

সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না। ক্রয়ডনের ক্রসস্ট্রিট নিবাসিনী মিস কাশিং ডাকে পেয়েছেন বাক্সটা। দেখেছ?

না তো।

এই নাও। জোরে পড়ো বলে সেদিনের খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল হোমস। আমি পড়লাম :

লোমহর্ষক প্যাকেট

ক্রয়ডনের ক্রসস্ট্রিট নিবাসিনী মিস সুশান কাশিংয়ের সঙ্গে অত্যন্ত বিটকেল ধরনের একটা গাড়োয়ানি ইয়ার্কির খবর পাওয়া গেছে নিছক রঙ্গ না হয়ে এর পেছনে কুটিল কোনো ষড়যন্ত্র থাকাও বিচিত্র নয়। গতকাল দুপুর দুটোয় ডাকপিয়োন ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট প্যাকেট দিয়ে যায় তাকে। মোটা দানার নুন ঠাসা একটা কার্ডবোর্ড বাক্স ছিল ভেতরে। বাক্স খুলে মিস কাশিং আঁতকে ওঠেন মানুষের সদ্যকাটা দুটি কান দেখে। তার আগের দিন সকাল নাগাদ বেলফার্স্ট থেকে পাঠানো হয়েছে বাক্সটা। মিস কাশিং পঞ্চাশ বছরের অনূঢ় মহিলা, একা থাকেন, আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব বলতে গেলে কেউ নেই–বাক্সটাকে কে পাঠিয়েছে তাই ধরা যাচ্ছে না। বছর কয়েক আগে পেঞ্জেতে থাকবার সময়ে উনি তিনজন ডাক্তার ছাত্রকে ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বের করে দেন বাড়ি থেকে। পুলিশের সন্দেহ এই তিন ছোকরাই লাশ কাটা ঘর থেকে এই দুটি কান সংগ্রহ করে মিস কাশিংকে

পাঠিয়েছে ধাত ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। এই অনুমানের খানিকটা সম্ভাবনা আছে একটা কারণে : তিন বিটলের মধ্যে একজন নাকি উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের মানুষ মিস কাশিংয়ের যদ্র জানা আছে–বেলফাস্টে থাকে। ইত্যবসরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অন্যতম সুদক্ষ চৌকস ডিটেকটিভ–মি. লেসট্রেড তদন্তভার গ্রহণ করেছেন এবং তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন।

পড়া শেষ হল। হোমস বললে, এই গেল গিয়ে ডেলি ক্রনিক-এর খবর। লেসট্রেডের কাছ থেকে আজ সকালে একটা চিরকুট পেয়েছি। ও লিখেছে : কেসটা খুবই সহজ বলে মনে হয়, নিজেরাই ফয়সালা করে ফেলব এ-বিশ্বাস আছে কিন্তু কোত্থেকে শুরু করব এই নিয়ে একটু ধাঁধায় পড়েছি। বেলফাস্টে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম পার্সেলটা পাঠিয়েছে কোন মহাপ্রভু কিন্তু সারাদিন এত পার্সেল ওদের ওখানে জমা পড়ে যে বিশেষ এই পার্সেল কে এনেছে, তা তাদের মনে নেই। শনাক্ত করাও সম্ভব নয়। হানিডিউ তামাকের আধ পাউন্ড বাক্স এটা দেখে কিছুই ধরা যাচ্ছে না। ডাক্তারি ছাত্রদের অনুমিতিটা আমার কাছে খুবই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি ঘণ্টাকয়েক সময় খরচ করতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গে একটু বসা যেত। আমি সারাদিন হয় অফিস, নয় বাড়িতে থাকব।

কী হে ওয়াটসন, যাবে নাকি? না, গরমে বসে বসে ঝিমোবে?

কিছু একটা করার জন্যে উশখুশ করছি অনেকক্ষণ থেকে।

তাহলে ঘণ্টা বাজিয়ে বুট আনাও, গাড়ি ডাকতে বলল। আমি ড্রেসিং গাউন পালটে চুরুটের বাক্সটা ভরে এলাম বলে।

ট্রেনে যাওয়ার সময়ে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। ক্রয়ডন পৌঁছে দেখলাম লন্ডনের মতো অত ভ্যাপসা গরম নয় ওখানে। চির চটপটে লেসট্রেড হাজির ছিল স্টেশনে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে পৌঁছে গেলাম ক্রসস্ট্রিটে মিস কাশিংয়ের বাড়িতে।

দু-পাশে ইটের তৈরি দোতলা বাড়ির দীর্ঘ সারি। একটা দরজায় টোকা মারতেই কমবয়েসি ঝি এসে দরজা খুলে দিল–নিয়ে গেল সামনের ঘরে। মিস কাশিং কোলের ওপর কাজ করা চাদর বিছিয়ে বসে ছিল পাশের টুলে বাস্কেট বোঝাই রঙিন সিল্ক। ভদ্রমহিলার মুখটি ধীর, শান্ত; চোখ দুটি নিস্তরঙ্গ, বিশাল মাথার দু-পাশ দিয়ে ঝুলছে তেল চকচকে চুলের রাশি।

লেসট্রেড ঘরে ঢুকতেই বললে, বিকট বাক্সটা বারবাড়িতে আছে। দয়া করে নিয়ে যাবেন।

নিশ্চয় নিয়ে যাব মিস কাশিং। এখানে রেখেছিলাম আপনার সাক্ষাতে মিস্টার শার্লক হোমসকে দেখাব বলে।

আমার সাক্ষাতে কেন?

প্রশ্ন যদি করতে চান, তাই।

বললাম তো কিছু জানি না। প্রশ্ন করে কী হবে?

স্নিগ্ধকণ্ঠে হোমস বললে, ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। দেখতেই পাচ্ছি দারুণ বিচলিত হয়েছেন–তাই আর এ নিয়ে কথাবার্তা চাইছেন না।

দেখুন মশাই, আমি নিঝাট জীবনযাপন করি। কারো সাতেপাঁচে থাকি না। খবরের কাগজে আমার নাম বেরোক এ আমি চাই না। পুলিশের হাঙ্গামাও আমার দু-চোখের বিষ। মি. লেসট্রেড, আপনি বারবাড়িতে গিয়ে ওগুলো দেখুন।

বাড়ির পেছনে ছোটো বাগানের শেষে একটা ছাউনিতে ঢুকল লেসট্রেড। বেরিয়ে এল একটা কার্ডবোর্ড বাক্স, খানিকটা ব্রাউন কাগজ, আর একটা সুতো নিয়ে। বাগানের বেঞ্চিতে বসে জিনিসগুলো একে একে পরীক্ষা করল হোমস।

আলোর দিকে সুতোটা তুলে গন্ধ শুকল। বলল, খুবই ইন্টারেস্টিং বস্তু। লেসট্রেড, কী বুঝলে?

আলকাতরা মাখানো হয়েছে সুতোটায়।

হ্যাঁ, আলকাতরায় ডোবানো টোয়াইন সুতো! কাঁচি দিয়ে কেটেছেন মিস কাশিং–দেখছ না একদিকে দু-বার শুয়ো উঠে রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

কোনো গুরুত্বই চোখে পড়ছে না আমার, বললে লেসট্রেড।

গিটটা খোলা হয়নি এবং সেইজন্যেই দেখা যাচ্ছে গিঁটের বিচিত্র চেহারা–পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণেই।

নির্বিকারভাবে লেসট্রেড বললে, তাও দেখেছি। চমৎকারভাবে বাঁধা হয়েছে গিঁটটা।

হাসল হোমস। বলল, সুতো পর্ব তাহলে এখানেই শেষ হল। এবার ব্রাউন কাগজ। কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে জাবড়াভাবে : মিস এস কাশিং, ক্রসস্ট্রিট, ক্রয়ডন। খুব সম্ভব নিব বা ওই জাতীয় চওড়া মুখ নিব দিয়ে লেখা কালিটা খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণির। ক্রয়ডন বানান লিখতে গিয়ে মাঝখানে আগে লিখে পরে কেটে লেখা হয়েছে। কাজেই পার্সেল যে পাঠিয়েছে সে একজন বেটাছেলে–পুরুষালি লেখাটাই তার প্রমাণ পেটে বিদ্যে তেমন নেই, ক্রয়ডনে নতুন এসেছে বলেই শহরের বানানটা পর্যন্ত জানে না। বাক্সটা হলুদ রঙের, হানিডিউ তামাকের আধ পাউন্ড বাক্স, বাঁ-দিকের কোণে স্পষ্ট দুটো আঙুলের ছাপ। পশু চামড়া সংরক্ষণের জন্যে যে ধরনের মোটা দানার নুন ব্যবহার করা হয়, বাক্সের মধ্যেও সেই সস্তা নুন ঠাসা হয়েছে।

বলতে বলতে বাক্স থেকে ভয়ংকর বস্তু দুটো বার করে কোলের ওপর রাখল হোমস। চেয়ে রইল নির্নিমেষে। দু-পাশ থেকে চেয়ে রইলাম আমি আর লেসট্রেড। কান কেটে উপহার পাঠানোর মতো বদ রসিকতা যে করতে পারে, সে যে কী ধরনের রসিক ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে কান দুটো বাক্সতে ভরে ধ্যানস্থ হয়ে চেয়ে রইল হোমস।

অবশেষে বলল, লক্ষ করেছ নিশ্চয় কান দুটো দুজন লোকের–একজনের নয়?

করেছি। লাশটাকে ঘর থেকে জোগাড় করা হয়েছে তো। দুজনের দুটো কান জোগাড় করা ওদের পক্ষেই সম্ভব।

লেসট্রেড এর মধ্যে ইয়ার্কি-টিয়ার্কি একদম নেই।

আপনি ঠিক জানেন?

ডিসেকটিং রুম-এ এ-কান যদি কাটা হত, তাহলে এর গায়ে আরক লেগে থাকত। যাতে পচে না-যায় তাই আরক ডুবিয়ে রাখার নিয়ম আছে ডিসেকটিং রুমে। তা যখন নেই, তখন কোনো ডাক্তারি ছাত্র এর মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া কান কাটা হয়েছে ভোঁতা ছুরি দিয়ে, ডাক্তারি ছাত্র হলে ধারালো ছুরি দিয়ে কাটত। তারপর কার্বলিক বা রেক্টিফায়েড স্পিরিটে ডুবিয়ে রেখে কান পাঠাত–নুনের মধ্যে করে পাঠাত না। না হেনা, এর পেছনে ইয়ার্কি নেই–আছে একটা পৈশাচিক অপরাধ।

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বন্ধুবরের চেয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে লক্ষ করলাম। লেসট্রেড কিন্তু পুরো বিশ্বাস করতে পারল না।

বলল, ঠাট্টা যদি কেউ না করে তো অপরাধই-বা করতে যাবে কেন? ভদ্রমহিলা পেঞ্জেতে নিঝঞ্ঝাটে থেকেছেন অনেক দিন। এখানেও আছেন বিশ বছর-একদিনের জন্যেও বাড়ি ছাড়া হননি। অন্যের কান কেটে তাকে পাঠিয়ে কার কী লাভ বলতে পারেন? মুখ দেখে বুঝছেন না আমাদের মতোই উনিও অন্ধকারে? বড়ো দরের অভিনেত্রী হলে অবশ্য আলাদা কথা।

হোমস বললে, আমি কিন্তু তদন্ত শুরু করব ডবল মার্ডারের ভিত্তিতে। একজন পুরুষ আর একজন নারীকে খুন করা হয়েছে। একটা কান ছোটো, নিখুঁত। লতিতে দুল পরার ছাদা—অর্থাৎ কোনো মেয়ের কান। আর একটা কানেও ছাদা আছে রিং পরানোর জন্যে কিন্তু রোদে পোড়া বেটাছেলের কান। দুজনেই এখন পরলোকে ধরে নিতে পারি–নইলে কান কাটাদের খবর অনেক আগেই কানে আসত। আজ হল শুক্রবার প্যাকেট পাঠানো হয়েছে বেস্পতিবার সকালে। খুনটা হয়েছে বুধবার কি মঙ্গলবার কি তারও আগে। খুন যে করেছে কান দুটো সে-ই উপহার পাঠিয়েছে মিস কাশিংকে–সে ছাড়া অন্য কেউ পাঠাতে যাবে কেন বলতে পার? পার্সেল যে পাঠিয়েছে, খুনও সে-ই করেছে ধরে নিতে পার। কিন্তু মিস কাশিংকে এ-রকম উপহার পাঠানোর পেছনে জবরদস্ত কারণ একটা নিশ্চয় আছে। কী সেই কারণ? কাম ফতে–এইটাই কি জানতে চেয়েছে খুনি? না, শুধুই মানসিক যন্ত্রণা দিতে চেয়েছে? তাহলে তো মিস কাশিংয়ের জানা উচিত লোকটাকে।

কিন্তু সত্যিই কি জানেন উনি? সন্দেহ আছেআমার। জানলে কি পুলিশ ডেকে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে যেতেন? কান দুটো কোথাও পুঁতে ফেললেই ল্যাটা চুকে যেত–কাকপক্ষীও টের পেত না। ক্রিমিনালকে আড়াল করতে চাইলে ঠিক এমনটিই করতেন মিস কাশিং। আড়াল করতে যদি না-চাইতেন, লোকটার নামটা তাহলে বলতেন। এই জটটা আগে পরিষ্কার করা দরকার। বাগানের বেড়ার দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে এতক্ষণ উচ্চ দ্রুত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছিল হোমস। এবার তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

বললে, মিস কাশিংকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

লেসট্রেড বললে, আমি তাহলে ফাড়িতে চললাম। ওঁকে আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই আমার।

স্টেশনে যাওয়ার পথে দেখা করে যাব, বলে হোমস ঢুকল সামনের ঘরে। উদাসীন ভদ্রমহিলার কোলের ওপর চাদর রেখে তখনও ছুঁচের কাজ করছিল তন্ময় হয়ে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সরল নীল চোখে জিজ্ঞাসা তুলে ধরে তাকাল আমাদের পানে।

বলল, পুলিশ ভদ্রলোককে বার বার বলেছি, নিশ্চয় কেউ ভুল করে পার্সেলটা পাঠিয়েছে আমাকে। উনি কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় আমার শত্রু বলে কেউ নেই—কাটা কান পাঠিয়ে রগড় করার মতো কাউকেই জানি না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে,বলে ভদ্রমহিলার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল হোমস। এবং আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ওর কাণ্ড দেখে। তন্ময় হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল মিস কাশিংয়ের মুখশ্রী। যুগপৎ বিস্ময় আর সন্তোষ নৃত্য করে উঠল ওর তীক্ষ্ণ চোখে। হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ দেখার জন্যে মিস কাশিং ঘাড় ঘোরানোর সঙ্গেসঙ্গেই কিন্তু ফের নির্বিকার হয়ে গেল শার্লক হোমস। ভদ্রমহিলার শান্ত মুখশ্রী, তেল চকচকে পরিষ্কার আঁচড়ানো চুল, কানের লতিতে গিল্টি করা ছোটো ইয়ার-রিং দেখে আমি কিন্তু বুঝে উঠলাম না অকস্মাৎ এত উত্তেজিত হল কেন হোমস।

দুটো প্রশ্ন আছে—

আবার প্রশ্ন! খেঁকিয়ে উঠল মিস কাশিং।

আপনার দুজন বোন আছে, তাই না?

আপনি জানলেন কী করে?

ঘরে ঢুকেই জেনেছি। ম্যান্টলপিসের ছবিতে তিন মহিলার একজন আপনি বাকি দুজন নির্ঘাত আপনার আত্মীয়া–চেহারায় মিল রয়েছে।

ঠিক ধরেছেন। সারা আর মেরি আমার বোনই বটে।

আমার কনুইয়ের কাছে এই যে একটা ফটো দেখছি, এটি কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় আপনার ছোটো বোনের ছবি। স্টুয়ার্ডের ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনার চোখ তো দেখছি খুব ধারালো।

আমার ব্যাবসাই যে তাই।

ওই ছবি তোলার দিনকয়েক পরেই বিয়ে হয়ে যায় ওদের। মি. ব্রাউনার তখন সাউথ আমেরিকান জাহাজে কাজ করত। কিন্তু বউ অন্ত প্রাণ হওয়ায় সে চাকরি ছেড়ে লিভারপুল-লন্ডনে জাহাজে কাজ নেয়।

কনকারার জাহাজে নিশ্চয়?

না, মে-ডে জাহাজে। একবার এখানে এসেছিল জিম আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তারপর মদ ধরল। পেটে একটু মদ পড়লে আর রক্ষে থাকত না খ্যাপা ষাঁড়ের মতো যা কাণ্ড করত যে বলবার নয়। ডাঙায় থাকলেই মদ খাওয়া চাই। আমার কাছে আসা বন্ধ হল সবার আগে, তারপর ঝগড়া করল সারার সঙ্গে, এখন তো মেরিও চিঠি লেখা বন্ধ করেছে জানি না কীভাবে আছে ওরা।

প্রসঙ্গটা যে খুবই নাড়া দিয়েছে মিস কাশিংকে, তা বোঝা গেল হঠাৎ তার মুখের আগল খুলে যাওয়ায়। একলা থাকলে মানুষমাত্রেই একটু কম কথা বলে নিজের ঘরের কথা বলতে মুখে আটকায়। কিন্তু প্রাণের প্রসঙ্গ ওঠার মুখে যেন কথার ফোয়ারা ছোটাল মিস কাশিং। কত কথাই না বলল ভগ্নীপতি সম্পর্কে, তারপর বলল তিনি ডাক্তার ছাত্রের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনি–তাদের নাম-ঠিকানা, হাসপাতালের নাম পর্যন্ত বলে গেল গড়গড় করে। প্রত্যেকটা শব্দ খুব মন দিয়ে শুনল হোমস। মাঝে মাঝে টুকটাক শব্দ করে চালু রাখল বাক্যস্রোত।

তারপর বলল, আপনার মেজোবোন সারাও তো বিয়ে-থা করেননি। তা সত্ত্বেও আপনারা দু-বোন এক সংসারে থাকেন না দেখছি।

সারার মেজাজ তো আপনি জানেন না, জানলে এ-প্রশ্ন আর তুলতেন না। নিজের বোন সম্বন্ধে বেশি কথা বলতে চাই না–চিরকালই বড়ো ঝগড়াটে কিছুতেই মন ওঠে না। ক্রয়ডনে এসে ওকে এনে রেখেছিলাম–দু-মাস আগেও ছিল ওখানে কিন্তু একসঙ্গে থাকা গেল না।

লিভারপুলের আত্মীয়দের সঙ্গেও ঝগড়া করেছিল বুঝি?

ওরাই তো এককালে ওর সেরা বন্ধু ছিল বেশ কিছুদিন। এখন তো জিম ব্রাউনারের নামে গালাগাল না-দিয়ে জল গ্রহণ করে না। শেষ ছ-মাস এখানে থাকার সময়ে উঠতে

বসতে শুনেছি জিমের নিন্দে। আসলে সারার কুঁদুলে স্বভাবটা ধরে ফেলেছিল বোধ হয় জিম দিয়েছে আচ্ছা করে রগড়ে। যা বদমেজাজ–রেগে গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

উঠে দাঁড়াল হোমস, ধন্যবাদ মিস কাশিং। খামোখা এ-কেসে আপনাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সারার ঠিকানাটা কী বলুন তো? নিউ স্ট্রিটে, ওয়ালিংটন। গুড বাই।

রাস্তায় বেরিয়েই একটা ছ্যাকড়াগাড়ি ডাকল হোমস। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে জানল ওয়ালিংটন এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে। গাড়িতে উঠে বসে বললে, চলো তাহলে। যাওয়ার পথে টেলিগ্রাফ অফিস হয়ে যাব।

কাকে যেন একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস। বাকি পথটা রোদ থেকে মুখ বাঁচানোর জন্যে নাকের ওপর টুপি টেনে নামিয়ে বসে রইল চুপচাপ। সারা কাশিংয়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে কড়ায় হাত দিল হোমস কিন্তু নাড়বার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল গম্ভীরবদন কৃষ্ণবসন একজন যুবা পুরুষ। মাথায় বেজায় চকচকে টুপি।

মিস কাশিং বাড়ি আছেন? জিজ্ঞেস করল হোমস।

মিস কাশিং এখন শয্যাশায়ী। ভীষণ অসুস্থ। কাল থেকে মস্তিষ্ক প্রদাহে ভুগছেন। আমি তার ডাক্তার। কারো সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব নয়। আপনি দশ দিন পরে আসবেন। বলে হনহন করে রাস্তায় বেরিয়ে গেল যুবক চিকিৎসক।

প্রফুল্ল কণ্ঠে হোমস বললে, দেখা না হলে আর কী করা যায়! চলো যাই।

দেখা হলেও ভদ্রমহিলা কথা বলতে পারতেন কি? বললাম আমি।

কথা বলার জন্যে দরকার হত না–মুখখানা শুধু দেখলেই হত। যাকগে, তারও আর দরকার নেই–বুঝে ফেলেছি। ওহে, একটা হোটেলে নিয়ে চলো। গাড়িতে উঠে বসে গাড়োয়ানকে হুকুম দিল হোমস।

হোটেলে পৌঁছে খেতে খেতে শার্লক হোমস গল্প জুড়ল ওর স্ট্রাডিভেরিয়াস বেহালা নিয়ে। বেহালাটার দাম হওয়া উচিত পঁচিশ গিনি–কিন্তু একজন ইহুদি বন্ধকি কারবারির কাছ থেকে কিনেছে মাত্র পঞ্চান্ন শিলিংয়ে। এই প্রসঙ্গ থেকে এল আশ্চর্য মানুষ পাগানিনির গল্প। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, তখন উঠল জায়গা ছেড়ে। থানায় গেলাম দুই বন্ধু।

একটা টেলিগ্রাম বাড়িয়ে ধরে লেসট্রেড বললে, আপনার টেলিগ্রাম।

জবাব এসে গেছে তাহলে। খামের মুখ ছিঁড়ে চোখ বুলিয়ে দলা পাকিয়ে পকেটে পুরে হোমস বললে, ব্যস, আর কিছু চাই না।

জবর খবর পেয়েছেন মনে হচ্ছে?

সব খবর পেয়েছি বলতে পার।

সেকী! ঠাট্টা করছেন নাকি? ছানাবড়ার মতো চোখ বড়ো বড়ো করে বললে লেসট্রেড। ঠাট্টা কী হে! জীবনে এত সিরিয়াস হইনি। সাংঘাতিক একটা ক্রাইমের সব খবর এখন আমার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু ক্রিমিনালটাকে কি মুঠোয় আনতে পেরেছেন?

হোমস নিজের ভিজিটিং কার্ডের পেছনে কয়েকটা শব্দ লিখে লেসট্রেডের হাতে নিয়ে বললে, এই হল তার নাম। কিন্তু কাল রাতের আগে তাকে ছুঁতে পারবে না। কেসটা জলের মতো সোজা–এর মধ্যে আমার নামগন্ধ যেন না-থাকে–তোমার নাম থাকলেই যথেষ্ট। জটিল কেস ছাড়া কোনো কেসের মধ্যে আমি জড়িত থাকা পছন্দ করি না! এসো ওয়াটসন। বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল লেসট্রেড। দুই চোখ উল্লাসে নাচতে লাগল কার্ডে লেখা কথাগুলো পড়ে।

বেকার স্ট্রিটে বসে চুরুট টানতে টানতে শার্লক হোমস বললে, এই ঘরে বসে চুরুট খেতে খেতেই কেসটার সুরাহা করে ফেলেছিলাম। দু-একটা যা তথ্য এখনও হাতে আসেনি, তা লেসট্রেড বার করে ফেলবে লোকটাকে পাকড়াও করার পর। ওর ঘটে বুদ্ধি কম থাকলেও স্বভাবটা ডালকুত্তার মতো। এই গুণের জন্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এত উন্নতি ও করেছে।

কেস তাহলে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি? বললাম আমি।

প্রায় সম্পূর্ণ বলতে পার। তোমার কী মনে হয়?

জিম ব্রাউনার লোকটাকে তুমি সন্দেহ কর?

সন্দেহ কী হে, তার চাইতেও বেশি।

কিন্তু কেন?

খোলা মন দিয়ে কেসটাকে প্রথম থেকে দেখেছিলাম বলে আগে থেকেই কাউকে সন্দেহ করে বসিনি বলে। মিস কাশিংকে দেখলাম নিরীহ সাদাসিধে শান্ত স্বভাবের মহিলা। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফে দেখলাম তিন বোনের ছবি। দেখেই আঁচ করলাম, বাক্সটা পাঠানো হয়েছে বাকি দুজনের একজনকে। সে জনটি কে, সেটা সঙ্গেসঙ্গে ঠিক করার চেষ্টা না-করে আশ্চর্য বাক্সর ভয়ংকর বস্তু দুটো দেখলাম বাগানে গিয়ে।

আলকাতরা মাখানো এ ধরনের সুতো জাহাজি নাবিকরা ব্যবহার করে, ওই ধরনের বিশেষ জাহাজি গিট দিতে জাহাজি নাবিকরাই অভ্যস্ত। দেখেই নাকে যেন সমুদ্রের হাওয়া লাগল। বাক্সটাও পাঠানো হয়েছে একটা সমুদ্রবন্দর থেকে এবং পুরুষের কানের ছাদা দেখে বুঝলাম বেচারা নিজেও জাহাজে জাহাজে নাবিকের কাজ করেছে—কান ছাদা

তারাই করে রিং পরার জন্যে–ডাঙার পুরুষরা করে না। বুঝলাম, বিকট এই নাটকের সব ক-জন অভিনেতাই সমুদ্রে যাতায়াতের জীবিকা বেছে নিয়েছে।

ঠিকানা লেখা হয়েছে মিস এস কাশিং। বড়োবোনের নাম এস কাশিং ঠিকই। অন্য বোনের নামও এস দিয়ে শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। এই খবরটা জানবার জন্যে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই থমকে গেলাম একটি জিনিস দেখে। তোমার মনে আছে বোধ হয় কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েই থেমে গিয়েছিলাম আমি।

ওয়াটসন, তুমি নিজে ডাক্তার। তুমি জান, মানুষের কানের মতো গড়ন বৈচিত্র্য অন্য কোনো প্রত্যঙ্গে বড়ো একটা দেখা যায় না। এক একটা কান এক-এক ধরনের একটা কান আর একটা কানের সঙ্গে হুবহু মেলে না। গতবছর অ্যানথ্রোপলজিক্যাল জার্নালে এ সম্পর্কে দুটো প্রবন্ধ লিখেছি, পড়ে নিয়ো। মিস কাশিংয়ের কানের দিকে লক্ষ করে তাই অত চমকে উঠেছিলাম, অবাক হয়েছিলাম, খুশি হয়েছিলাম। কার্ডবোর্ডের বাক্সে যে মেয়েলি কান দেখে এসেছি–চোখের সামনে দেখলাম হুবহু সেই কান। ওপর দিকটা সেইরকম চওড়া, লতি সেইরকম ছোটো, ভেতরের তরুণাস্থি সেইরকম বাঁকা–সব দিক দিয়ে একই কান।

পয়েন্টটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তৎক্ষণাৎ তা বুঝেছিলাম বলে সঙ্গেসঙ্গে তাঁর বোনেদের নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। কেননা, কাটা কান যার, নিশ্চয় সে মিস কাশিংয়ের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় এবং খুবই কাছের পরিজন।

অনেক দরকারি খবর বেরিয়ে এল আলোচনার ফলে। জানা গেল, সারা কাশিংয়ের ঠিকানা দু-মাস আগেও একই বাড়িতে ছিল–ভুলটা হয়েছে সেই কারণে। পার্সেল-প্রেরক সারা কাশিংকেই পাঠিয়েছে কাটা কান–সে জানত না সারা আর ও-বাড়িতে নেই। অনেকদিন খবর রাখেনি বলেই সারার ঠিকানা পালটানোর খবর সে পায়নি। তারপর জানলাম, ছোটোবোনের সঙ্গে জিম ব্রাউনারের বিয়ে হওয়ার পর সারা ভগ্নীপতির বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঠেছিল–তারপর ঝগড়া করে চলে এসেছে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখালেখি হয়নি। এ-অবস্থায় যদি ব্রাউনারকে পার্সেল পাঠাতে হয় সারার নামে০০পুরোনো ঠিকানাতেই তা পাঠাতে হবে।

অদ্ভুতভাবে জট পরিষ্কার হয়ে এল এইখান থেকে। জিম ব্রাউনার জাহাজের স্টুয়ার্ড, দারুণ আবেগপ্রবণ, মাথায় ঝোক চেপে বসলে তা করা চাই–বউকে ভালোবাসে বলে ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সেই কারণেই। এর ওপর আছে মদ খেয়ে পাঁড় মাতাল হওয়ার অভ্যেস তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ থেকেই ধরে নিলাম স্রেফ ঈর্ষার বশে নিশ্চয় এই জিম ব্রাউনারই খুন করেছে তার বউকে সেইসঙ্গে জাহাজে কাজ করে এমন একজন পুরুষকে। মিস সারা কাশিংকে কাটা কান দেখতে পাঠানোর কারণ নিশ্চয় এই কুৎসিত ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল সারা নিজে–ভগ্নীপতির বাড়িতে থাকার সময়ে, সেই কারণেই ঝগড়া হয়েছে, আর টিকতে পারেনি। মে-ডে জাহাজ বেলফার্স্ট, ডাবলিন, ওয়ারটারফোর্ড ছুঁয়ে যায়। ব্রাউনার তাই বেলফার্স্ট থেকে বাক্স পাঠিয়েছে সারাকে।

আর একটা সম্ভাবনাও অবশ্য ছিল। জিম ব্রাউনারকে আর তার প্রাণাধিক বউকে খুন করেছে। অন্য কোনো পুরুষ। সম্ভাবনাটা যাচাই করার জন্যে লিভারপুলে আমার বন্ধু

আলগারকে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইলাম মিসেস ব্রাউনার বাড়ি আছে কি না, আর মিস্টার ব্রাউনার মে-ডে জাহাজে বেরিয়ে পড়েছে কি না। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেখা করতে গেলাম সারা কাশিংয়ের সঙ্গে।

আসলে আমি কিন্তু দেখতে গিয়েছিলাম তার কানের গড়নটা। একই বংশে তিন সহোদরার কানই হুবহু একরকম হয় কি না দেখার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। দেখাসাক্ষাৎ হলে খবর-টবরও মিলত নিশ্চয়। কিন্তু শুনলাম, পার্সেল যেদিন এসেছে বড়দির কাছে, সেইদিন থেকেই মস্তিষ্ক প্রদাহে সে বিছানা নিয়েছে। খবরটা সারা ক্রয়ডন জেনে গিয়েছে–কাটা কান কাকে দেখতে পাঠানো হয়েছে, আর কেউ না-বুঝলেও সারা বুঝেছে বলেই প্রচণ্ড আঘাতে বিছানা নিয়েছে। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ না-গেলে তার মুখ থেকে আসল কাহিনি শোনা যাবে না।

কিন্তু আলগারের টেলিগ্রাম পাওয়ার পর তারও আর দরকার নেই। আলগার জানিয়েছেন, মিসেস ব্রাউনারের বাড়িতে তিনদিন ধরে তালা ঝুলছে প্রতিবেশীদের বিশ্বাস সে দক্ষিণে গেছে আত্মীয়দের কাছে। মিস্টার ব্রাউনার মে-ডে জাহাজে ডিউটিতে গেছে। হিসেব করে দেখলাম, আগামীকাল রাতে জাহাজ আসবে টেমস-এ। লেসট্রেড থাকবে সেখানে খুনিকে যোগ্য সমাদর করার জন্যে। সব খবর তখন পাওয়া যাবে।

নিরাশ হতে হল না শার্লক হোমসকে। দু-দিন পরে একটা ভারী লেফাফা এল ওর নামে। ভেতরে লেসট্রেডের লেখা একটা ছোট্ট চিঠির সঙ্গে অনেকগুলো ফুলক্যাপ কাগজে

টাইপ করা সুদীর্ঘ একটা এজাহার। চোখ বুলিয়ে নিয়ে হোমস বললে, লেসট্রেড পাকড়াও করেছে আসল লোককে। শোনো কী লিখেছে।

মাই ডিয়ার হোমস,

যে-থিয়োরিটা আমরা খাড়া করেছিলাম, তা যাচাই করার জন্য গতকাল সন্ধে ছটার সময়ে অ্যালবার্ট ডকে গিয়ে মে-ডে জাহাজে উঠেছিলাম। (ওয়াটসন, লক্ষ করেছ, থিয়োরিটা নাকি আমরা খাড়া করেছি!) খোঁজ নিয়ে জানালাম, জেমস ব্রাউনার নামধারী স্টুয়ার্ড জাহাজ ছাড়ার পর থেকে এমন অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকে যে বাধ্য হয়ে ক্যাপ্টেন তাকে ঘরে বসিয়ে রেখেছে–ডিউটি দেয়নি। ঘরে গিয়ে দেখি লোকটা একটা কাঠের সিন্দুকের ওপর বসে দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সামনে পেছনে একনাগাড়ে দুলছে। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, বিরাট চেহারা, দারুণ গাঁট্টাগোট্টা শরীর–জাল ধোপাকে ধরতে গিয়ে অ্যালড্রিজ আমাদের সাহায্য করেছিল মনে পড়ে?–অনেকটা সেইরকম দেখতে। আমাকে দেখেই এমন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল যে আর একটু হলে বাঁশি বাজিয়ে বসতাম–নদী-পুলিশ বাইরেই ছিল। কিন্তু তার আর দরকার হল না। লোকটা নিজেই দু-হাত বাড়িয়ে দিলে হাতকড়া পরার জন্যে। থানায় এসে ইনস্পেকটরের সামনে নিজে থেকেই এজাহার দিলে। তিন কপি টাইপ করেছিলাম। এক কপি আপনাকে পাঠালাম। গোড়া থেকেই বলেছি আপনাকে কেসটা জলের মতো সোজা। তবে তদন্তে আপনি সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাসহ,

আপনার একান্ত
জি. লেসট্রেড

জলের মতো সোজা কেস! টিপ্পনী কাটল হোমস।কেসটা হাতে আসার সময়ে তা মনে হয়নি। যাকগে ভায়া। জিম ব্রাউনার নিজের জবানিতে কী বলেছে, এবার তা শোনা যাক।

অনেক কথাই বলার আছে–সবই বলব। শোনবার পর ফাঁসি দিতে হয় দিন। থোড়াই কেয়ার করি। এ-কাজ করার পর থেকে চোখ মুদে ঘুমোতে আর পারছি না। জেগে থেকেই অষ্টপ্রহর দেখছি দুটো মুখ। হয় সেই বেটাচ্ছেলেকে, নইলে আমার প্রাণাধিকাকে। বেশির ভাগই দেখছি বউকে। তার নাগরটি ভুরু কুঁচকে মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মেরি তাকিয়ে আছে অবাক চোখে–মৃত্যুকে সামনে দেখে চমকে উঠেছে, অবাক হয়েছে।–যে-চোখে ভালোবাসা ছাড়া কিছু দেখিনি, সে-চোখে এখন দেখছি মৃত্যুভয়।

দোষটা কিন্তু সবটা আমার নয়–সারার। মদ ধরেছিলাম ঠিকই। মদ আমাকে পশু করে তুলত, তাও মানছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেরি আমাকে ক্ষমা করত আমাকে কাছে টেনে নিত–যদি ওই মেয়েছেলেটা অশুভ গ্রহের মতো আমাদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে না-আসত। সারা আমাকে ভালোবাসত শেষকালে সে-ভালোবাসা বিষ হয়ে গেল দারুণ ঘৃণায়। কেননা, সারা জেনেছিল ওর দেহ আর মনের চাইতে স্ত্রীর পদযুগলও আমার কাছে অনেক প্রিয়।

ওরা তিন বোন। বড় বোন সাধ্বী, মেজো একটা আস্ত ডাইনি, ছোটো সাক্ষাৎ দেবী। বিয়ে যখন করি, মেরির বয়স তখন উনত্রিশ, সারার তেত্রিশ। দিনসাতেকের জন্যে সারাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম লিভারপুলের নতুন সংসারে। সাত দিনের জায়গায় একমাস থাকার পর দেখা গেল সারা আমাদেরই একজন হয়ে গিয়েছে।

তখন মদ স্পর্শ করতাম না।

একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিলাম। তখন কি ভেবেছিলাম শেষটা হবে এইরকম?

হপ্তা শেষে প্রায় বাড়ি ফিরতাম। কখনো-সখনো জাহাজে মাল ওঠানো হত একটানা দিনসাতেক–আমি বাড়ি বসে থাকতাম। শ্যালিকাকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখনই। ছিপছিপে তন্বী চটপটে খর প্রকৃতি, দু-চোখে চকচকির ফুলকি, ঘাড় বেঁকিয়ে চলা দেখলেই বোঝা যেত কী ধরনের গরবিনি মেয়েছেলে সে। মেরি থাকলে কিন্তু সারার কথা মনেও পড়ত না। ঈশ্বর সাক্ষী।

মাঝে মাঝে ও যেন আমার সঙ্গে একলা থাকতে চায় আমার সঙ্গে একা বেড়াতে যেতে চায়। কিন্তু এর পেছনে যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ভাবিনি কোনোদিন। কিন্তু একদিন চোখ খুলল আমার। সন্ধে নাগাদ জাহাজ থেকে ফিরে দেখি মেরি বাড়ি নেই। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেছে? সারা বললে, দোকানে টাকা দিতে গেছে। অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম ঘরময়। সারা বললে, জিম, মেরিকে ছেড়ে পাঁচটা মিনিটও কি

থাকতে পার না? লোকে আমাকে নিন্দে করবে না? আমার সঙ্গ কি তোমার একেবারেই ভালো লাগে না? কী যে বল, বলে ওকে ভুলোনার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সামনে। সারা সঙ্গেসঙ্গে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল আমার হাতখানা–সতৃষ্ণ নয়নে চাইল চোখে আমার হাত যেন পুড়ে গেল ওর হাতের উত্তাপে চোখের মধ্যে দিয়ে যেন ছুটে এল কামনার হলকা। নিমেষ মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল ওর অভিপ্রায়। হাত টেনে নিলাম আমি। সেকেন্ড কয়েক কোনো কথা না-বলে পাশে দাঁড়িয়ে রইল সারা। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে দুর, বোকা! বলে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

এরপর থেকেই মনেপ্রাণে আমাকে ঘৃণা করে চলল সারা। পাছে মেরি আঘাত পায়, তাই এ-ব্যাপার ওর কানে তুলিনি। কিন্তু কিছুদিন পরেই লক্ষ করলাম, মেরি যেন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে। সন্দেহবাতিকে পেয়ে বসেছে। কোথায় যাই, কার কাছ থেকে চিঠিপত্র আসে, পকেটে কী থাকে–এইরকম ছোটোখাটো বাজে ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি লেগেই রইল দুজনের মধ্যে। একটু একটু করে দূরত্ব বেড়ে চলল আমার আর মেরির মধ্যে, কিন্তু নিকটত্ব বজায় রইল মেরি আর সারার মধ্যে। নির্বোধ আমি। তখনই বোঝা উচিত ছিল তিল তিল করে মেরির কানে বিষ ঢালছে ডাইনি সারা। একটু একটু করে ওর মন ভেঙে দিয়ে ওকে সরিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। মন আমারও ভাঙছিল। তাই মদ ধরলাম, মেরি যদি তখনও কাছে চলে আসত, মদকে দূরে সরিয়ে দিতাম। মেরি কিন্তু আরও দূরে সরে গেল–তারপর ধূমকেতুর মতো কোত্থেকে এসে জুটল আলেক ফেয়ারবার্ন আরও ঘোরালো হল পরিস্থিতি।

প্রথম প্রথম সারাকে দেখবার জন্যে বাড়ি বয়ে আসত ফেয়ারবার্ন–তারপর আসত আমাদের সবাইকে দেখতে। মানুষের মন জয় করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ওর। আধখানা পৃথিবী সে দেখেছে, আশ্চর্য অভিজ্ঞতার গল্প রসিয়ে বলবার ক্ষমতাও ছিল, দেখতে শুনতেও সুন্দর। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্টি নাবিকদের মধ্যে যা একান্ত বিরল। মাসখানেক যাতায়াত চলল বাড়িতে। ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এর ফলে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে পারে সংসারে। একদিন একটা ব্যাপারে সন্দেহ জাগল। সেইদিন থেকে মন থেকে শান্তি জিনিসটা একেবারেই বিদায় নিল।

ব্যাপারটা ছোট্ট! হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরেছি–ফেরার কথা তখন নয়, বারান্দা পেরিয়ে দরজার কাছে আসতেই দেখলাম সাগ্রহ মুখে এগিয়ে আসছে মেরি। পরক্ষণেই কিন্তু মুখটা অন্যরকম হয়ে গেল আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল অন্যদিকে। বুঝলাম, পায়ের শব্দ ভুল করেছে মেরি। বুকভরা আশা নিয়ে যাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এসেছিল সে আমি নয় অন্য পুরুষ। এবং নিঃসন্দেহে ফেয়ারবার্ন। চক্ষের নিমেষে মাথায় খুন চাপল আমার। রেগে গেলে আমি আমার মধ্যে থাকি না। আমার মুখের চেহারা দেখেই দৌড়ে এসে মেরি কান্না জড়ানো গলায় বললে, জিম, জিম, দোহাই তোমার! আমি শুধু বললাম, সারা কোথায়? ও বললে, রান্নাঘরে। রান্নাঘরে গিয়ে আমি বললাম, সারা, এই ফেয়ারবার্ন লোকটা যেন এ-বাড়ির চৌকাঠ আর না-মাড়ায়। ও বললে, আমার বন্ধু যদি এ-বাড়িতে আদর না-পায়, তাহলে আমাকেও এ-বাড়ি ছাড়া হতে হবে। আমি বললাম, যা খুশি তুমি করতে পার, কিন্তু ফেয়ারবার্ন এ-বাড়িতে ফের এলে তার একখানা কান কেটে তোমাকে পাঠিয়ে দেব আলমারিতে তুলে রাখার জন্যে। আমার মুখ দেখে

ভয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল সারা। মুখের ওপর আর কোনো কথা বলল না। সেই রাতেই চলে গেল বাড়ি ছেড়ে।

কিন্তু এতবড়ো শয়তান মেয়েছেলে আমি আর দেখিনি। আমার মন যাতে মেরির ওপর আরও বিষিয়ে যায়, এই মতলবেই বোধ হয় একটু দূরেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে জাহাজি নাবিকদের ঘর ভাড়া দেওয়া শুরু করল সারা। ফেয়ারবার্ন সেখানেই থাকত। মেরি যেত দিদি আর নাগরের সঙ্গে চা খেতে। কতবার এইভাবে গেছে আমি জানি না। একদিন কিন্তু পেছন পেছন নিয়ে সদর দরজা দিয়ে যেই ঢুকছি, পেছনের বাগানের পাঁচিল টপকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেল ফেয়ারবার্ন। মেরিকে সেইখানেই শাসালাম, ফের যদি ফেয়ারবার্নের সঙ্গে তাকে দেখি, খুন করব নির্ঘাত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল মেরি–দুজনের মধ্যে ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও আর রইল না। আরও বেশি মদ খেতে লাগলাম, আরও বেশি ঘৃণা করতে লাগল মেরি।

লিভারপুলে থেকে পেট চালানো দায় হচ্ছে দেখেই বোধ হয় ক্রয়ডনে বড়দির কাছে ফিরে গেল সারা। তার পরেই গত হপ্তায় ঘটল সব সর্বনাশের শেষ সর্বনাশ।

ঘটল এইভাবে। দিন সাতেকের মধ্যে মে-ডে জাহাজে ডিউটি দিতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু ইঞ্জিনে সামান্য গোলমাল দেখা দেওয়ায় ফিরে আসতে হল জাহাজঘাটায় ঘন্টা বারো মতো নিশ্চিন্তি। তারপর জাহাজ ছাড়বে। বাড়ি ফিরছি আর ভাবছি হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে বউ নিশ্চিয় খুশি হবে। ভাবতে ভাবতে বাড়ির সামনের রাস্তায় যেই

এসেছি, পাশ দিয়ে একটা ছ্যাকড়াগাড়ি বেরিয়ে গেল উলটোদিকে। গাড়ির মধ্যে দেখলাম হাসতে হাসতে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে মেরি আর ফেয়ারবার্ন। ওরা আমাকে দেখেনি। আমি কিন্তু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম সেই দৃশ্য।

বিশ্বাস করুন, সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না। কে যেন আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়েছে। ইদানীং খুব বেশি মদ খাচ্ছিলাম, তার ওপর স্বচক্ষে দেখলাম ওই দৃশ্য। দুয়ে মিলে আমার মধ্যে সব কিছু উলটেপালটে দিল। তখন আমার ব্রেনের মধ্যে সমানে যেন দুরমুশ পড়ছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মগজের মধ্যে আস্ত নায়গারার বজ্রনাদ শুনেছিলাম।

আমার হাতে তখন ওক কাঠের একটা ভারী ছড়ি ছিল। খুন করার জন্যে সেই ছড়ি নিয়ে দৌড়োলাম গাড়ির পেছন পেছন। কিছুদূর দৌড়োনোর পরেই অবশ্য বুদ্ধি খুলে গেল। ওরা যেন দেখতে না-পায়, সেইভাবে ভিড়ের মধ্যে গা মিলিয়ে রেলস্টেশনে এলাম। ওরা নিউ ব্রাইটনের টিকিট কাটল। আমি উঠলাম তিনখানা কামরা পেছনে। ওরা নিউ ব্রাইটন পৌঁছে প্যারেডে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে জল বিহার করতে বেরোল খুব সম্ভব গরমে প্রাণটা আইঢাই করছিল বলে।

কিন্তু এইভাবেই আমার মুঠোয় এসে পড়ল দুজনে। কুয়াশার মধ্যে কয়েকশো গজের বেশি দেখা যাচ্ছিল না। আমিও একটা নৌকো নিয়ে জলে ভাসলাম। ডাঙা থেকে মাইলখানেক দূরে এসে ওদের ধরে ফেললাম। কুয়াশার জন্যে দেখতে পায়নি আমি পেছন পেছন আসছি। হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ভূত

দেখার মতো চমকে উঠল দুজনেই, দাঁড় তুলে আমাকে মারতে গেল ফেয়ারবার্ন। ওর আর দোষ কী–আমার চোখে নিজের মৃত্যু দেখেছিল বলেই বাঁচতে গিয়েছিল আমাকে মেরে। আমি পাশ কাটিয়ে মার বাঁচিয়ে ছড়ির এক ঘায়ে পিণ্ডি পাকিয়ে দিলাম মাথাটা। মেরিকে ছেড়ে দিতাম কিন্তু মরা ফেয়ারবার্নকে জড়িয়ে ধরে আলেক বলে কেঁদে উঠতেই ছড়ি বসিয়ে দিলাম ওর মাথাতেও। শেষ হয়ে গেল দুজনে। আমার মাথায় তখন খুন নাচছে–সারাকে সামনে পেলে তারও ঘিলু বার করে ছাড়তাম। ছড়ি রেখে ছুরি বার করে দুজনের একটা করে কান কাটলাম সারাকে ভেট পাঠাব বলে–দারুণ আনন্দ হল কাটা কান দেখে সারার মুখের অবস্থাটা কল্পনা করে তার নষ্টামির জন্যেই আজ খতম হয়ে গেল দু-দুটো মানুষ। তারপর লাশ দুটোকে একসঙ্গে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে, নৌকোর তক্তা ভেঙে জলে ডুবিয়ে দিলাম। জানি তো নৌকো ফেরত না-এলে মালিক ভাববে বুঝি কুয়াশায় দিকভ্রষ্ট হয়ে বারদরিয়ায় ভেসে গেছে নৌকো। গা থেকে রক্ত আর ঘিলু ধুয়ে ফিরে এলাম ডাঙায়, উঠলাম নিজের জাহাজে। কাকপক্ষীও টের পেল না কী করে এলাম সমুদ্রে। সেই রাতেই সারার জন্যে প্যাকেট বেঁধে পরের দিন পাঠিয়ে দিলাম বেলফার্স্ট থেকে।

এই হল সব ব্যাপার কিছু লুকোলাম না। এখন যা খুশি করতে পারেন আমাকে নিয়ে, ফাঁসিও দিতে পারেন কিন্তু যে-শাস্তি পেয়ে গেছি, তার সমান শাস্তি আর দিতে পারবেন না। চোখ বন্ধ করতে পারি না। করলেই দেখি ওরা দুজনে আমার দিকে পালা করে তাকিয়ে আছে–কুয়াশার মধ্যে থেকে হঠাৎ আমার নৌকো বেরিয়ে আসতে দেখে যেভাবে তাকিয়েছিল–ঠিক সেইভাবে। ওদের আমি চোখের পলক ফেলবার আগে মেরেছিলাম, ওরা আমাকে মারছে। তিলেতিলে। এভাবে আর একটা রাত কাটাতে হলে কাল

সকালেই হয় পাগল হয়ে যেতাম, না হয় মারা যেতাম। আমাকে একলা রাখবেন না জেলখানায়–দোহাই আপনাদের।

কাগজগুলো আস্তে করে নামিয়ে রেখে ধীর গম্ভীর স্বরে হোমস বললে, ওয়াটসন, এই শোক দুঃখ খুনোখুনি আতঙ্কর শেষ কোথায় বলতে পার? চক্রবৎ এই পরিবর্তনের শেষ কি নেই? শেষ যদি না হয়, বিশ্বসংসারের শেষ পরিণতিটাও যে ভাবা যায় না। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি কোনোদিনই খেই খুঁজে পাবে না চিরন্তন এই রহস্যের।

———-

* কন্যান ডয়ালও ভুল করলেন। মেমোয়ার্স অফ শার্লক হোমস গ্রন্থে রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পের শুরু করেছেন হুবহু এইভাবে। অগাস্টের এক তপ্ত দিবস না-বলে আরম্ভ করেছেন অগাস্টের এক বাদলা দিন বলে। তারপর হোমসের পর্যবেক্ষণ শক্তির নমুনা দেখাতে গিয়ে যে-ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, সেটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় বর্তমান কাহিনির সঙ্গে। খুবই আশ্চর্য ভুল। কী করে ডয়ালের চোখ এড়িয়ে গেল বোঝা যাচ্ছে না। পুনরুক্তি করলাম না সেই কারণেই। অনুগ্রহ করে পাঠক রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পটিকে দেখে নেবেন।–অনুবাদক

———-

টীকা

লোমহর্ষক প্যাকেটের মর্মান্তিক কাহিনি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কার্ডবোর্ড বক্স স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং হার্পার্স উইকলির ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়। এটি মেমোয়ার্স অব শার্লক হোমস সিরিজে সিলভার ব্লেজ গল্পের ঠিক পরে এবং ইয়েলো ফেস গল্পের আগে রচিত এবং প্রকাশিত হলেও কোনো কারণে স্যার আর্থার এটিকে মেমোয়্যার্স অব শার্লক হোমস গ্রন্থে সংকলিত করেননি। অথচ বইটির প্রথম মার্কিন সংস্করণে এটিকে রাখা হলেও ওই প্রকাশনের পরবর্তী সংস্করণ এই গল্প বাদ দিয়ে প্রকাশিত হয়। গল্পটিকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না-করার কারণ হিসেবে অনেক গবেষক মনে করেন এই কাহিনিতে পরকীয়া প্রেম জাতীয় প্রাপ্তবয়স্ক উপাদানের উপস্থিতি।

রেসিডেন্ট পেশেন্ট কাহিনি দ্রষ্টব্য : এই গল্পটি গ্রন্থে সংকলিত না হওয়ায় লেখক সজ্ঞানে এই অংশটিকে রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পে জুড়ে দেন।

ক্রয়ডন : সাধারণভাবে বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত এই অঞ্চলে ১৯২০ সালে লন্ডনের প্রথম বিমানবন্দরটি স্থাপিত হয়।

পেঞ্জে : শার্লক হোমসের সমকালে লন্ডনের মফস্সল এলাকা। বর্তমানে বৃহত্তর লন্ডনের অংশভুক্ত। শেরিং ক্রস থেকে দূরত্ব মাইল সাতেক।

হানিডিউ তামাক : কৃত্রিমভাবে মিষ্টি যুক্ত করা তামাক। যেমনভাবে এদেশে গুড় দিয়ে তামাক মিষ্টি করা হয়ে থাকে।

ডিসেকটিং রুম : শব ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ঊনবিংশ শতকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্যন্ত ইংলন্ডে শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া অপরাধীদের দেহই ব্যবচ্ছেদ করতে পারতেন ডাক্তার বা ডাক্তারির ছাত্ররা। ফলে মৃতদেহের অভাবে চুরি করা মৃতদেহ কালোবাজারে বিক্রির ব্যাবসা ফেঁদেছিল একদল লোক।

মে-ডে জাহাজ : কনকারার এবং মে-ডে, এই দুটি জাহাজই ছিল সেকালের লিভারপুল, ডাবলিন অ্যান্ড লন্ডন স্টিম প্যাকেট কোম্পানির মালিকানাধীন।

স্ট্রাডিভেরিয়াস : প্রথম খণ্ডে আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য।

পাগানিনি : ইতালির জেনোয়া শহরের বাসিন্দা নিকোলো পাগানিনি (১৭৮২-১৮৪০) অল্পবয়স থেকেই ছিলেন সংগীত জগতের বিস্ময়। ভায়োলিনবাদক হিসেবে বিশ্বখ্যাত হলেও তিনি গান গাইতেন এবং পারদর্শী ছিলেন গিটার এবং ভায়োলা বাদনেও।

অ্যানথ্রোপলিক্যাল জার্নাল : এই জার্নাল বাস্তব হলেও এ-ধরনের কোনো লেখা এখানে প্রকাশিত হয়নি। বরং স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯৩-এর অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যায় এই বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অ্যালবার্ট ডক : রয়্যাল ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট ডক-এর চলতি নাম অ্যালবার্ট ডক।

নিউ ব্রাইটন : আইরিশ সাগরের তীরে, উইরাল উপদ্বীপের উত্তরতম প্রান্তে ওয়ালসি শহরের অংশভুক্ত নিউ ব্রাইটন বিখ্যাত সাগরতীরের পর্যটন ক্ষেত্র বা সি-রিসর্ট হিসেবে। পূর্বতন ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দীঘার সঙ্গে ব্রাইটনের তুলনা করতেন।

শার্লক হোমস বিদায় নিলেন

[দ্য ফাইনাল প্রবলেম]

আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে শার্লক হোমসের এই শেষের কাহিনি লিখতে। বিধাতা তাকে অনেক প্রতিভা দিয়ে এ-সংসারে পাঠিয়েছিলেন। তার সেই অসাধারণ ক্ষমতার কিছু কিছু অসংলগ্ন এবং অপর্যাপ্তভাবে এর আগে লিখেছি। কাহিনিমালা শুরু হয়েছিল স্টাডি ইন স্কারলেট মামলায় নেভাল ট্রীটি কেসে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। এরপর আর কিছুই লিখব না ঠিক করেছিলাম। যে-ঘটনার ফলে আজ আমার জীবন শূন্য হয়ে পড়েছে, দীর্ঘ দু-বছরেও তা নিয়ে এক লাইন লেখারও আর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কর্নেল জেমস মরিয়ার্টিং পত্র-মারফত যেভাবে তার ভাইয়ের স্মৃতিচারণ শুরু করেছেন এবং তার পক্ষ নিয়ে কথার জাল বুনে চলেছেন যে বাধ্য হয়ে আমাকে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে। ঠিক কী ঘটেছিল, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। দেখছি, তা গোপন রেখেও আর লাভ হচ্ছে না। যদ্দূর জানি, এ-সম্পর্কে তিনটে বিবরণ বেরিয়েছিল আজ পর্যন্ত। ১৮৯১ সালের ৬ মে তারিখে জার্নাল দ্য জেনেভয়ের খবর, ৭ মে তারিখে ইংরেজি কাগজে রয়টার পরিবেশিত সংবাদ, এবং কর্নেল জেমস মরিয়ার্টি লিখিত পত্রাবলি–যার কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। প্রথম দুটো নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তৃতীয়টি সত্যের অপলাপ–ঘটনার বিকৃতিকরণ। তাই ঠিক করেছি এই প্রথম দেশের লোককে জানাব প্রফেসর মরিয়ার্টি এবং শার্লক হোমসের মধ্যে ঠিক কী ধরনের সংঘাত লেগেছিল শেষের সেই দিনগুলিতে এবং শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল।

বিয়ের পর হোমসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কমে এসেছিল বটে, কিন্তু গোলমেলে কেসে সঙ্গীর দরকার হলেই ও আমাকে টেনে নিয়ে যেত বাড়ি থেকে। তারপর তাও কমে এল। ১৮৯০ সালে মাত্র তিনটি কেসে তার সান্নিধ্য পেলাম। ওই বছরের শীতকালে ফরাসি সরকার নিয়োজিত দুটি মামলায় সে এমন জড়িয়ে পড়ল যে খবরের কাগজের খবর থেকে বুঝলাম খুব তাড়াতাড়ি তার দর্শন আর পাব না এবং দীর্ঘকাল তাকে ফ্রান্সেই থাকতে হবে। তাই ২৪ এপ্রিল সন্ধের পর আমার চেম্বারে তাকে লম্বা পা ফেলে ঢুকতে দেখে সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। দেখলাম, দারুণ। ফ্যাকাশে মেরে গেছে আগের চেয়ে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও বুঝে নিলে আমার মনের কথা। বললে, আরে হ্যাঁ, কাজের চাপে নাওয়াখাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছি না। ভায়া, জানলার খড়খড়িটা নামিয়ে দিলে অসুবিধে হবে?

বলে, দেওয়ালে পিঠ ঘষটে এগিয়ে গিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল হোমস।

খুব আতঙ্কে আছ দেখছি? বললাম আমি।

তা আছি।

কীসের আতঙ্ক?

এয়ার গানের।

মাই ডিয়ার হোমস, কী আবোল-তাবোল বকছ!

ভায়া ওয়াটসন, ছায়া দেখে চমকে ওঠা আমার কোষ্ঠিতে লেখেনি–তা তুমি জানো। কিন্তু আসন্ন বিপদকে অবহেলা করার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই। যাক গে, দেশলাইটা ধার দেবে? সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দু-চার টান মেরে যেন অনেকটা সহজ হল হোমস।

বললে, এক্ষুনি কিন্তু তোমার বাগানের পেছনের পাঁচিল টপকে পালাব।

কী ব্যাপার বল তো?

উত্তরে আলোর সামনে হাত বাড়িয়ে ধরল হোমস। দেখলাম দুটো আঙুলের গাঁট ফেটে গেছে এবং রক্ত ঝরছে।

কী বুঝলে? খুব একটা হালকা ব্যাপার তাহলে নয়? বউ কোথায়?

বাড়ি নেই। দিনকয়েকের জন্যে বাইরে গেছে। তাই নাকি!

তাহলে চলল আমার সঙ্গে হপ্তাখানেক ইউরোপ বেড়িয়ে আসবে।

কোথায়?

যেদিকে দু-চোখ যায়।

এ তে বড়ো রহস্যজনক ব্যাপার! লক্ষ্যহীনভাবে ছুটি কাটানোর ধাত শার্লক হোমসের নেই। ফ্যাকাশে মুখ, শুকনো আকৃতি দেখেও মনে হচ্ছে মানসিক উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছেছে, নার্ভ টান-টান হয়ে রয়েছে। আমার নীরব প্রশ্ন চোখের ভাষায় পড়ে নিয়ে হাঁটুতে কনুই রেখে বসল ও, আঙুলের ডগাগুলো এক করে বুঝিয়ে বলল, কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে কাটছে তার দিবস-নিশির প্রতিটি মুহূর্ত।

বলল, প্রফেসর মরিয়ার্টির নাম কখনো শুনেছ?

জন্মেও না।

এ-ব্যাপারেরও মজাই তো সেখানে। একেই বলে প্রতিভা! সারালন্ডন ছেয়ে আছে সে, অথচ কেউ তার নাম শোনেনি। অপরাধ ইতিহাসের তুঙ্গে পৌঁছেছে সে শুধু এই কারণেই। ওয়াটসন, এই দুষ্ট ব্রণটিকে যদি সমাজ থেকে নির্মূল করতে পারি, তাহলেই বুঝব আমার কর্মজীবনে চূড়ান্ত সাফল্য এসেছে। অবসর নিয়ে তখন বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতেও আপত্তি নেই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারের মামলা আর ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সমস্যা সমাধান করে যে-অবস্থায় পৌঁছেছি, তাতে বাকি জীবনটা রাসায়নিক গবেষণা নিয়ে পরম শান্তিতে মনের সুখে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শান্তি

আমি পাব না, সুখে দিন আমার কাটবে না—যদ্দিন জানব প্রফেসর মরিয়ার্টির মতো একটা দুরাত্মা বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে লন্ডনের পথেঘাটে—তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতোও কেউ নেই এ-শহরে।

কিন্তু সে করেছে কী?

অসাধারণ তার কর্মজীবন। সদ্বংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভাবান। অঙ্কে অমন মাথা কোটিতে গুটি পাওয়া যায়। একুশ বছর বয়েসে বীজগণিতের বাইনোমিয়াল থিয়োরেম নিয়ে আশ্চর্য এক প্রবন্ধ লিখে টনক নড়িয়েছে পাকা গণিতবিদদের প্রবন্ধটা স্বীকৃতি পেয়েছে সারাইউরোপে। এই প্রবন্ধের জোরেই ছোটোখাটো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছিল। কিন্তু পৈশাচিক কাজ করার ঝোক পেয়েছিল সে জন্মসূত্রে, রক্তে লুকিয়েছিল একটা ক্রূর অপরাধী, একটা শয়তানি প্রবৃত্তি। গাণিতিক প্রতিভায় তা বিলুপ্ত না হয়ে বিপজ্জনকভাবে বেড়ে ওঠে। অসাধারণ মানসিক শক্তির দৌলতে কুটিল কাজ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেল সীমাহীনভাবে। অনেক রকম ভয়ংকর কথা শোনা যেতে লাগল তার সম্পর্কে। শেষকালে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে চলে এল লন্ডনে। সেনাবাহিনীর শিক্ষণ উপদেষ্টা হয়ে জাঁকিয়ে বসল শহরে। সাধারণ মানুষ তার চাইতে এর বেশি খবর রাখে না। কিন্তু আমি তোমাকে যা বলব, তা আমি নিজে খুঁজে পেতে জানতে পেরেছি।

ওয়াটসন, বিরাট এই শহরের অপরাধী মহলের নাড়িনক্ষত্রের খবর আমি রাখি। আমার চাইতে উঁচু মহলের অপরাধীদের খবর আর কেউ রাখে না। অনেকদিন ধরেই আঁচ

করছিলাম, একটা অদৃশ্য শক্তি প্রচ্ছন্ন থেকে যেন সুতো ধরে নাচিয়ে চলেছে লন্ডনের বাঘা বাঘা অপরাধীদের। সে ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু তার পরিকল্পনা মতোই সব হচ্ছে। খুন, ডাকাতি, জালিয়াতি ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধের পেছনে বার বার এই প্রচণ্ড শক্তির অস্তিত্ব আমি টের পেয়েছি। দেখেছি, আইনের খপ্পর থেকে বার বার এই শক্তি অপরাধীদের রক্ষে করে এসেছে। যেসব মামলা আমার হাতে আসেনি, সেসবের মধ্যে এই প্রাণশক্তির খেলা আমি টের পেয়েছি। অনেক চেষ্টা, অনেক কষ্টের পর বিপদকে পদে পদে অতিক্রম করে আমি এই নাটের গুরুটির সন্ধান পেয়েছি। এই সেই বিখ্যাত প্রফেসর মরিয়ার্টি।

ওয়াটসন, অপরাধ দুনিয়ার সম্রাট নেপোলিয়ন বলতে গেলে প্রফেসর মরিয়ার্টিকেই বোঝায়। মাকড়সার মতো জাল পেতে সে ঠিক মাঝখানটিতে বসে থাকে। নিজে নড়ে না, কিস্‌সু করে না–শুধু পরিকল্পনা করে। বিশাল সংগঠনের অগুনতি অপরাধী তার চক্রান্ত অনুসারে একটার পর একটা অপরাধ করে বেড়ায়। যদি ধরা পড়ে, এই প্রফেসরই টাকা ছড়িয়ে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারে না নাটের গুরুটি আসলে কে। তার বিরাট সংগঠনের অসাধ্য কিছু নেই। যেকোনো কুকাজ করতে তারা পোক্ত। কাউকে খুন করার দরকার হলে, কারো ঘর তল্লাশির প্রয়োজন হলে বা মূল্যবান দলিলপত্র উধাও করে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে শুধু প্রফেসরকে খবর দিলেই হল। নিজের লোক দিয়ে সুচারুভাবে কুকর্মটি করিয়ে দেবে সে। ধরা পড়লে খালাস করেও আনবে। ওয়াটসন, আমার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি আর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে তিল তিল করে এগিয়ে দুস্তর বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে

শয়তান শিরোমণি এই প্রফেসরের নাগাল আমি ধরেছি–এখন উঠে-পড়ে লেগেছি দেশের ললাকের সামনে এর মুখোশ খুলে সংগঠনটা সমূলে উৎপাটন করতে।

কিন্তু মহাধড়িবাজ এই প্রফেসর নিজেকে হাজার গণ্ডির মধ্যে এমন আগলে রেখে দিয়েছে, কাছে যায় কার সাধ্য। আইনের চোখে সে নির্দোষ। কোনোরকমভাবেই তার অপরাধ আদালতে প্রতিপন্ন করা যায় না। তিন মাস একনাগাড়ে আমি সাক্ষ্য আর প্রমাণ খুঁজেছি যাতে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে দায়রা সোপর্দ করতে পারি। এই তিন মাসে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, বুদ্ধির যুদ্ধে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে যদি কেউ দুনিয়ায় থাকে, তবে সে এই প্রফেসর মরিয়ার্টি। আমার অসাধ্যসাধনের ক্ষমতার কথা তুমি তো জান ভায়া, কিন্তু আমাকেও বারে বারে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে মহা-ধুরন্ধর পিশাচ-শ্রেষ্ঠ কুটিল-সম্রাট প্রফেসর মরিয়ার্টি। কিন্তু মানুষমাত্রই ভুল করে, তা সে যত বড়ো প্রতিভাবানই হোক না কেন। প্রফেসরও ছোট্ট একটা ভুল করে বসল একদিন। সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে আমি তার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছি, চারধারে জাল গুটিয়ে এনেছি, ছোট্ট কিন্তু মারাত্মক ভুলের দৌলতেই আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার দলের সবকটা রাঘব বোয়ালকে একসঙ্গে টেনে তুলব–ধর সামনের সোমবারেই দলবল সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়বে প্রফেসর মরিয়ার্টি এবং শুরু হবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ফৌজদারি মামলা পরিষ্কার হয়ে যাবে চল্লিশটা জটিল রহস্য এবং গলায় দড়ি পড়বে সবকটা বাছাধনের। কিন্তু সামান্য তাড়াহুড়ো করলেই ওরা হাত ফসকে পালাতে পারে শেষ মুহূর্তেও।

সব ভালো হত যদি এত কাণ্ড প্রফেসরের অজ্ঞাতসারে করতে পারতাম। কিন্তু লোকটা এত ধড়িবাজ যে বলবার নয়। তাকে জালে ফেলবার জন্যে আমি যা-যা করেছি, তার প্রতিটি সে লক্ষ করেছে এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো আমি অন্য দিক দিয়ে তাকে ধরেছি। নীরব এই দ্বন্দ্বের কাহিনি যদি কোনোদিন লেখা হয়, দেখবে গোয়েন্দাগিরির ইতিহাসে এ-রকম গৌরবময় বুদ্ধিসমুজ্জ্বল ঘটনা আর দ্বিতীয়টি নেই। বুদ্ধির খেলায় এত চমক আমি কখনো দেখাতে পারিনি বারে বারে এভাবে পর্যুদস্তও কখনো হইনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর হতে এ-রকম নাকানিচোবানি কখনো খাইনি। সে যত গভীরে তলিয়েছে, আমি তার চাইতেও গভীরে ডুব দিয়েছি। আজ সকালেই শেষ ব্যবস্থা সাঙ্গ হয়েছে আর মাত্র তিন দিনের মধ্যেই লীলাখেলা শেষ হবে প্রফেসরের। ঘরে বসে এইসব ভাবছি, এমন সময়ে দরজা খুলে আমার সামনে এসে উড়াল স্বয়ং প্রফেসর মরিয়ার্টি।

ওয়াটসন, আমার স্নায়ু পলকা নয়। কিন্তু যে আমার দিবানিশির চিন্তা জুড়ে রয়েছে হঠাৎ তাকে সামনে দেখে বেশ চমকে উঠলাম। এ-মূর্তির প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি আমার মুখস্থ! অত্যন্ত রোগা এবং লম্বা কপালটা সাদা গম্বুজের মতো ঠেলে বার করা। কোটরে ঢোকানো দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, দাড়িগোঁফ কামানো, মুখ পাণ্ডুর, তাপসিক সৌম্যতাসমৃদ্ধ অধ্যাপক জীবনের আমেজ যেন এখনও আকৃতিতে লেগে রয়েছে। অতিরিক্ত পড়াশুনা করার দরুন দু-কাঁধ গোল, মাথা সামনে কুঁকে রয়েছে–একটু কোলকুঁজো ভাব। অদ্ভুত সর্পিল ভঙ্গিমায় মাথাটা একনাগাড়ে দুলছে ডাইনে আর বাঁয়ে–সাপ যেভাবে ফণা দোলায় ঠিক সেইভাবে। দুই চোখে নিঃসীম কৌতূহল জাগিয়ে ভুরু কুঁচকে আমাক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রফেসর।

বললে, মাথার সামনের দিকটা ভেবেছিলাম আরও পরিণত হবে–ড্রেসিং গাউনের পকেটে গুলিভরা রিভলভারের ঘোড়ায় আঙুল রাখা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক অভ্যেস।

ব্যাপারটা হয়েছে কী, প্রফেসরের অকস্মাৎ আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গেই বুঝেছি আমার প্রাণহানি ঘটতে পারে এবার। তাই চক্ষের নিমেষে ড্রয়ার থেকে রিভলভার নিয়ে ড্রেসিং গাউনের পকেটে রেখে বাগিয়ে ধরেছিলাম তার দিকে। এখন তা বার করে রাখলাম টেবিলের ওপর। প্রফেসরের চোখে যে-দৃষ্টি দেখেছিলাম, মিটিমিটি হাসির ছটাতেও তার ভয়াবহতা ঢাকা পড়েনি। হাতের কাছে রিভলভার দেখে তাই স্বস্তি বোধ করছিলাম।

প্রফেসর বলল–আমাকে দেখছি চেনেন না।

ঠিক উলটো। আপনাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, যা বলবার বলুন।

যা বলব বলে এসেছি, তা আপনি জানেন।

তাহলে আমার জবাবটাও আপনি জানেন, বললাম আমি।

এই কি শেষ কথা?

এক্কেবারে।

পকেটে হাত দিল প্রফেসর। তৎক্ষণাৎ ছোঁ মেরে পিস্তল তুলে নিলাম। কিন্তু পকেট থেকে একটা স্মারক-পত্রিকা বার করল প্রফেসর–তাতে লেখা অনেকগুলো তারিখ।

বললে, চৌঠা জানুয়ারি আমার পথ মাড়িয়েছেন আপনি, তেইশে উত্ত্যক্ত করেছেন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সাংঘাতিকরকম ঝামেলায় ফেলেছেন, মার্চের শেষে আমার সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে ছেড়েছেন, আর এখন এই এপ্রিলের শেষে এমন জাল বিস্তার করেছেন যে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। আপনার বিরামবিহীন উৎপাতের জন্যেই এই বিপদে পড়েছি আজ। অসম্ভব এই পরিস্থিতি আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললাম কিছু প্রস্তাব থাকলে ঝেড়ে কাশুন মশাই।

আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান।

সোমবারের পর, বললাম আমি। ছিঃ, ছিঃ মি. হোমস। আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষের মুখে এ-কথা শোভা পায় না। এর পরিণাম ভালো হবে না। হাসছেন, বেশ বেশ হেসে নিন। কিন্তু আমার কথার নড়চড় হয় না জানবেন। এবার যে-রাস্তা ধরব, তাতে আপনার সর্বনাশ করে ছাড়ব।

বিপদ আমার নিত্যসঙ্গী।

দুর মশায়, বিপদের কথা বলছে কে? একেবারে শেষ হয়ে যাবেন যে। আপনার যত বুদ্ধিই থাক না কেন, আমার এই সংস্থার শক্তি এখনও আঁচ করতে পারেননি। একেবারে চিড়েচেপটা করে ছেড়ে দেব।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমায় যে এখুনি বেরোতে হবে।

প্রফেসেরও উঠে দাঁড়াল। নীরবে চেয়ে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললে, মি. হোমস, আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। আপনি কী-কী চাল চেলেছেন, সব আমি জানি। সোমবারের আগে আপনি আমাদের গায়ে হাত দিতে পারবেন না। আপনি ভেবেছেন, আপনার সঙ্গে আমার এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে হারাবেন, কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন, শেষ পর্যন্ত খতম করবেন। ভুল, মি.। হোমস। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আমাকে শেষ করতে গিয়ে নিজেই শেষ হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, মি. মরিয়ার্টি, আপনাকে শেষ করার পর যদি আমাকে শেষ হয়ে যেতে হয়–তাতে দুঃখ নেই।

হিংস্র হায়নার মতো গর্জে উঠল প্রফেসর, প্রথম সম্ভাবনাটা ঘটবে কি না জানি না কিন্তু দ্বিতীয়টা অবধারিত। বলে চোখ মিটমিটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওয়াটসন, সেই থেকে আমি অস্বস্তির মধ্যে রয়েছি। প্রফেসর কখনো ফাঁকা ভয় দেখায় না।

এর মধ্যে চড়াও হয়েছে তোমার ওপর?

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, প্রফেসর মরিয়ার্টি কখনো পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না। আজ দুপুরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে কাজে গিয়েছিলাম। মোড়ের মুখে একটা ঘোড়ার গাড়ি আর একটু হলে চাপা দিত–লাফিয়ে উঠলাম ফুটপাথে। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে একটা থান ইট পায়ের কাছে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ নিয়ে পাশের বাড়িতে উঠলাম। কেউ নেই। জড়ো করা ইট আর টালি ছাড়া কিছু নেই ছাদে। পুলিশ বললে, হাওয়ায় একটা ইট খসে পড়েছে। ঘোড়ার গাড়ি চেপে ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে তোমার এখানে আসবার। সময়ে একজন লাঠি নিয়ে তাড়া করল। ঘুসি মেরে তার দাঁত কপাটি উড়িয়ে দিলাম বটে, থানাতেও পাঠালাম–কিন্তু দশ মাইল দূরে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষছে যে-গণিতবিদটি তার গায়ে আঁচড় কাটতে পারলাম না। ভায়া, সেইজন্যেই তোমার ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করেছি–কথা শেষ হলে পালাব বাগানের পাঁচিল টপকে।

শার্লক হোমস চিরকালই দুঃসাহসী। কিন্তু মাথার ওপর মরণের খাঁড়া নিয়ে সেদিন যেরকম নিশ্চিত নির্বিকারভাবে বিপদের বিবরণ দিতে শুনলাম, তেমনটি কখনো দেখিনি।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বললাম, রাতটা এখানে থাকবে তো? পাগল!

তাতে তুমি বিপদে পড়বে। পরিকল্পনা মতো পুলিশ এখন ওদের পেছনে লেগে থাকুক, আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই। তোমাকে চাই। তোমাকে ডাকছি সেইজন্যে–চলো ইউরোপ ঘুরে আসি।

আমার অসুবিধে হবে না। রুগির ভার প্রতিবেশী ডাক্তারের হাতে দিয়ে যাব।

কাল সকালে বেরোতে পারবে?

নিশ্চয়।

তাহলে ঠিক যা বলব, তাই হবে। মনে রেখো, ইউরোপের সবচেয়ে জাঁহাবাজ, সবচেয়ে ধড়িবাজ, সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নেমেছি আমি। আজকে রাতেই তোমার মালপত্র লোক মারফত ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। কাল সকালে যাকে গাড়ি ডাকতে পাঠাবে, সে যেন প্রথম দুটো গাড়ি যেচে আসতে চাইলেও ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় গাড়িটা নেয়। গাড়ি এলেই তুমি তাতে লাফিয়ে উঠে লাউডার আর্কেড-এর এই ঠিকানায় গাড়ি হাঁকাতে বলবে। আর্কেড-এ পৌঁছেই দৌড়ে ওপারে পৌঁছাবে ঠিক ন-টা পনেরো মিনিটে। দেখবে, ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা ব্রহাম গাড়ি–কোচোয়ানের গায়ে লাল কলারওলা কালো কোট। এই গাড়িতে চেপে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছোবে কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস যখন ছাড়ে–ঠিক তখন।

তুমি?

স্টেশনে থাকব। ইঞ্জিনের পেছনে ফার্স্ট ক্লাস বগির সেকেন্ড কামরাটা আমার জন্যে রিজার্ভ করা আছে।

এই বলে হোমস পেছনের বাগানে গিয়ে পাঁচিল টপকে লম্বা দিল সে-রাতের মতো পাছে আমার ক্ষতি হয়, তাই হাজার অনুরোধ ও উপরোধে রাতটা কাটিয়ে গেল না আমার ডেরায়।

পরের দিন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললাম ওর নির্দেশ। স্টেশনে পৌঁছে রিজার্ভড় কামরায় উঠে বসলাম বটে, কিন্তু যার জন্যে আসা সেই হোমসেরই টিকি দেখতে পেলাম না। ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র সাত মিনিট বাকি–অথচ সে নিপাত্তা। ভীষণ উদবেগে পড়লাম। এর মধ্যে নতুন বিপত্তি উপস্থিত হল এক থুথুরে বুড়ো ইতালিয়ান পাদরিকে নিয়ে। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, আমিও ইতালি ভাষা জানি না। তিনি মুটের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ঝগড়া-টগড়া করার কোন ফাঁকে যে আমাদের রিজার্ভড় কামরায় উঠে বসেছেন জানতাম না। যখন দেখতে পেলাম, তখন ট্রেনের বাঁশি পড়ে গেছে–ভদ্রলোককেও বোঝাতে পারলাম না যে এটা রিজার্ভড কামরা। তা ছাড়া হোমস শেষ পর্যন্ত না-আসায় এবং নিশ্চয় মারাত্মক কোনো বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে আমার তখন মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল হওয়া অবস্থা। ট্রেন নড়ে উঠতেই কিন্তু শার্লক হোমসের সকৌতুক বাণী শুনলাম ঠিক কানের কাছটিতে, ভায়া ওয়াটসন, এখনও পর্যন্ত গুড মর্নিং বলনি কিন্তু আমাকে।

সচমকে ফিরে তাকালাম থুথুরে বুড়ো তালের নুড়ো সেই পাদরিটার দিকে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তার মুখের অজস্র চামড়ার ভাঁজ আর বলিরেখা। চিবুকে ঠেকা নাকটা উঠে এল স্বাভাবিক অবস্থায়, নীচের ঠোঁটটা আর ঝুলে রইল না বিশ্রীভাবে, উধাও হল অস্ফুট বকুনি, নিষ্প্রভ চোখে জাগ্রত হল স্ফুলিঙ্গ এবং শিরদাঁড়া ভাঙা কুঁজো চেহারাটা সিধে হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। বুড়ো পাদরির নড়বড়ে চেহারার মধ্যে থেকে যেন জাদুমন্ত্র বলে বেরিয়ে এল শার্লক হোমস।

কী সর্বনাশ! দারুণ চমকে দিয়েছ!

চাপা গলায় হোমস বললে, হুঁশিয়ার! ওই দেখো মরিয়ার্টি এসে গেছে!

ট্রেন তখন গড়াচ্ছে। ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল লম্বা মতো এক ব্যক্তি– পাগলের মতো হাত নেড়ে ট্রেন থামাতে চাইল বটে কিন্তু তখন আর কোনো উপায় নেই। দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল ট্রেন।

হাসতে লাগল হোমস, দেখলে তো, এত সাবধান হয়েও ঠিক খবর পেয়েছে ও। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পেরেছি, বলে উঠে দাঁড়িয়ে ছদ্মবেশের সরঞ্জাম প্যাক করে ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগের মধ্যে।

বলল, ওয়াটসন, সকালের কাগজ দেখেছ?

না।

বেকার স্ট্রিটের খবর তাহলে শোননি?

বেকার স্ট্রিটের আবার কী খবর?

শার্লক হোমস বিদায় নিলেন

কাল রাতে আমাদের ওই দু-খানা ঘরে আগুন লাগানো হয়েছিল। খুব একটা লোকসান অবশ্য হয়নি। বল কী?

ওদের লেঠেল পুলিশে ধরা পড়ার পর ভেবেছিল বেকার স্ট্রিটে ফিরে গিয়েছি তাই আগুন লাগিয়েছিল ঘরে। এখানে এসেছে তোমার পেছন নিয়ে আমাকে ওরা হারিয়ে ফেলেছিল। যা-যা বলেছিলাম, করেছিলে তো?

আরে হ্যাঁ।

কালো কোট গায়ে কোচোয়ানটি আমার ভাই মাইক্রফট। এ বিপদে পড়লে ভাড়াটে লোকের চেয়ে নিজের লোক বেশি কাজ দেয়। যাক, এবার মরিয়ার্টিকে নিয়ে ভাবা যাক।

মরিয়ার্টি আর আমাদের নাগাল পাবে না।

ভুল, বন্ধু, ভুল। মরিয়ার্টিকে কখনো এত ছোটো করে দেখো না আমার চেয়ে বুদ্ধি তার মোটেই কম নয়। আমি হলে কী করতাম বলো তো?

কী?

স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করতাম।

তাতেও নাগাল পেতে না।

ঠিক উলটো। এই ট্রেন ক্যান্টারবেরিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। স্টিমার ছাড়তেও মিনিট পনেরো সময় লাগে। তার মধ্যে ও আমাদের ধরে ফেলবে।

খুনি আসামি নাকি আমরা? ওকেই বরং পৌঁছোনোর সঙ্গেসঙ্গে ধরিয়ে দিলে হয় না?

তাতে আমার তিন মাসের হাড়ভাঙা খাটনি জলে যাবে। পালের গোদাটিকে ধরতে গিয়ে দলের অন্য রাঘব বোয়ালগুলো জাল কেটে ভাগলবা হবে। কিন্তু যদি সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করি, সব মিঞাকে একসঙ্গে জাল টেনে তোলা যাবে। না হে না, এখন নয়। সবুর করতে হবে।

তাহলে এখন উপায়?

ক্যান্টারবেরিতে নেমে যাব। মালপত্র নিয়ে ট্রেন চলে যাক। আমরা নিউহ্যাভেনের ট্রেন ধরে বেরিয়ে পড়ব দেশভ্রমণে। নানাদেশ ঘুরে পৌঁছোব সুইজারল্যান্ডে।

চোরের মতো এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে হবে শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। কিন্তু তর্ক করলাম না। ক্যান্টারবেরিতে নেমে ট্রেন ছেড়ে দিলাম। নিউহ্যাভেনের ট্রেন তখনও একঘণ্টা পরে। এমন সময়ে চাপা গলায় হোমস বলে উঠল, ওয়াটসন, ওয়াটসন, ওই দেখো!

দেখলাম, দূরের কেন্ট বনানি থেকে উল্কাবেগে ধোঁয়ার পেছনে উড়িয়ে বেরিয়ে আসছে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন। একখানা বগি নিয়ে ছুটছে একটা ইঞ্জিন। তাড়াতাড়ি মালপত্রের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম দুই বন্ধু–মুখের ওপর ধোঁয়া আর বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্পেশ্যাল।

দিগন্তে মিলিয়ে গেল গাড়ি। হোমস বললে, তার মানে ঘটে বুদ্ধি একটু কম আছে।

তোমার লাইনে ভেবে নিয়ে যদি এখানে থামত প্রফেসর, তাহলে কী হত?

আমাকে খুন করত, সে যা বলে গেছে, তাই করত।

দু-দিন পরে স্ট্রাসবুর্গে পৌঁছে লন্ডনে টেলিগ্রাম করে খবর নিল হোমস। ভীষণ রেগে গেল যখন শুনল, প্রফেসর মরিয়ার্টি বাদে সব্বাই ধরা পড়েছে।

রাগে গরগর করতে করতে টেলিগ্রামখানা ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়ে বললে, ওয়াটসন, আমি জানতাম ও পালাবে। আমি থাকলে এমনটা হত না। যাকগে ভায়া, তুমি এবার লন্ডনে গিয়ে রুগি সামলাও। আমাকে একা লড়তে দাও প্রফেসরের সঙ্গে। জীবন মরণের এ-খেলায় তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই না।

কিন্তু অত সহজে যুদ্ধফেরত একজন প্রাণের বন্ধুকে বিপদের সময়ে ঝেড়ে ফেলা যায় না। শার্লক হোমসও পারল না। ঝাড়া একঘণ্টা কথা কাটাকাটির পর সেই রাতেই দুই বন্ধু জেনেভার পথে পাড়ি জমালাম।

একদেশ থেকে আর একদেশে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, গ্রাম থেকে গ্রামে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গাড়ি নিয়ে টো-টো করলাম দুই বন্ধু। প্রকৃতির লীলা নিকেতনের সৌন্দর্য কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও শার্লক হোমসের মন থেকে প্রফেসরের চিন্তা দূর করতে পারেনি। বিপদ যে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তা ওর চকিত চাহনি দেখে বুঝেছি। দূর গ্রামাঞ্চলেও প্রতিটি লোকের দিকে সজাগ চাহনি নিক্ষেপ দেখে উপলব্ধি করেছি–কাউকেও বিশ্বাস করছে না। একবার পাহাড়ি পথে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা মস্ত আলগা পাথর গড়িয়ে গিয়ে সশব্দে পড়ল লেকের জলে। তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে চারপাশ দেখল হোমস, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। গাইড বললে–ও কিছু নয়। এ-অঞ্চলে ওভাবে পাথরের চাঙড় হামেশা পড়ে। শার্লক হোমস মুখে কিছু বলল না। শুধু

হাসল। বিচিত্র সেই হাসি দেখেই বুঝলাম কালান্তক যমদূতের মতো কার করাল ছায়া আঠার মতো লেগে রয়েছে তার সামনে–সে যা ভয় করেছিল তাই সত্যি হতে চলেছে।

মৃত্যু যেকোনো মুহূর্তে আসতে পারে জেনেও বন্ধুবরের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিনি। বরং জীবনে ওকে এমন ফুর্তিবাজ অবস্থাতেও দেখিনি। ঘৃণ্যকীট প্রফেসর মরিয়ার্টির কবল থেকে সমাজকে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করার স্বপ্নে মশগুল থেকেছে অহোরাত্র।

আমাকে বুঝিয়েছে, ওয়াটসন, দুঃখ কীসের? জীবনটা তো বাজে নষ্ট করিনি। আমার জন্যেই লন্ডনের লোক এখন থেকে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। আমার সব কীর্তির শেষে যেন একটা কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ানক চালাক কুচক্রী লোকটাকে

আমিই যমালয়ে পাঠিয়েছি অথবা শ্রীঘরে পুরেছি।

এর পরের ঘটনা সংক্ষেপে সারছি। বিস্তারিত বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। তবে কিছুই বাদ দেব না–খুঁটিয়েই বলব।

তেসরা মে মেরিনজেন গ্রামে একটা সরাইখানায় উঠলাম। বৃদ্ধ মালিক বললেন, রাইখেনবাক জলপ্রপাতটা যেন দেখে যাই।

চৌঠা মে বিকেল নাগাদ রওনা হলাম রোজেনলাউ গ্রামের দিকে যাবার পথে দেখতে গেলাম রাইখেনবাক জলপ্রপাত।

সে কী ভয়াবহ দৃশ্য! বুক কেঁপে ওঠে, কানের পর্দা ফেটে যায়, স্মৃতির পর্দায় আতঙ্কের শিহর চিরকালের মতো লেগে থাকে। বরফ মেশানো সবজে জলস্রোত ভীমবেগে বজ্রনাদে ধেয়ে পড়ছে বহু নীচে দু-পাশের কুচকুচে কালো খোঁচা খোঁচা ধারালো বল্লমাকৃতি পাথরের মধ্য দিয়ে। বাড়িতে আগুন লাগলে যেভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে, সেইভাবে জলবাষ্প উঠছে তো উঠছেই–সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে বিরাম নেই এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই বিপুল বেগে বিকট শব্দে ফুটন্ত জলধারার আছড়ে পড়ার মধ্যেও। চাপা গুম গুম সেই বীভৎস শব্দ শুনলে মনে হয় যেন অমানুষিক অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানুষের রক্ত-জল-করা আকাশফাটা বিকট হাহাকার। কিনারায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকলেও মাথা ঘুরে যায়।

পথ মাঝখানে শেষ হয়েছে–প্রপাতের একদম ধার পর্যন্ত না যাওয়া গেলেও প্রপাত দেখতে অসুবিধে হয় না। আমরাও শেষ পর্যন্ত আর গেলাম না। ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে এল একটা সুইস ছোকরা। চিঠি পাঠিয়েছে মেরিনজেন গ্রামে সরাইখানার বুড়ো মালিক। ডাক্তার ওয়াটসন এখুনি এলে বড়ো উপকার হয়। একজন ইংরেজ মহিলা দেশ দেখতে এসে হঠাৎ সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ ডাক্তার ছাড়া সুইস ডাক্তার দেখাতে তিনি রাজি নন। হয়তো আর একটা ঘণ্টা বাঁচবেন। তাহলেও শেষ মুহূর্তে একজন ইংরেজ ডাক্তারকে পাশে চাইছেন।

শার্লক হোমসকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ অনুরোধ ঠেলে ফেলাও সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল। হোমস রোজেনলাউ গ্রামে একা চলে যাবে–আমি মেরিনজেনে রুগি দেখে রাতে ওর কাছে যাব।

আসবার সময়ে দেখে এলাম, বুকের ওপর দু-হাত রেখে পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিমেষহীন চোখে দুরন্ত জলস্রোত দেখছে শার্লক হোমস। হায় রে! তখন যদি বুঝতাম এই দেখাই

আমার শেষ দেখা!

শেষ ধাপে পৌঁছে আবার ফিরে তাকালাম। জলপ্রপাত আর দেখতে পেলাম না বটে, তবে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দ্রুত পদক্ষেপে উঠে যেতে দেখলাম ওপর দিকে। সতেজ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তার যাওয়াটুকুই কেবল আমি দেখেছি, সবুজের পটভূমিকায় কালো ছায়ার মতো দেহরেখার সবটুকু চোখে পড়েনি। একটু পরে রুগির চিন্তায় লোকটিকে একদম ভুলে গেলাম।

সরাইখানার সামনে পৌঁছোলাম ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ মালিক। আমাকে দেখে সে তত অবাক। চিঠি দেখে আরও অবাক! এ-চিঠি তো তার লেখা নয়। কোনো ইংরেজ মহিলা তো অসুস্থ হয়নি সরাইখানায়!

বললে, চিঠিতে সরাইখানার ছাপ রয়েছে দেখছি। বুঝেছি! আপনারা চলে যাওয়ার পরেই লম্বা মতো একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন। নিশ্চয় তিনিই লিখেছেন। বলছিলেন—

আর বলছিলেন! বাকি কথা শোনবার আর সময় নেই তখন। ঝড়ের মতো ছুটলাম যে-পথে এসেছি সেই পথেই। নামতে লেগেছিল এক ঘণ্টা, উঠতে লাগল দু-ঘন্টা১৪। হোমসকে শেষবারের মতো যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেছিলাম, সেখানে গিয়ে শুধু তার ছড়িটা দেখলাম ঠেস দেওয়া অবস্থায় রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। সে নেই!

সে নেই! আশেপাশে কোথাও নেই! তিন ফুট চওড়া এই সংকীর্ণ পথের একদিকে মৃত্যুকূপের মতো গভীর খাদ, আর একদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়, দুইয়ের মাঝে কার পথ চেয়ে সে দাঁড়িয়েছিল? প্রফেসর মরিয়ার্টির? সুইস ছোকরা তাহলে চতুর-চূড়ামণি প্রফেসরের চর?

শার্লক হোমস এখন কোথায়?

প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়লেও আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছি নিজেকে। বন্ধুবরের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের। সেই পদ্ধতি অনুসারে দেখলাম পায়ের ছাপ কোথাও আছে কি না। পেলামও না। দুজন লোকের পায়ের ছাপ পাথুরে রাস্তার পরেই ভিজে কাদার ওপর দিয়ে কিনারা পর্যন্ত গেছে, কিন্তু কোনো ছাপই আর ফিরে আসেনি।

দুজনের কেউই কাদা মাড়িয়ে ফেরেনি, অথচ কাদা এত নরম যে পাখি হেঁটে গেলেও দাগ পড়বেই।

গেলাম কিনারা পর্যন্ত। সেখানকার কাঁটাঝোপ আর ফার্ন ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে কাদায় পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে, যেন প্রকাণ্ড ধস্তাধস্তি করেছে দুই ব্যক্তি। তারপর

তারপর? মুখ বাড়ালাম সুগভীর খাদের অতল গহ্বর পানে। উত্থিত জলবাষ্প ফোয়ারার মতো ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল আমারমুখ, অর্ধ-মানবিক বিকট হাহাকারে ফেটে গেল যেন কানের পর্দা–

ফাঁকে-ফোকরে দৃষ্টিসঞ্চালন করেও চিহ্ন দেখতে পেলাম না কারো। বার বার বুকফাটা চিৎকার করেও সাড়া পেলাম না কারো। হোমস সাড়া দিল না আমার ডাকে। শুধু বাতাস গুঙিয়ে উঠল। প্রপাত কেঁদে চলল। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ দুরে মিলিয়ে গেল।

ফিরে এলাম। কী অবস্থায় ফিরলাম, তা শুধু আমিই জানি, আর ভগবান জানেন। হোমসের ফেলে যাওয়া ছড়ির কাছে ওর চকচকে সিগারেট কেসটাও রয়েছে দেখলাম। তলায় একটা চৌকোনা কাগজে মুক্তাক্ষরে লেখা আমার নামে একটা চিঠি। খুব যত্ন করে যেন বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে বসে গুছিয়ে শেষ চিঠি লিখে গেছে শার্লক হোমস।

ভায়া ওয়াটসন,

হিসেব-নিকেশ করার জন্যে মরিয়ার্টি বসে রয়েছে, এই চিঠিখানা লেখবার সুযোগ সে-ই দিয়েছে। ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে আমার গতিবিধির খবর সে রেখেছিল এখুনি তা বুঝিয়ে দিল। প্রফেসরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে চিরকালই আমার ধারণা ভালো। এই কাহিনি শুনে তা দৃঢ়তর হল। এই শেষ মুহূর্তেও একটা কথা ভেবে খুশি না হয়ে পারছি না। এইরকম একটা দুর্দান্ত কুশলী ব্যক্তির করাল ছায়া থেকে অবশেষে সমাজকে আমি চিরতরে রেহাই দিতে যাচ্ছি–যদিও তার জন্যে খেসারত দিতে হবে বড্ড বেশি এবং আমার বন্ধুবান্ধবরা৫ প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাবে–বিশেষ করে দুঃখে ভেঙে পড়বে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তুমি। আগেই তোমাকে বলেছি, এ-জীবনের সবচেয়ে বড়ো সংকটে এসে ঠেকেছে। আমার কর্মজীবন এবং এইটাই এর একমাত্র সম্ভবপর পরিণতি, আমার কীর্তিময় জীবনের পরিসমাপ্তিও সূচিত হবে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এবং তার চাইতে আনন্দময় ব্যাপার আমার কাছে আর কিছুই নেই। তোমার কাছে আর লুকোব না, আমি বুঝতে পেরেছিলাম মেরিনজেন থেকে আসা চিঠিটা স্রেফ ভাওতা। তা সত্ত্বেও তোমাকে যেতে দিয়েছিলাম শেষ লড়াই লড়ব বলে। ইনস্পেকটর প্যাটারসনকে বলবে পুরো দলটাকে দায়রা সোপর্দ করার উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ একটা নীল খামে ভরে এম চিহ্নিত খুপরিতে রেখেছি, খামের ওপর মরিয়ার্টির নাম লেখা আছে ইংলন্ড ত্যাগের আগেই আমার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি উইল করে আমার দাদা মাইক্রফটকে দিয়ে এসেছি। মিসেস ওয়াটসনকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তুমি নিজে জেনো জনমে মরণে আমি তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে রইলাম।

তোমার একান্ত অন্তরঙ্গ–শার্লক হোমস

এর পরের কাহিনি অল্প কথাতেই শেষ করে দিচ্ছি। বিশেষজ্ঞরা লণ্ডভণ্ড কাদামাটি পরীক্ষা করে একবাক্যে বললেন, সত্যিই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট চলেছিল সেখানে। ওই অবস্থাতে মারপিট ছাড়া আর পথও ছিল না। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে গড়াতে একসঙ্গে ঠিকরে গেছে খাদের মধ্যে। নশ্বর দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব নয়। ঘুরপাক খাওয়া জল আর উত্তাল ফেনায় ভরা ভয়ংকর ওই কটাহের অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে থাকবে এ-শতাব্দীর সবচেয়ে বিপজ্জনক অপরাধী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। সেই সুইস তরুণটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ছোকরা যে প্রফেসর মরিয়ার্টির অগুনতি মাইনে করা স্যাঙাতের অন্যতম, তাতে আর সন্দেহ নেই। কুখ্যাত দলটির পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল জনগণ তা ভালো করেই জানেন। দেশের লোক কোনোদিন ভুলতে পারবে না লোকান্তরিত মহাপুরুষ শার্লক হোমস সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণের দৌলতে কীভাবে সংগঠনের সমস্ত দুষ্কর্ম ফাঁস হয়ে যায় এবং প্রত্যেকে কড়া সাজা পায়। মৃত্যুর পরেও এইভাবে বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে গেল আমার আশ্চর্য বন্ধুটি দেখিয়ে দিল মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে ফুরিয়ে যায়নি তার ক্ষমতার প্রভাব। মহাপাপিষ্ঠ দলপতিটি সম্বন্ধে খুব একটা সংবাদ মামলা চলার সময়ে প্রকাশ পায়নি। তাই কিছু অবিবেচক সমর্থক উঠে পড়ে লেগেছিল যাতে তার স্মৃতি চিরউজ্জ্বল থাকে জনগণ মানসে। কিন্তু এই করতে গিয়ে এমন একজনকে তারা আক্রমণ করে চলেছে যার চাইতে জ্ঞানী আর সেরা পুরুষ আমার জীবনে আর আসেনি। প্রফেসর মরিয়ার্টির স্বরূপ আর শেষ দ্বন্দ্বের মর্মন্তুদ এই কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করলাম শুধু সেই কারণেই।

———

টীকা

শার্লক হোমস বিদায় নিলেন : দ্য ফাইনাল প্রবলেম স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯৩ সংখ্যায় এবং নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ডের ১৮৯৩-এর ক্রিসমাস সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কর্নেল জেমস মরিয়াটি : প্রেফেসর মরিয়ার্টির প্রথম নাম এই গল্পে কোথাও বলা হয়নি। হয়েছে পরবর্তী গল্প দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য এমটি হাউস গল্পে। সেখানে ভাইয়ের মতো প্রেফেসর মরিয়ার্টিকেও জেমস বলা হয়েছে।

রয়টার : জার্মান ব্যাঙ্ক কেরানি পল জুলিয়াস রয়টার ১৮৫১-র অক্টোবরে রয়টার্স টেলিগ্রাম কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিকভাবে এই কোম্পানি বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এবং জার্মানির আখেন শহরের মধ্যে শেয়ারের দর জানাত। পরে এই সংস্থা আরও বড়ো হয় এবং সংবাদ সংস্থা হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে।

এয়ারগান : ১৫৩০ সালে নুরেমবার্গের গুটের সংস্থা প্রথম এয়ারগান তৈরি করে। ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজরা হাঁটতে বেরোনোর ছড়ির মধ্যে এয়ারগান লুকিয়ে রাখতেন।

জন্মেও না : দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার উপন্যাসের ঘটনা দ্য ফাইনাল প্রবলেম-এর আগের সময়কার বলে গবেষকরা মনে করেন। তাই যদি হয়, তাহলে হোমস এবং ওয়াটসনের কথোপকথনের এই অংশ সম্পূর্ণ অবান্তর এবং অযৌক্তিক। কিংবা সম্পূর্ণ ভুল ওই অনুমান।

বাইননামিয়াল থিয়োররম : স্যার আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক ১৬৭৬ সালে প্রণীত বীজগণিতের সূত্র।

মাথার সামনের দিকটা ভেবেছিলাম আরও পরিণত হবে : ভিক্টোরীয় যুগের ইংলন্ডে প্রচলিত, ফ্রাজ জোসেফ গল প্রচলিত, মগজের আকৃতি এবং মাথার খুলির আকার আয়তন থেকে মানুষের বুদ্ধি, সম্মানজ্ঞান,বা অন্যান্য বিষয় বিচারের বিজ্ঞান ফ্রেনোলজির (Phrenology) বিচারে শার্লক হোমসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সম্ভবত মরিয়ার্টির উক্তি।

লাউডার আর্কেড : স্ট্র্যান্ড-এ অবস্থিত লন্ডন শহরের একটি বাজার এলাকা।

স্ট্রাসবুর্গ : ফ্রান্সের লোয়ার অ্যালসেশিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন শহর। ইল নদীর তীরবর্তী এই শহরের ইতিহাস বহু শতাব্দীর পুরোনো এবং এখানে ছয় লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সব্বাই ধরা পড়েছে :সব্বাই নয়। কর্নেল সিবাস্টিয়ান মোর্‌য়ান এবং পার্কার ধরা পড়েনি। হোমস-সিরিজের পরবর্তী কাহিনি দ্য এমটি হাউস দ্রষ্টব্য।

মেরিনজেন : রাইখেনবাক প্রপাতের নিকটবর্তী এই শহর ইন্টারলাকেন-মেরিনজেনবাহন ন্যারোগেজ শাখা রেলপথের প্রান্তিক স্টেশন। এই শহর সুইজারল্যান্ডের বার্ন এলাকার অন্তর্গত।

রোজেনলাউ : আল্পস পাহাড়ে রাইখেনব্যাশাল উপত্যকার সর্বোচ্চ জনপদ রোজেনলাউ।

রাইখেনবাক জলপ্রপাত : সুইজারল্যান্ডের এই প্রপাতে আর (Aar) নদী ঝাঁপিয়ে পড়েছে আড়াইশো মিটার উঁচু থেকে। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হওয়ায় কখনো জলের তোড় কমে আসে। শার্লক হোমসের কাহিনি আরও বিখ্যাত করেছে এই পর্যটনক্ষেত্রকে।

উঠতে লাগল দু-ঘণ্টা : হোমস-গবেষক লেসলি এস. ক্লিংগার জানিয়েছেন মেরিনজেন-এ অবস্থিত হোটেল রাইখেনবাক থেকে রাইখেনবাকের লোয়ার ফলস হেঁটে পৌঁছোত পনেরো মিনিট লাগে। আর আপার ফলস পৌঁছোতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

বন্ধুবান্ধবরা : দ্য পাইপ অরেঞ্জ পিপস গল্পে হোমস নিজের মুখে বলেছিলেন যে ওয়াটসন ছাড়া তার আর কোনো বন্ধু নেই।

উইল : জুন ১৯৫৫ সংখ্যার লন্ডন মিস্ট্রি ম্যাগাজিনে শার্লক হোমসের শেষ উইল প্রকাশিত হয়। দেখা যায় তাতে ওয়াটসনকে পাঁচ হাজার পাউন্ড এবং হোমসের কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।

দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব নয় : রাইখেনবাক জলপ্রপাত যথেষ্ট উত্তাল হয়ে থাকলেও ওই জলধারা। শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে ব্রিঞ্জ লেক-এ। যেখানে জল বদ্ধ এবং

শান্ত। রাইখেনবাক-এ কেউ পড়ে গেলে তা শেষ পর্যন্ত ব্রিঞ্জ লেক-এ এসে পড়বে এবং সেখানে সেই দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

সোনা-দাঁতের রহস্য

[দ্য স্টকব্রোকার্স ক্লার্ক]

বিয়ের পরেই আমি প্যাডিংটন জেলায় এক বুড়ো ডাক্তারের পড়ন্ত প্র্যাকটিস কিনেছিলাম। বউকে নিয়ে থাকতামও সেখানে। বেকার স্ট্রিটে যাওয়া শিকেয় উঠেছিল পসার জমাতে গিয়ে। দীর্ঘদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি শার্লক হোমসের সঙ্গে।

জুন মাস। সকাল বেলা। প্রাতঃরাশ সবে শেষ হয়েছে। ব্রিটিশ জার্নাল পড়ছি। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল হোমস।

আমি তো অবাক ওর হঠাৎ আগমন দেখে। ও বলল, ওহে ওয়াটসন, ডাক্তারি করতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি তথ্যবিশ্লেষণী সমস্যায় আগ্রহ এখনও আছে তো?

বিলক্ষণ। কাল রাতেই পুরোনো কেসগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম।

আরও কেস চাও?

নিশ্চয়।

বার্মিংহামে যেতে হবে কিন্তু। রুগি কে দেখবে?

প্রতিবেশী ডাক্তার। তিনি ছুটি নিলে তার রুগি আমি সামলাই, আমার রুগিও তিনি সামলাবেন।

হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে অর্ধনিমীলিত চোখে আমাকে দেখতে দেখতে হোমস বললে, সর্দি লেগেছিল দেখছি।

তা লেগেছিল। কিন্তু এখন তো সেরে গেছে। তুমি জানলে কী করে? তোমার চটি দেখে।

পায়ের নতুন চটিজোড়ার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিন্তু বুঝলাম না চটির সঙ্গে সর্দির কী সম্পর্ক।

হোমস বললে, চটিজোড়া নতুন, কিন্তু শুকতলা আগুনে ঝলসানো। প্রথমে ভেবেছিলাম বৃষ্টিতে ভিজিয়েছ বলে আগুনের সামনে রেখে শুকিয়েছ। তারপর দেখলাম, ভেতরে সাঁটা দোকানের লেবেলটা এখনও রয়েছে তার মানে জলে ভেজেনি। ভিজলে লেবেলও উঠে যেত। জুন মাসে বৃষ্টিবাদলা তো থাকেই। তা সত্ত্বেও শুকনো চটি পরে আগুনের সামনে শুকতলা এগিয়ে দিয়ে যখন বসে ছিলে, তখন বুঝে নিতে হবে সর্দি লেগেছিল তোমার। যাই হোক, চল বেরিয়ে পড়ি। মক্কেলকে গাড়িতে বসিয়ে এসেছি।

প্রতিবেশী ডাক্তারকে চিঠি লিখেছিলাম। বউকে সব কথা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল হোমস।

বলল, তোমার প্রতিবেশী ডাক্তারের বাড়িতে যত রুগি এসেছে, তার চাইতে বেশি রুগি এসেছে কিন্তু তোমার এই বাড়িতে।

তা তো আসবেই। আমি যাঁর প্র্যাকটিস কিনেছি, তার পসার অনেক বেশি ছিল যে। বুড়ো হয়ে নিজেই রুগি হয়ে গেলেন বলে প্র্যাকটিস বেচে দিলেন। কিন্তু তুমি তা জানলে কী করে?

সিঁড়ি দেখে। তোমার সিঁড়ি পাশের বাড়ির সিঁড়ির চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি ক্ষয়েছে। গাড়িতে যিনি বসে আছেন, ওঁর নাম মি. হল পাইক্রফট। এসো, আলাপ করিয়ে দিই। কোচোয়ান, জোরসে চালাও–ট্রেন ধরতে হবে।

গাড়ির মধ্যে আসীন যুবাপুরুষটি বেশ চটপটে, সুদর্শন। চেহারা দেখে চালাকচতুর বলেই মনে হয়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে বিপদের অশনিসংকেত ঝুলছে। ট্রেনে ওঠার পর জানলাম বিপদটা কী।

হোমস বললে, মি. পাইক্রফট, সত্তর মিনিট ট্রেনে বসে থাকতে হবে। এই ফাঁকে বরং আপনার মজার ব্যাপারটা ডা. ওয়াটসনকে আর একবার বলুন, কিছু বাদ দেবেন না।

হল পাইক্রফট বলতে শুরু করলেন।

ব্যাপারটা মজারই বটে। যেন আমাকে নিয়ে কেউ দারুণ রগড় আরম্ভ করেছে।

কক্সন অ্যান্ড উডহাউস কোম্পানিতে পাঁচ বছর চাকরি করেছি আমি। হঠাৎ তারা দেউলে হয়ে যাওয়ায় আমার চাকরিটি গেল। মালিক একটা ভালো সুপারিশপত্র দিলেন। তাই নিয়ে সমানে চাকরির দরখাস্ত করে চললাম। জমানো টাকা শেষকালে একদিন ফুরিয়ে এল। এই সময়ে লোম্বার্ড স্ট্রিটের মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস-এ একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিলাম। কোম্পানিটি লন্ডন শহরের সবচেয়ে বড়ো শেয়ার-দালালের কোম্পানি। কী কপাল দেখুন, পত্রপাঠ জবাব চলে এল। সামনের সোমবার যেন হাজির হই। চেহারাটা খুবসুরত হলে চাকরি আমি পাবই। কাজকর্ম আগের কোম্পানিতে যা করেছিলাম সেইরকমই। কিন্তু মাইনে বেশি। পাচ্ছিলাম সপ্তাহে তিন পাউন্ড–এখানে চার পাউন্ড।

যেদিন চিঠিটা পেলাম, সেইদিনই সন্ধে নাগাদ বাড়ি এল একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক। চোখও কালো। মাঝবয়েসি। নাম, আর্থার পিনার। পেশায় ফিনান্সিয়াল এজেন্ট। ভিজিটিং কার্ড দেখে জানলাম।

ভদ্রলোক বেশ চটপটে। বাজে কথায় সময় নষ্ট করার মানুষ নন। এসেই বললেন, আপনিই তো মি. হল পাইক্রফট?

চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

কক্সন অ্যান্ড উডহাউসে আগে কাজ করতেন?

হ্যাঁ।

আপনার নাম শুনেছি। কক্সনের ম্যানেজার পার্কার আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তাই নাকি?

আপনার স্মৃতিশক্তি কীরকম?

খারাপ নয়।

শেয়ার মার্কেটের খবর রাখেন?

রোজ সকালে স্টক এক্সচেঞ্জ পড়ি।

চমৎকার! চমৎকার! একেই বলে কাজের লোক। বলুন তো, আয়ারশায়ারের কী দর যাচ্ছে?

এক-শো পাঁচ থেকে সওয়া পাঁচ।

নিউজিল্যান্ড কনসোলিডেটেড?

এক-শো চার।

সোনা-দাঁতের রহস্য

ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলস?

সাত থেকে সাড়ে সাত।

শাবাশ! শাবাশ! দারুণ বলেছেন; সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দিলেন আমার। আপনার মতো ব্রেনের লোক মসনের খিদমত খাটবেন, এ কি হয়? আপনার স্থান আরও উঁচু জায়গায়। কবে যাচ্ছেন ওখানে?

সোমবার।

কক্ষনো যাবেন না। সোমবার থেকে আপনার চাকরি হয়ে গেল ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে; বিজনেস ম্যানেজার। শুধু ফ্রান্সেই এক-শো চৌত্রিশটা ব্রাঞ্চ আছে কোম্পানির, ব্রাসেলস আর সানরেমো-র ব্রাঞ্চ তো ধরলামই না।

সে কী! এ-রকম কোনো কোম্পানির তো নাম শুনিনি।

শুনবেন কী করে? বাজারে তো শেয়ার ছাড়া হয়নি। ভালো জাতের কোম্পানি বলেই নিজেদের মধ্যে থেকে মূলধন জোগাড় করা হয়েছে। কোম্পানির পত্তন ঘটিয়েছে আমার ভাই হ্যারি পিনার, এইবার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবে। তার আগে চাই একজন চালাকচতুর কাজের লোক। পার্কারের কাছে আপনার নাম শুনেই দৌড়ে এসেছি। প্রথমটা অবশ্য বেশি দিতে পারব না, বছরে পাঁচ-শো পাউন্ড...

পাঁচ-শো পাউন্ড!

এ ছাড়াও শতকরা এক পাউন্ড কমিশন। মাইনে যা পাবেন, কমিশন পাবেন তার বেশি।

কিন্তু লোহালক্কড় সম্বন্ধে আমি তো কিস্‌সু জানি না।

বাজারদরটা তো জানেন।

কিন্তু আপনাদের কোম্পানি এক্কেবারে নতুন...

বেশ তো, এই নিন এক-শো পাউন্ড আগাম।

কাজ শুরু করব কখন? আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললাম আমি।

কাল দুপুর একটায় বার্মিংহামে ১২৬বি কর্পোরেশন স্ট্রিটে গিয়ে দেখা করুন আমার ভাইয়ের সঙ্গে। চাকরি পাকা করবে সে-ই। দয়া করে এই কাগজটায় লিখে দিন, কম করে পাঁচ-শো পাউন্ড মাইনেয় ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানিতে বিজনেস ম্যানেজারের চাকরি নিতে আমার ইচ্ছা আছে।... ঠিক আছে, ওতেই হবে। এবার বলুন, মসনের চাকরির কী হবে?

লিখে জানিয়ে দিচ্ছি চাকরি চাই না।

আরে না, না। ওটি করবেন না। মনের ম্যানেজার আমাকে বলে কিনা আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে ভালো জায়গায় বসাচ্ছে–এর চাইতে ভালো চাকরি আপনাকে কেউ দেবে। আমিও বাজি ধরে এসেছি, কাজের লোকের কখনো ভালো মাইনের অভাব ঘটবে না।

শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল–আচ্ছা বদমাশ লোক তো! জীবনে যার মুখও দেখিনি, তার এতবড়ো কথা? ঠিক আছে, যাব না, চিঠিও লিখব না।

বিদায় নিলেন আর্থার পিনার। আনন্দের চোটে অর্ধেক রাত ঘুমোতে পারলাম না। খাম পোস্টকার্ড কেনার পয়সা পর্যন্ত ছিল না–হঠাৎ ব্ল্যাক গরম হয়ে গেল নগদ এক-শো পাউন্ডে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পরের দিন গেলাম বার্মিংহামে। হোটেলে উঠলাম। ঠিকানা খুঁজে একটু আগেই পৌঁছোলাম বাড়িটায়। নীচের তলায় অনেক কোম্পানির নাম লেখা বোর্ড ঝুলছে, কিন্তু ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির নাম কোথাও দেখলাম না। তবে কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হল? হতভম্ব হয়ে ভাবছি কী করব, এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক। চেহারা আর গলার স্বরের দিক দিয়ে আর্থার পিনারের মতো দেখতে, শুধু যা দাড়ি গোঁফ কামানো—চুলও অতটা কালো নয়।

এসেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই মি. হল পাইক্রফট?

হ্যাঁ।

আমি হ্যারি পিনার। আজ সকালে ভাইয়ের চিঠি পেয়েছি। খুব তারিফ করেছে আপনার।

আপনাদের অফিসটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পাবেন কী করে? এই তো দিন সাতেক একটা সাময়িক ডেরা জোগাড় করেছি। এখনও বোর্ড ঝোলানো হয়নি। চলুন।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় দু-ঘরের একটা ফ্ল্যাটে আমাকে নিয়ে গেলেন হ্যারি পিনার। আসবাবপত্রের চেহারা দেখে বুক দমে গেল। ঝকঝকে তকতকে টেবিল চেয়ার আর সারি সারি কেরানি বসে-থাকা অফিসঘরে কাজ করে আমি অভ্যস্ত—এরকম ধূলিধূসরিত

দু-খানা চেয়ারওলা একখানা টেবিল আর কিছু লেজার বই সমেত অফিসঘর কখনো দেখিনি।

হ্যারি পিনার আমার হতভম্ব মুখ দেখে চিন্তাটা আঁচ করে নিয়ে বললেন, অফিসটা সাজানোর পর্যন্ত সময় পাইনি। রাতারাতি কি সব হয়? কিন্তু টাকা যখন আছে, আস্তে আস্তে সব হবে। বসুন।

আমার কাগজপত্র দেখলেন হ্যারি পিনার। বললেন, চাকরি আপনার পাকা হয়ে গেল। ভাইয়ের পছন্দ আছে দেখছি।

আমার কাজটা কী?

ফ্রান্সের বড়ো গুদামটার চার্জে থাকবেন। আপাতত দিন সাতেক বার্মিংহামে থাকুন কেনাকাটা তদারক করুন।

কীভাবে?

ড্রয়ার থেকে একটা মোটা লাল বই বার করে হ্যারি পিনার বললেন, এই বইটিতে যাদের পাশে দেখবেন লোহালক্কড়ের কারবারি বলে লেখা আছে, তাদের নাম আর ঠিকানার একটা আলাদা লিস্ট করুন।

কিন্তু এ-রকম লিস্ট তো পাওয়া যায়।

সে-লিস্ট সুবিধের নয়। আমাদের কাজে লাগবে না। সোমবার বারোটার মধ্যে লিস্টটা আমাকে এনে দিন। এখন আসুন।

সাত-পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে মোটা বইখানা বগলে করে হোটেলে ফিরলাম। অফিসের ছিরি দেখে মনটা দমে গিয়েছে ঠিকই, কোম্পানির নামও দেখলাম না কিন্তু চাকরি তো পাকা হয়ে গিয়েছে, পকেটের আগাম এক-শো পাউন্ড গজগজ করছে। কাজেই রোববার সারাদিন খাটলাম। সোমবার গেলাম এইচ পর্যন্ত নামের লিস্ট নিয়ে। ফাঁকা ঘরে দেখা হল হ্যারি পিনারের সঙ্গে। আমাকে আসতে বললেন বুধবার। বুধবারও কাজ শেষ হল না। শুক্রবার, মানে, গতকাল আবার গেলাম ভদ্রলোকের কাছে। উনি বললেন, এবার বাসন-কোসন বিক্রি করে, তাদের নাম-ঠিকানার একটা লিস্ট যেন জানাই। আরও বললেন, আজকে সন্ধে সাতটার সময়ে যেতে। তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। সারাদিন খেটেখুটে ঘন্টা দুয়েক নাচগানের আড্ডায় ফুর্তি করে যাওয়াই ভালো।

ডা. ওয়াটসন, এই কথাটা বলেই তিনি হেসে উঠলেন। এবং আমি আঁতকে উঠলাম তার দাঁত দেখে। বাঁ-দিকের ওপরের পাটির দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে।

এই পর্যন্ত শুনে সোৎসাহে সানন্দে হাত ঘষল শার্লক হোমস। বিস্মিত চোখে হল পাইক্রফটের দিকে চাইলাম আমি।

উনি বললেন, ডা. ওয়াটসন, লন্ডনে আর্থার পিনার একবার হেসে উঠেছিলেন মসন কোম্পানির চৌকাঠ মাড়াব না শুনে। তখন সোনা দাঁতের ঝিকিমিকি দেখেছিলাম বাঁ-দিকের ওপরের পাটিতে। অবিকল সেই সোনা দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠল হ্যারি পিনারের বাঁ-দিকের ওপরের পাটিতে। এ কী করে হয়? চেহারা আর গলার স্বর একরকম, গোড়া থেকে ধরতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম সহোদর ভাই বলেই হয়তো মিলটা থেকে গিয়েছে। কিন্তু সোনার দাঁত পর্যন্ত দু-ভাইয়ের একরকম হতে পারে কি? খটকা লাগল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম পরচুলো পরে চেহারা পালটানো হয়েছিল। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পরচুলো ফেলে ভোল ফেরানো হয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই প্রহসন আমার মতো ছাপোষা মানুষের সঙ্গে? ভেবে ভেবে কূলকিনারা না-পেয়ে মি. শার্লক হোমসের কাছে দৌড়ে এসেছি।

ঘর নিস্তব্ধ। অপাঙ্গে আমার পানে চাইল শার্লক হোমস।

বলল, মি. আর্থার হ্যারি পিনারের সঙ্গে আমরা দুই বন্ধু দেখা করতে চলেছি।

কিন্তু কীভাবে?

চাকরি চাওয়ার অছিলায়, বললেন হল পাইক্রফট।

ভদ্রলোকের সুরতটা একবার না-দেখলে তাঁর চালাকিটার মানে ধরা যাবে না, বলে জানলা দিয়ে বাইরে শূন্যগর্ভ দৃষ্টি মেলে রইল হোমস–বাকি পথটা মুখ দিয়ে টু শব্দটি বার করতে পারলাম না।

সন্ধে হয়েছে। বার্মিংহামের পথ বেয়ে চলেছি ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি অভিমুখে।

হল পাইক্রফট বললেন, আগেভাগে গিয়ে লাভ নেই–ঘরে কেউ থাকবে না।

খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার কিন্তু, বললে হোমস।

ওই তো উনি যাচ্ছেন চাপা স্বরে বললেন হল পাইক্রফট।

দেখলাম, আমাদের সামনে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছে সুদর্শন, সুবেশ খর্বকায় এক ব্যক্তি। একটা সান্ধ্য দৈনিক কিনে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা বাড়ির মধ্যে।

ওই হল কোম্পানির অফিস, বলে আমাদের নিয়ে হল পাইক্রফট ঢুকলেন ভেতরে। সোজা উঠে গেলাম পাঁচতলায়। আধখোলা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলেন পাইক্রফট। ভেতর থেকে গলা শোনা গেল, আসুন।

ঢুকলাম তিনজনে। আসবাবহীন ন্যাড়া একটা ঘর। একটিমাত্র টেবিলের ওপর সাপ্তাহিক মেলে বসে সেই ভদ্রলোক। আমরা ঢুকতেই মুখ তুলে চাইল। দেখলাম নিঃসীম আতঙ্ক, অপরিসীম দুঃখশোক মূর্ত হয়ে উঠেছে মুখের পরতে পরতে। গাল নীরক্ত মরামাছের পেটের মতো তলতলে ফ্যাকাশে। চোখ উদ্ভ্রান্ত–কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কল্পনাতীত ভয় যেন তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। হল পাইক্রফটের দিকে চেয়েও যেন তাকে চিনতে পারল না।

মি. পিনার, আপনার শরীর খারাপ মনে হচ্ছে? সবিস্ময়ে বললেন হল পাইক্রফট।

এঁরা কে? শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললে ভয়ার্ত ভদ্রলোক।

চাকরির জন্যে এসেছেন। মি. হ্যারিস। মি. প্রাইস।

তাই নাকি? বেশ তো, চাকরি নিশ্চয় হবে, ফ্যাকাশে হাসি হাসল মি. পিনার। কী কাজ জানেন বলুন।

আমি হিসেবপত্র রাখতে জানি, বললে হোমস।

আমি কেরানির কাজে পোক্ত, বললাম আমি।

বেশ, বেশ, আপনাদের মতো লোকই আমার দরকার। কিন্তু এখন আসুন। আমাকে একলা থাকতে দিন।

চেষ্টা করেও ভদ্রলোক আর সামলাতে পারল না নিজেকে। শেষের দিকে চুরমার হয়ে গেল সংযম।

দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমরা তিনজনে।

হল পাইক্রফট বললে, কিন্তু আমাকে আসতে বলা হয়েছে এই সময়ে আরও কাজ দেবেন বলে।

ঠিক আছে, অতি কষ্টে সহজ সুরে বলল পিনার। আপনারা তিনজনেই বসুন। আমি মিনিট তিনেকের মধ্যে আসছি।

বলে পেছনের দরজা খুলে ঢুকল অন্য ঘরে এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল পেছন থেকে।

পালাল নাকি? চাপা গলায় বললে হোমস।

সম্ভব নয়, ও-ঘর থেকে বেরোবার পথ নেই, বললেন পাইক্রফট।

ঘরে জিনিসপত্র আছে?

খালি ঘর।

তাহলে ওখানে গেল কী করতে? ভয়ের চোটে পাগল হয়ে গেল নাকি?

আমরা যে গোয়েন্দা, তা আঁচ করেছে, বললাম আমি।

উঁহু, বললে হোমস। আমাদের দেখে ঘাবড়ায়নি। আগে থেকেই ভয়ে আধখানা হয়ে বসে ছিল। ও কী!

আচমকা ঠক-ঠক-ঠক-ঠক আওয়াজ ভেসে এল দরজার ওদিক থেকে। ভয়ে পাগল হয়ে গিয়ে নিজেই দরজা নক করছে নাকি? কিছুক্ষণ পর আবার আওয়াজ হল–ঠক-ঠক-ঠক-ঠক। সেইসঙ্গে একটা চাপা ঘড়ঘড় শব্দ। আবার কাঠের ওপর খটাখট আওয়াজ। শক্ত হয়ে গিয়েছিল হোমসের মুখ। ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা শুনেই ছিলে-ছেড়া ধনুকের মতো ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল দরজায়। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল বন্ধ পাল্লায়। শক্তি প্রয়োগ করলাম আমিও। নিমেষে কবজা থেকে উপড়ে ছিটকে গেল পাল্লা। হুড়মুড় করে ঢুকলাম ভেতরে।

ঘরে কেউ নেই।

পরক্ষণেই দেখলাম, পাশে আর একটা দরজা। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে ফেলল হোমস।

এবং দেখা গেল ফ্রাঙ্কো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। দরজার হুক থেকে গলায় প্যান্ট আটকানোর ফিতে বেঁধে ঝুলছে–পায়ের কাছে পড়ে কোট আর ওয়েস্টকোট। গোড়ালি লাগছে কাঠের পাল্লায় আওয়াজ হচ্ছে খট-খট-খট-খট।

কোমর ধরে শরীরটা ওপরে তুলে ধরলাম আমি। হোমস আর পাইক্রফট খুলে দিল গলার ফাস। ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। ফ্যাকাশে মুখে শুয়ে রইল মিনিট পাঁচেক–থেকে থেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল রক্তহীন ঠোঁটজোড়া।

নাড়ি পরীক্ষা করলাম। খুব ক্ষীণ, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে নিশ্বাস নেওয়া বাড়ছে চোখের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে।

বললাম, ভয়ের কিছু নেই। বিপদ কেটে গেছে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে মুখে ছিটিয়ে দিলাম, দু-হাত ধরে ওঠানামা করতে লাগলাম শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আরও স্বচ্ছন্দ করার জন্যে।

প্যান্টের পকেটে হাত পুরে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল হোমস।

এবার বললে, পুলিশ ডাকা দরকার এখন।

কিন্তু আমাকে এসবের মধ্যে টেনে আনা হল কেন বুঝলাম না তো, আমতা আমতা করে বললেন হল পাইক্রফট।

খুব সোজা কারণে। ওয়াটসন, বুঝেছ?

না।

আরে ভায়া, মি. পাইক্রফটকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েও খুশি হয়নি আর্থার পিনার–লিখিয়ে নিয়েছিল। কেন? না, তার হাতের লেখা দরকার ছিল বলে। এই গেল এক নম্বর।

হাতের লেখা নেওয়ার দরকার হল কেন?

দু-নম্বর ব্যাপারটা শুনলেই বুঝবে, কেন। মি. হল পাইক্রফট কথা দিলেন মসন কোম্পানিতে যাবেন না। যেখানকার ম্যানেজার তাঁকে দেখেননি–তিনি জানলেনও না হল পাইক্রফট আসছেন না। কাজেই তার নাম নিয়ে যদি একজনকে আসতে হয়–হাতের লেখাটা অন্তত ম্যানেজারের চেনা হওয়া চাই।

অ্যাঁ! আঁতকে উঠলেন হল পাইক্রফট।

আপনি দরখাস্ত লিখেছিলেন যে হাতের লেখায়, হুবহু সেই লেখাঁটি নকল না-করলে আপনার নাম নিয়ে চাকরিতে যোগ দেওয়া একটু মুশকিলের ব্যাপার বই কী। তাই আপনাকে দিয়ে দু-লাইন লিখিয়ে নেওয়া হল এবং সেইভাবে হাতের লেখা মকশো করে মি. হল পাইক্রফট সেজে এমন একটা অফিসে যাওয়া হল যেখানে মি. হল পাইক্রফটকে কেউ দেখেনি।

বলেন কী!

আপনি যেন আবার সেখানে গিয়ে না-পড়েন, এই ভয়ে এক-শো পাউন্ড আগাম দিয়ে উড়ো কোম্পানির অফিসে আটকে রাখা হল আপনাকে। বাজে কাজে ধরে রাখা হল যাতে লন্ডন আসতে না-পারেন।

কিন্তু একই লোক নিজের ভাই সাজতে গেল কেন?

কারণ এই বদমাশদের দলে দুজনের বেশি লোক নেই বলে। একজন গেল মসন কোম্পানিতে আর একজন ভোল পালটে আপনাকে লন্ডন থেকে টেনে এনে আটকে রাখল এখানে। কিন্তু তার সোনা বাঁধানো দাঁতটা দেখিয়ে করল বিপত্তি। এই পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। কিন্তু বুঝতে পারছি না আমাদের দেখেই হঠাৎ গলায় দড়ি দেওয়ার শখ হল কেন লোকটার।

কাগজটা পড়লেই বুঝবেন। আচমকা ভাঙা-ভাঙা স্বর শুনলাম পেছনে। দেখি, মুমূর্য ব্যক্তি উঠে বসেছে। মুখের রং ফিরে আসছে। গলায় জড়ানো ফিতেতে উব্রান্তের মতো হাত ঘষছে।

ঠিকই তো! লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস। এ-রহস্যের জবাব তো কাগজের মধ্যেই রয়েছে। আচ্ছা বোকা তো আমি। কাগজটা আগেই দেখা উচিত ছিল।

ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল হোমস।

বললে সোল্লাসে, লন্ডনের কাগজ! এই দেখ হেডলাইন। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কোম্পানিতে নরহত্যা। ডাকাতির চেষ্টা বানচাল। আততায়ী গ্রেপ্তার। ওয়াটসন, জোরে পড়ো, সবাই শুনি।

ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি পড়লাম। আজ বিকেলে শহরে একটা বিরাট ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু একজন নিহত হয়েছে। মসন অ্যান্ড উইলিয়ামস কোম্পানির কাছে গচ্ছিত দশলক্ষ পাউন্ডের শেয়ারের কাগজপত্র লুঠের চেষ্টা হয়। কিছুদিন আগে মি. হল পাইক্রফট এই ছদ্মনামে কুখ্যাত জালিয়াত আর সিন্দুকে চোর বেডিংটন চাকরি নেয় ওই কোম্পানিতে। এরা দু-ভাই পাঁচ বছর জেল খেটে সবে খালাস পেয়েছে। বেডিংটন নাম ভাঁড়িয়ে চাকরিতে ঢোকার পর সিন্দুক আর স্ট্রংরুমের সবকটা তালার নকল চাবি বানিয়ে নেয়।

রেওয়াজ মাফিক শনিবার বেলা বারোটায় ছুটি পায় কেরানিরা।

সেই কারণেই একটা বিশ মিনিটে কার্পেটের থলি হাতে এক ব্যক্তিকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে পেছন নেয় সার্জেন্ট টুসন এবং পথ আটকে এক-শো হাজার পাউন্ড মূল্যের কোম্পানির কাগজপত্র উদ্ধার করে ব্যাগের মধ্যে থেকে। অফিসে ঢুকে দেখা যায়, দ্বাররক্ষকের পিণ্ডি পাকানো দেহ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা সিন্দুকের মধ্যে। নিহত ব্যক্তির করোটির পেছন দিকটা একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। ছুটির পর কিছু ফেলে এসেছে এই অছিলায় অফিস ঘরে ঢুকেছিল বেডিংটন। পেছন থেকে ডান্ডা মেরে খুন করে প্রহরীকে এবং সবচেয়ে বড়ো সিন্দুকটা ভেঙে তাড়াতাড়িতে যা পেয়েছে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বেডিংটনের সহোদর ভাইটি তার সর্ব কুকর্মে থাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিরাট এই ডাকাতিতে সে অংশ নেয়নি। পুলিশ অবশ্য তাকে খুঁজছে। বেডিংটন গ্রেপ্তার হয়েছে।

উদ্রান্ত মূর্তিটির পানে দৃকপাত করে শার্লক হোমস বললে, পুলিশকে খবর দিন মি. পাইক্রফট। বেডিংটনের ভাইকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমরা না হয় একটু সাহায্যই করলাম। ওয়াটসন, মানবচরিত্র দেখেছ? মায়ের পেটের ভাই খুনের অপরাধে ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে বুঝতে পেরে মনের দুঃখে নিজেই আগেভাগে ঝুলে পড়ছে ফাঁসিতে!

———

টীকা

সোনা-দাঁতের রহস্য : দ্য স্টক ব্রোকার্স ক্লার্ক লন্ডনের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৩-এর মার্চ সংখ্যায়। আমেরিকায় এই গল্পের প্রথম প্রকাশ নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলি-র ১১ মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায়।

প্র্যাকটিস কিনেছিলাম : মেরি মার্স্টনের সঙ্গে বিয়ের আগে ড. ওয়াটসনের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আসবার কোনো বাসনা ছিল বলে জানা যায় না। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে বেরোনোর পরই সৈন্যদলে নাম লেখানোয় আগেও কখনো প্র্যাকটিস করা হয়ে ওঠেনি তার। বিয়ের পরে অর্থাভাবের কারণে হয়তো প্র্যাকটিস শুরু করেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, নামকরা ডাক্তারের প্র্যাকটিস কেনবার মতো পর্যাপ্ত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?

ব্রিটিশ জার্নাল : সম্ভবত ১৮৩২-এ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল।

প্রতিবেশী ডাক্তার : প্রতিবেশী ডাক্তারের হাতে নিজের পসারের দায়িত্ব দিয়েছেন অনেকবার।দ্য ফাইনাল প্রবলেম, দ্য ক্রুকেড ম্যান প্রভৃতি গল্পে এমন করেছেন ড. ওয়াটসন।

স্টক এক্সচেঞ্জ পড়ি : চেঞ্জ অ্যালি নামক রাস্তায় অবস্থিত জেনাথনস কফি হাউসে শেয়ারের লেনদেন করতেন একদল ব্রোকার। এঁরাই ১৭৭৩-এ স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। হল পাইক্রফট রোজ সকালে যা পড়তেন, তা সম্ভবত স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হওয়া শেয়ারের দামের তালিকা।

আয়ারশায়ারের : এই নামে কোনো কোম্পানি না-থাকলেও কখনো গ্লাসগো অ্যান্ড সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে-কে এই নামে বোঝানো হয়ে থাকত। গল্পে উল্লিখিত অন্য দুটি কোম্পানি, নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটেড এবং ব্রিটিশ ব্রোকেন হিলস-এর ব্যাবসা ঊনবিংশ শতকের শেষে উঠে যায়।

বাড়িটায় : কন্যান ডয়াল বর্ণিত ১২৬বি, কর্পোরেশন স্ট্রিটের বাড়িটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু হোমস-গবেষক ফিলিপ ওয়েলার জানিয়েছেন, বর্ণনার সঙ্গে বহুলাংশে খাপ খেয়ে যায় ৩, কর্পোরেশন স্ট্রিটের বাড়িটি।

নাম ভাঁড়িয়ে চাকরিতে : হল পাইক্রফট শহুরে, কমবয়সি মানুষ। তার বদলে মাঝবয়সি, চেহারায় বিদেশি ছাপওয়ালা বেডিংটনকে দেখে মসন অ্যান্ড উইলিয়ামসের মানেজারের সন্দেহ হয়নি?

বিরাট এই ডাকাতিতে : বেশ কয়েকজন হোমস-বিশেষজ্ঞ এই গল্পে অপরাধীর কার্যপদ্ধতি বা মোডাস-অপারেন্ডির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন দ্য রেড-হেডেড লিগ এবং দ্য থ্রি গ্যারিডেবস গল্পের অপরাধীর পরিকল্পনার।

হলদে মুখের কাহিনি

[দি ইয়েলো ফেস]

শার্লক হোমসের সফল কীর্তির মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তি যতটা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে তার বিফল কীর্তির মধ্যে। যে-কেস সে সমাধান করতে পারেনি, তা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গেছে–কারো বুদ্ধিতে কুলোয়নি মীমাংসা করার।

হলদে মুখের কাহিনি সেই জাতীয় কাহিনি যার মধ্যে ওর আশ্চর্য বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্যকরূপে প্রকাশ পেয়েছে–অথচ হালে পানি পায়নি।

অহেতুক শক্তিক্ষয় করা হোমসের ধাতে ছিল না। দেহে শক্তি ছিল যথেষ্ট। বক্সিংয়ে প্রথম শ্রেণির বক্সারদের মধ্যে ওর স্থান। কিন্তু কাজের সময় ছাড়া বাজে শক্তিক্ষয়ে ছিল ভীষণ অরুচি কোকেন নিয়ে পড়ে থাকত মামলা হাতে না-থাকলে। কিন্তু কর্মক্ষমতা মরে যেত না–নিয়মিত ব্যায়াম ছাড়াই কীভাবে যে নিজেকে কর্মপটু রাখত ভেবে পাইনি। খেত খুব সামান্য। কিন্তু হাতে কাজ এলে শক্তি যেন বিস্ফোরিত হত হাতে পায়ে। প্রচণ্ড পরিশ্রমেও ক্লান্ত হত না। বসন্তকাল। জোর করে ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম বাগানে। বাসায় ফিরলাম পাঁচটায়। আসতেই চাকরের মুখে শুনলাম, বসে থেকে থেকে একজন দর্শনার্থী চলে গেছে।

খুবই বিরক্ত হল হোমস। এমনিতে হাতে কাজ নেই। যাও-বা একজন মক্কেল এল, দেখাও হল না। বিকেলে বেড়াতে না-গেলেই হত। গজগজ করতে লাগল সমানে। এমন সময়ে টেবিলে দেখা গেল একটা পাইপ পড়ে রয়েছে।

লাফিয়ে উঠল হোমস, আরে! আরে! ওয়াটসন, এ তো তোমার পাইপ নয়। ভদ্রলোক ফেলে গেছেন নিশ্চয়। চমৎকার সেকেলে ব্রায়ার পাইপ–তামাকওয়ালা এ ধরনের তৈল-স্ফটিকের নলকে বলে অম্বর। লন্ডনে এমন নল খুব একটা পাওয়া যায় না। এ-রকম একটা জিনিস ভদ্রলোকের অত্যন্ত আদরের কাছছাড়া করতে চান না। তবুও যখন ফেলে গেছেন, বুঝতে হবে তার মানসিক উদবেগ নিশ্চয় চরমে পৌঁছেছে–পাইপ নিতেও ভুলে গেছেন।

আদরের জিনিস–কাছছাড়া করতে চান না, তুমি বুঝলে কী করে?

ভায়া, পাইপটার দামই তো সাত শিলিং। দু-বার মেরামত করা হয়েছে রুপোর পটি মেরে, মানে, পাইপের যা দাম, তার চাইতেও বেশি খরচ করে। নতুন একটা কিনলেও পারতেন। কেনেননি, অত্যন্ত আদরের এই পাইপ কাছছাড়া করতে চান না বলে।

আর কী চোখে পড়ছে?

হাড় ঠুকে প্রফেসর যেভাবে বক্তৃতা দেয়, তর্জনী দিয়ে পাইপ ঠুকে হোমস সেইভাবে বললে, পাইপ জিনিসটা চিরকালই কৌতূহলোদ্দীপক। ঘড়ি আর জুতোর মতো

বৈশিষ্ট্যেরও দাবি রাখে। পাইপটার মালিক ল্যাটা, স্বাস্থ্যবান, ছন্নছাড়া। ভদ্রলোকের দাঁত বেশ সাজানো এবং পয়সাকড়ির ব্যাপারে হিসেব করে খরচ না-করলেও চলে যায়।

তার মানে বড়োলোক?

পাইপ থেকে তামাকটা হাতের চেটোয় ঢেলে হোমস বললে, তামাকটা দেখছ? এ হল গ্রসভেনর মিক্সচার। বিলক্ষণ দামি। ব্যয়সংকোচে যে আগ্রহী, সে অনায়াসেই এর আধাদামের তামাক কিনে নেশা চরিতার্থ করতে পারত।

আর কী দেখছ?

ভদ্রলোক ল্যাম্প আর গ্যাসের শিখায় পাইপ জ্বালান বলে কাঠ পুড়েছে। দেশলাইয়ের আগুনে এভাবে কাঠ পোড়ে না। পুড়েছে কেবল ডান দিকটা, ল্যাটা বলে। তুমি ল্যাটা নও। তুমি ডান হাতে পাইপ ধরে ল্যাম্প বা গ্যাসের শিখায় পাইপ ধরালে দেখবে পুড়ছে বাঁ-দিকটা। অম্বর নলে দাঁতের দাগ যেভাবে বসেছে, তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের দন্তশোভা দেখবার মতোই। দাঁত সাজানো জোরালো না-হলে এভাবে পাইপ কামড়ানো যায় না। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ভদ্রলোক স্বয়ং আসছেন মনে হচ্ছে।

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকলেন বছর তিরিশ বছরের এক যুবক; হাতে টুপি, পরনে ধূসর পোশাক।

আমতা আমতা করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আমার মাথার ঠিক নেই। দরজায় নক করে ঢোকা উচিত ছিল। বলেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো হাত বুলাতে লাগলেন কপালে।

আপন করে নেওয়া সুরে হোমস বললে, দৈহিক মেহনত সওয়া যায়, রাত্রিজাগরণ সহ্য হয় না। আপনার দেখছি কয়েক রাত ঘুমই হয়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে আমার। আতীক্ষ্ণ ভাঙা ভাঙা গলায় যেন স্রেফ মনের জোরে আবেগরুদ্ধ ভঙ্গিমায় কথা বলে গেলেন যুবক। ঘরের ব্যাপার নিয়ে পরের কাছে আলোচনা করার মতো কুৎসিত ব্যাপার আর নেই, বিশেষ করে ব্যাপারটা যদি নিজের ঘরণীকে নিয়ে হয়।

মি. গ্রান্ট মুনরো...

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন যুবক, আমার নামও জানেন দেখছি।

হাসল হোমস। বলল, নামটা আপনার টুপির ভেতর লিখে রেখে আমার দিকেই ফিরিয়ে রেখেছেন। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার কাহিনি বলুন। এ-ঘরে এর আগে অনেক গোপন রহস্য আমরা এই দুই বন্ধু শুনেছি, সমাধানও করেছি, অনেকের হৃদয়ের জ্বালা জুড়োতে পেরেছি। বলুন।

আবার ললাটে হস্তচালনা করলেন গ্রান্ট মুনরো। হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল কথা তিনি কম বলেন, মনের কথা মনে চেপে রাখতে পারেন, নিজেকে নিয়েই তন্ময় থাকেন, কিন্তু সেই অভ্যেসের অন্যথা হতে যাচ্ছে বলে নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না।

মি. হোমস, আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর আগে। তিন-তিনটে বছর আমরা পরম সুখে কাটিয়েছি। কেউ কাউকে ভুল বুঝিনি, কখনো মতান্তর হয়নি। কিন্তু গত সোমবার থেকে মনে হচ্ছে স্ত্রী অনেক দূরে সরে গেছে। কারণটা আমি জানতে চাই।

এফি কিন্তু আমাকে ভালোবাসে, তাতে একটুও চিড় ধরেনি। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু একটা গুপ্ত রহস্য অদৃশ্য প্রাচীরের মতো দুজনের মাঝে হঠাৎ মাথা তুলেছে।

এফিকে বিয়ে করেছিলাম বিধবা অবস্থায়। নাম ছিল মিসেস হেব্রন। আলাপ যখন হয়, তখন তার বয়স পঁচিশ। অল্প বয়সে আমেরিকায় গিয়েছিল। আটলান্টায় থাকত। বিয়ে হয়েছিল উকিল হেব্রনের সঙ্গে। একটি বাচ্চাও হয়েছিল। তারপরে পীতজ্বরে স্বামী আর সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় ও দেশে ফিরে আসে। মি. হেব্রন ওর জন্যে যে-টাকা রেখে গেছিলেন তার সুদ পাওয়া যেত ভালোই। দেশে ফেরার ছ-মাস পরে আলাপ হয় আমাদের–তারপর বিয়ে।

হেব্রন ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট আমি দেখেছি।

আমার নিজের কারবার আছে। বিয়ের পর নবুরিতে একটা বাড়ি ভাড়া করলাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। পল্লিশ্রী আছে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের ওপারে একটা কটেজ। আর কোনো বাড়ি নেই। কটেজটার সদর দরজা আমাদের বাড়ির দিকে।

আগেই একটা কথা বলে রাখি। বিয়ের পরেই স্ত্রী ওর সব টাকা আমাকে লিখে-পড়ে দিয়েছিল। আমার বারণ শোনেনি। ব্যাবসা করি, যদি টাকাটা জলে যায়, এই ভয় ছিল।

যাই হোক, দেড় মাস আগে এফি হঠাৎ আমার কাছে এক-শো পাউন্ড চাইল। আমি তো অবাক। এত টাকা হঠাৎ কী দরকার পড়তে পারে, ভেবে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম। ও এড়িয়ে গেল। চপলভাবে শুধু বলল, তুমি তো আমার ব্যাঙ্কার। ব্যাঙ্কার আবার অত কথা জিজ্ঞেস করে নাকি? তবে কী জন্যে টাকাটা নিচ্ছি, পরে বলব–এখন নয়।

চেক লিখে দিলাম এক-শো পাউন্ডের। কিন্তু সেই প্রথম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খোলাখুলি সম্পর্কে

একটু ফাটল ধরল–কী যেন লুকিয়ে রাখা হল আমার কাছে।

বাড়ির উলটোদিকে মাঠের ওপারে দোতলা কটেজটার পাশে আমি প্রায় বেড়াতে যেতাম স্করফার গাছের কুঞ্জে। গত সোমবার বেড়িয়ে ফেরবার সময়ে দেখলাম, বাড়িতে নিশ্চয়

ভাড়াটে এসেছে। এতদিন খালি পড়ে ছিল। এখন একটা খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র সদর দরজার সামনে নামানো হচ্ছে।

কৌতূহল হল। কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কে এল বাড়িতে, এমন সময়ে চমকে উঠলাম দোতলার জানলায় একটা মুখ দেখে। মি. হোমস, সে-মুখ দেখে বুকের রক্ত আমার ছলাৎ করে উঠল। কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে।

মুখটা পুরুষের, কি নারীর দূর থেকে ঠাহর করতে পারলাম না। শুধু দেখলাম একটা বিষম বিকট হলদেটে রঙের মৃতবৎ মুখ স্থির চোখে দেখছে আমাকে। চোখাচোখি হতেই সাঁৎ করে পেছনে সরে গেল মুখটা যেন জোর করে টেনে নেওয়া হল ঘরের ভেতর থেকে।

কৌতূহল আর বাগ মানল না। দেখতেই হবে কে এল আমার প্রতিবেশী হয়ে। এগিয়ে গেলাম সদর দরজার সামনে। কিন্তু ঢোকবার আগেই তালঢ্যাঙা একটা মেয়েছেলে বেরিয়ে এসে কড়া কড়া কথা বলে তাড়িয়ে দিলে আমাকে।

বাড়ি ফিরে এলাম। মন থেকে কিন্তু হলদেটে মুখটার স্মৃতি মুছতে পারলাম না। স্ত্রীকেও কিছু বলব না ঠিক করলাম। যা ভীতু স্বভাবের, ভেবে ভেবে হয়তো আধখানা হয়ে যাবে। শোবার আগে কেবল বললাম, সামনের বাড়িতে নতুন প্রতিবেশী এসেছে।

আমি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোই। এই নিয়ে আমাকে রাগানোও হয়। কিন্তু সেদিন ওই বীভৎস হলদে মুখটা দেখার পর ঘুম তেমন গাঢ় হল না। চমকে চমকে উঠতে লাগলাম। সেই কারণেই গভীর রাতে টের পেলাম চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে এফি বেরিয়ে গেল ঠিক চোরের মতো ভয়ে ভয়ে। ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটে। এত রাতে বাড়ির বউ বাইরে বেরোয় কেন? বাইরে বেরোনোর সময়ে ওর মুখের চেহারাও দেখেছি। মড়ার মতো ফ্যাকাশে। নিশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। ব্যাপার কী?

কুড়ি মিনিট পর ফের সদর দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। চুপি চুপি ঘরে ঢুকল এফি। তৎক্ষণাৎ উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেছিলে?

আঁতকে উঠল এফি। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। কাঁপতে লাগল ঠক-ঠক করে। চিরকালই একটু নার্ভাস। তারপরেই ডুকরে কেঁদে বললে, তুমি জেগে আছ?

কোথায় গেছিলে? একটু হাওয়া খেতে। দম আটকে আসছিল বন্ধ ঘরে, দেখলাম আঙুল কাপছে এফির। নির্ঘাত মিথ্যে বলছে। আমার দিকেও তাকাচ্ছে না।

মনটা বিষিয়ে গেল। নিশীথ রাত্রে চোরের মতো বাইরে ঘুরে এসে যে-স্ত্রী কঁচা মিথ্যে বলে স্বামীকে, তাকে আর জেরা না-করাই ভালো। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পরের দিন শহরে যাওয়ার কথা ছিল। বেরোলামও বাড়ি থেকে। কিন্তু মনমেজাজ ভালো–থাকায় এদিক-ওদিক ঘুরে দুপুর একটা নাগাদ ফিরে এলাম। কটেজটার পাশ দিয়ে যখন আসছি, দেখলাম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আমার স্ত্রী।

আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল এফি। ভাব দেখে মনে হল এখুনি পেছন ফিরে কটেজের মধ্যে ফের ঢুকে পড়বে। নিঃসীম আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে-মুখে।

কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, জ্যাক, নতুন প্রতিবেশী দেখতে এসেছিলাম।

কাল রাতেও এসেছিলে?

না, না। কী বলতে চাও?

ফের মিথ্যে? দেখি তো কার কাছে গেছিলে।

দু-হাতে আমার পথ আটকাল এফি। মিনতি করে বললে, ভেতরে যেন না-ঢুকি। এখন সে কিছু বলতে পারছে না শুধু আমার ভালোর জন্যেই। কিন্তু একদিন সব বলবে। কিন্তু এখন জোর করে ভেতরে ঢুকলে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটবে ওইখানেই।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কথা আদায় করলাম–আর যেন এসব না হয়। ও কথা দিল।

চলে আসার সময়ে লক্ষ করলাম, ওপরের ঘরের জানলা থেকে বিকট সেই হলদে মুখটা নির্নিমেষে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই সাঁৎ করে সরে গেল ভেতরে। কিছুতেই মাথায় এল না এ-রকম একটা বিচিত্র জীবের সঙ্গে আমার স্ত্রী-র এমন কী সম্পর্ক থাকতে পারে যে রাতবিরেতে অথবা দিনদুপুরে আমাকে লুকিয়ে তাকে আসতে হচ্ছে বার বার? ওই কর্কশ স্বভাবের মেয়েছেলেটাই-বা কে? এ কী রহস্য গড়ে উঠেছে সামনের বাড়িতে?

দু-দিন ভালোই কাটল। তৃতীয় দিন শহরে কাজ পড়ল। যে-ট্রেনে ফেরবার কথা ফিরলাম তার আগের ট্রেনে। বাড়ি ঢুকতেই আমার ঝি চমকে উঠল আমাকে দেখে। গিন্নিমা কোথায় গেছে। জিজ্ঞেস করতে আমতা আমতা করে বললে, এই গেছে একটু বাইরে।

ঘোর সন্দেহ হল। ওপরে উঠলাম। এফিকে দেখতে পেলাম না। জানলা দিয়ে দেখলাম, মাঠের ওপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে ঝি। বুঝলাম সব। আমার অবর্তমানে ফের সামনের বাড়ি গিয়েছে এফি। ঝি যাচ্ছে আমার ফিরে আসার খবর দিতে।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলাম, এর একটা হেস্তনেস্ত আজকেই করব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মতো দৌড়োলাম কুটিরের দিকে। মাঝপথে দেখা হল এফি আর ঝিয়ের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে।

আমি কিন্তু ওদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঢুকলাম কুটিরের মধ্যে। নীচের তলায় দেখলাম জল ফুটছে কেটলিতে। ওপরতলায় হলদে মুখ যে-ঘরে দেখেছিলাম, সেই ঘরটা কেবল সুন্দর ভাবে সাজানো ম্যান্টলপিসে রাখা আমার স্ত্রী-র ফটো–তিন মাস আগে তুলেছিলাম। এ ছাড়া বাড়ি একদম ফাঁকা।

নীচের হল ঘরে দেখা হয়ে গেল স্ত্রীর সঙ্গে। ফটো কাকে দিয়েছে এবং কার কাছে সে এত লুকিয়ে চুরিয়ে আসে–এ-প্রশ্নের জবাব সে দিল না। করুণ স্বরে শুধু বললে, বলতে পারব নাজ্যাক। কিন্তু যেদিন সব জানবে ক্ষমাও করতে পারবে।

আমি বললাম, তোমার আমার মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক কিন্তু আর রইল না।

মি. হোমস, সেই থেকে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছি। এ-ঘটনা ঘটেছে কালকে। আপনার কাছে ছুটে এসেছি পরামর্শ নিতে। এ-উৎকণ্ঠা আর সইতে পারছি না। বলুন এখন কী করি।

তন্ময় হয়ে সব শুনল হোমস। গালে হাত দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপরে বললে, হলদে মুখটা পুরুষের কি?

বলা মুশকিল!

দেখে গা ঘিন ঘিন করেছে?

বিকট রং, আড়ষ্ট ভাব দেখে সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছে। দু-বারই চোখাচোখি হতেই লাফিয়ে পেছিয়ে গেছে।

আপনার কাছে স্ত্রী টাকা নেওয়ার কদ্দিন পরের ঘটনা এটা?

মাস দুই।

ওঁর প্রথম স্বামীর ফটো দেখেছেন?

না। আটলান্টায় থাকার সময়ে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়।

কিন্তু ডেথ-সার্টিফিকেটটা দেখতে পেয়েছেন?

সেটাও পুড়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি একটা কপি।

আমেরিকায় আপনার স্ত্রীকে চিনত, এমন কাউকে জানেন?

না।

ওঁর নামে চিঠি আসে আমেরিকা থেকে?

মনে তো হয় না।

তাহলে এক কাজ করুন। বাড়ি ফিরে যান। কুটির থেকে যদি ওরা চম্পট দিয়ে থাকে এর মধ্যে, তাহলে কিছু করার নেই। আর যদি এর মধ্যে আবার ফিরে আসে–আপনি আড়াল থেকে তা দেখতে পেলেই আমাকে টেলিগ্রাম করে দেবেন–নিজে ঢুকতে যাবেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আপনার কাছে।

বিদেয় হলেন গ্রান্ট মুনরো।

ওয়াটসন,বলল হোমস, ব্যাপারটা খুব সুবিধেরমনে হচ্ছেনা। ব্ল্যাকমেলিং চলছে মনে হচ্ছে।

ব্ল্যাকমেলারটি কে?

সাজানো ঘরে যে থাকে, মিসেস মুনরোর ছবি যে ম্যান্টলপিসে সাজিয়ে রাখে, যার মুখ হলদে।

সে কে?

মিসেস মুনরোর প্রথম স্বামী বলেই আমার বিশ্বাস। সেইজন্যেই দ্বিতীয় স্বামীকে ঢুকতে দিতে চান না। আমেরিকায় যাকে বিয়ে করেছিলেন, নিশ্চয় সে মারা যায়নি। অত্যন্ত কুৎসিত কুষ্ঠ জাতীয় কোনো রোগে এমন কদাকার হয়ে যায় যে ইংলন্ডে পালিয়ে আসেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের খবর নিশ্চয় এমন কেউ পেয়েছে, যে প্রথম বিয়ের খবর ফাঁস করে দেওয়ায় হুমকি দেখিয়ে টাকা দোহন করছে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে। নীচু ক্লাসের ছেলে-মেয়ের কীর্তি নিশ্চয়। প্রথম কিস্তির টাকা সে নিয়েছে, কদাকার অকর্মণ্য হেব্রনকে কটেজে এনে তুলেছে, ভয় দেখিয়ে মিসেস মুনরোর ছবি পর্যন্ত আদায় করেছে। গভীর রাতে মিসেস মুনরো গিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, দু-দিন পরে ফের গিয়েছিলেন ওই উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু মি. মুনরো হঠাৎ ফিরে আসায় ঝিয়ের মুখে খবর পেয়ে প্রথম স্বামীকে সেই বদ চরিত্রের মেয়েছেলেটির সঙ্গে পাচার করে দেন পেছনের দরজা দিয়ে।

সবই তো আন্দাজে বলে গেলে।

এ ছাড়া আপাতত আর কিছু দরকার নেই।

বিকেলে টেলিগ্রাম এল গ্রান্ট মুনরোর কাছ থেকে। বাড়িতে লোক দেখা গেছে। সাতটার গাড়িতে যেন হোমস রওনা হয়।

যথাসময়ে পৌঁছোলাম নবুরিতে। স্টেশনে দেখা হল গ্রান্ট মুনরোর সঙ্গে। উত্তেজনায় কাঁপছেন ভদ্রলোক। ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে, আপনার পাছে অমঙ্গল হয় তাই আপনার স্ত্রী আপনাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিতে নারাজ। তা সত্ত্বেও কি ঢুকবেন?

হ্যাঁ। এসপার কি ওসপার হয়ে যাক আজকে।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে পোঁছোলাম কটেজটার সামনে। দোতলার একটা জানলায় আলো জ্বলছে। একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল জানলার সামনে দিয়ে।

ওই... ওই... ওই সেই হলদে মুখ! যেন ককিয়ে উঠলেন গ্রান্ট মুনরো।

আমরা সবেগে ধেয়ে গেলাম সদর দরজার সামনে। আচমকা খুলে গেল পাল্লা। পথ আটকে দাঁড়ালেন এক ভদ্রমহিলা।

জ্যাক... জ্যাক... দোহাই তোমার... আমাকে বিশ্বাস করো... ভেতরে যেয়ো না।

না, এফি, বড় বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছি তোমাকে। পাশ দিয়ে তেড়ে গেলাম তিন মূর্তি ভেতরে। একজন প্রৌঢ়া বেরিয়ে এসে পথ আটকাতে গিয়েও পারল না। ঝড়ের মতো উঠে গেলাম দোতলায়, সেই ঘরটিতে ঢুকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ঘরটা সত্যিই সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। ঝুঁকে রয়েছে একটা ছোট্ট মেয়ে। পরনে লাল ফ্রক। হাতে লম্বা সাদা দস্তানা। মুখটা আমাদের দিকে ফেরাতেই ভয়ে

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। সে-মুখে প্রাণের কোনো সাড়া নেই, স্পন্দন নেই, রং নেই, অদ্ভুত হলদে। আড়ষ্টতা মুখের পরতে পরতে। ভাবলেশহীন বিষম বিকট।

পরমুহূর্তেই অবসান ঘটল রহস্যের। একলাফে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মুখ থেকে একটানে একটা মুখোশ খুলে আনল হোমস, মিশমিশে কালো একটা নিগ্রো মেয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে পরম কৌতুকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখচ্ছবি দেখে।

হেসে উঠলাম আমিও মেয়েটির কৌতুক-উজ্জ্বল সরল হাসি দেখে। আর গ্রান্ট মুনরো? চেয়ে রইলেন ফ্যালফ্যাল করে।

এ আবার কী?

বলছি আমি, ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন নীচতলার সেই মহিলা। আমার প্রথম স্বামী আটলান্টায় মারা গেছে ঠিকই কিন্তু মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে!

তোমার মেয়ে!

গলায় ঝোলানো রুপোর লকেটটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, এর মধ্যে কী আছে এই তিন বছরে তুমি দেখনি।

আমি তো জানি ওটা খোলা যায় না।

খুট করে একটা আওয়াজ হল। স্প্রিংয়ে চাপ পড়তেই ডালা খুলে গেল লকেটের। ভেতরে দেখা গেল বুদ্ধি-উজ্জ্বল সুদর্শন এক পুরুষের প্রতিমূর্তি–আফ্রিকার কৃষ্ণকায় পুরুষ।

জ্যাক, এই আমার প্রথম স্বামী–জন হেব্রন। এর চাইতে উদার মহৎ মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। বে-জাতে বিয়ে করেও তাই কখনো পস্তাতে হয়নি। মেয়েটা কিন্তু দেখতে হল ওর মতো। বরং ওর চাইতেও কালো। তাহলেও সে আমার সোনা মেয়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই মেয়েটা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

মেয়েটাকে আমেরিকায় রেখে এসেছিলাম শরীর খারাপ ছিল বলে–হঠাৎ জায়গা পালটানোর ধকল সইতে পারত না। একজন আয়া ঠিক করে এসেছিলাম–সে-ই ওকে দেখাশুনা করত। সংকোচবশত তোমাকে ওর কথা বলতে পারিনি, সেটাই ভুল করেছি। চিঠিপত্র নিয়মিত পেয়েছি। জানতাম ও ভালোই আছে। বিয়ের তিন বছর পরে কিন্তু বড্ড মন কেমন করতে লাগল মেয়েটার জন্যে। এক-শো পাউন্ড পাঠালাম ওকে নিয়ে এখানে আসবার জন্যে। তখনও যদি তোমার কাছে লুকোছাপা না-করতাম, এত কাণ্ড আর ঘটত না। ভেবেছিলাম, কয়েক সপ্তাহ কাছে এনে রাখব। কটেজ ভাড়া করা হল। আয়াকে বলে দিয়েছিলাম দিনের আলোয় যেন কখনো মেয়েকে রাস্তায় বার না-করে। মুখ আর হাত মুখোশ আর দস্তানা দিয়ে ঢেকে রাখে, যাতে জানলায় যদি কেউ দেখেও

ফেলে, পাড়ায় কালো মেয়ে এসেছে বলে প্রতিবেশীরা কানাকানি না আরম্ভ করে। এতটা আটঘাট না-বাঁধলেই দেখছি মঙ্গল হত। আমার মাথার ঠিক ছিল না পাছে তুমি সব জেনে ফেলো, এই ভয়ে।

তোমার মুখেই শুনলাম, ওরা এসে গেছে। মায়ের মন তো, তাই তর সইল না। তোমার ঘুম খুব গাঢ় বলে ঠিক করলাম রাতেই মেয়েটাকে গিয়ে কোলে নিই। কিন্তু তুমি দেখে ফেললে। তিনদিন পর যখন জোর করে কটেজে ঢুকেছিলে, ঠিক তার আগেই ওরা পেছনের দরজা দিয়ে। বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। জ্যাক, এই হল আমার গোপন কাহিনি। এখন বল কী করবে হতভাগিনী মা আর মেয়েকে নিয়ে।

মিনিট দুই ঘর স্তব্ধ। তারপর গ্রান্ট মুনরো যা করে বসলেন, তাতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল উপস্থিত প্রত্যেকের।

মেয়েটাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। আর এক হাত বাড়িয়ে বউকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, আমি লোকটা ততটা ভালো না-হলেও খুব একটা খারাপ নই, এফি। চলো, বাড়ি গিয়ে কথা হবে।

বাইরে এল হোমস। বোজা গলায় বললে, ওয়াটসন, চলো লন্ডন ফিরি।

সারাদিন গুম হয়ে রইল বন্ধুবর। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বললে, যখন দেখবে অহংকারে মট মট করছি অথবা গুরুত্বপূর্ণ কেসে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি না, মন্ত্র পড়ার মতো নবুরি নামটা কানে কানে শুনিয়ে দেবে।

————-

টীকা

হলদে মুখের কাহিনি : দ্য ইয়েলো ফেস স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সংখ্যায়। নিউইয়র্কের হার্পার্স উইকলি পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ তারিখের সংখ্যায়।

প্রথম শ্রেণির বক্সারদের মধ্যে ওর স্থান : দ্য সাইন অব ফোর উপন্যাসের চরিত্র ম্যাকমুর্দোকেও এ-কথা বলতে শোনা গিয়েছে। ইংলন্ডে আধুনিক বক্সিং চালু হয় ১৮৬৭ সালে। কুইন্সবেরির অষ্টম মাকুইস জন শোল্টো ডগলাস এবং জন গ্রাহাম চেম্বার্স প্রণীত কুইন্সবেরি রুলস মোতাবেক ইংলন্ডে বক্সিং পরিচালিত হত। স্যার আর্থার কন্যান ডয়ালের যে বক্সিং-এ বিশেষ উৎসাহ ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর রডনে স্টোন (১৮৯৬) উপন্যাস থেকে।

বাগানে : কোন বাগানে? বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে বাগান ছিল না। তবে কাছাকাছি অবস্থিত রিজেন্ট পার্ক হওয়া সম্ভব।

অম্বর : Amber। কোটি-কোটি বছর আগে জমাট হয়ে যাওয়া গাছের আঠা। অনেক সময়ে এর ভেতরে ফুল, পাতা, পোকামাকড়ের জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

গ্যাসের শিখায় পাইপ জ্বালেন : শার্লক হোমসকেও কখনো এভাবে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে। দ্রষ্টব্য : দি অ্যাডভেঞ্চার অব চার্লস অগাস্টাস মিলভারটন।

আটলান্টায় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর।

পীতজ্বর :ঊনবিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, প্রায় প্রত্যেক গ্রীষ্মেই পীতজ্বর বা ইয়েলো ফিভার মহামারির আকার ধারণ করত। ১৮৫৩-তে নিউ অর্লিয়েন্স শহরে পীতজ্বরের প্রকোপে প্রায় ন-হাজার মানুষ মারা যান। তবে ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে আটলান্টায় কোনো পীতজ্বরের মহামারি ঘটে বলে জানা যায় না। হাভানায় আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ দেখা দিলে বা ওয়ার রীড সেখানে নানাবিধ পরীক্ষা চালিয়ে আবিষ্কার করেন এই রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী এডিস ইজিপ্টা নামে এক জাতের মশা। ১৯৩৭ সালে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়।

ডেথ সার্টিফিকেট : আটলান্টা শহরে বা সমগ্র জর্জিয়া রাজ্যে ডেথ সার্টিফিকেটের প্রচলন হয় ১৯১৪ সালে। সেক্ষেত্রে হেব্রনের ডেথ সার্টিফিকেট কীভাবে দেখলেন হোমসের মক্কেল? সেটি কি জাল? নাকি লেখক ভুল করেছেন?

জ্যাক : জ্যাক আবার কোথা থেকে এল? হোমসের মক্কেলের প্রথম নাম তো গ্রান্ট!

ছবি যে ম্যান্টলপিসে সাজিয়ে রাখে : যে এফি মুনরোকে ব্ল্যাকমেল করবে, তার পক্ষে ম্যান্টলপিসে এফির ছবি সাজিয়ে রাখা একটু কষ্টকল্পিত।

বে-জাতে বিয়ে করেও : জর্জিয়া রাজ্যের তৎকালীন আইনে কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে নিগ্রোর বিবাহ আইনবহির্ভূত কাজ হিসেবে গণ্য হত। বিয়ে যদি অন্য রাজ্যেও হয়ে থাকে, জর্জিয়ায় আসামাত্র হেব্রন এবং এফির বিয়ে বেআইনি ঘোষিত হওয়ার কথা।

বরং ওর চাইতেও কালো : নৃতত্ত্ববিদদের মতে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গের সন্তানের পক্ষে এমন হওয়া সম্ভব নয়। এফি-র মেয়ের গায়ের রং হওয়ার কথা সাদা এবং কালোর মাঝামাঝি। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের বলা হয় মুল্যাটো (Mulatto)।